দেবযানী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলকাতা * বোম্বে * দিল্লী * হায়দ্রাবাদ

প্রকাশক ঃ
রাজীব নিয়োগী
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ
আশ্বিন, ১৩৭২

মুদ্রাকর ঃ
নীলরতন পাল
উদিত উদ্যোগ
৪২, মহেন্দ্র গোঁসাই লেন
কলকাতা-৬

উৎসর্গ

অধ্যাপিকা মীরা ভট্টাচার্য

ও

শ্রীসনৎ কুমার ভট্টাচার্য

স্নেহাস্পদেষু

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঘরের দাওয়ায় নীরবে বসে আছে কিশোরী দেবযানী। সূর্য অস্তাচলে গেছে, অন্ধকার নামছে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের আশ্রম ঘিরে। নদীতীরে সন্ধ্যা বন্দনা সেরে শুক্র এখনও ফেরেন নি। আশ্রমে দেবযানী একা। নিঃসঙ্গ। শিষ্যরা গুরুর সঙ্গেই ফিরবে। তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালতে ভুলে গেছে দেবযানী।

শিষ্যদের নিয়ে ফিরে এসে শুক্র অন্ধকার দেখলেন তাঁর আশ্রম। কোন আলো নেই, কোন শব্দ নেই, নেই কোন প্রাণের স্পন্দন। পাখিরা কুলায় গেছে, মৃগ আশ্রয় নিয়েছে বৃক্ষমূলে, গোষ্ঠে ফিরে গাভীরাও বিশ্রাম নিচ্ছে। দেবযানী কি তার সখী শর্মিষ্ঠার গৃহ থেকে ফেরে নি? কোমল কণ্ঠে শুক্র ডাকলেন : মা দেবযানী?

দেবযানী চমকে উঠে এগিয়ে এল পিতার নিকটে। বলল : আমায় ডাকছ বাবা?

তুমি কি এই মাত্র ফিরলে?

না বাবা।

কেউ কি দুঃখ দিয়েছে তোমাকে?

এ কথার উত্তর দিতে পারল না দেবযানী।

শুক্র বললেন : এসো মা, আগে সন্ধ্যাদীপ জ্বালি, তারপর শুনব তোমার কথা।

অগ্নিহোত্র থেকে আগুন এনে দেবযানী সন্ধ্যা দীপ জ্বেলে দিল। শুক্র তাকে সস্নেহে বুকে টেনে নিয়ে বললেন : এইবারে বল মা, কে তোমাকে কী বলেছে?

নিরুদ্ধ বাষ্পের মতো বেরিয়ে এল দেবযানীর অভিমান, বলল : আমার মা কোথায় বাবা?

শুক্র তার মাথায় হাত দিয়ে হাসবার চেষ্টা করলেন, বললেন : সবার কি সব কিছু থাকে!

দেবযানী বলল : শর্মিষ্ঠার তো মা আছে, দিদি আছে। আমার কেউ নেই কেন?

আমি তো আছি!

শর্মিষ্ঠা বলে, আমার মা আছে শুনেছে। কেন আমার মা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে? বল না বাবা।

দেবযানী বুঝি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চাইল তার পিতার বুকে। শুক্র তার কন্যার মাথায় গায়ে সযত্নে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু দেবযানী কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না দেখে বললেন : তোমাকে ছেড়ে গেছেন ঠিকই, কিন্তু সে তোমার দোষে নয়।

তবে কার দোষে?

দোষ সমাজের, দোষ আমারও।

কোথায় আমার মা?

তা আমি জানি নে মা, বিশ্বাস কর আমাকে। জানলে আমি তোমাকে বলতাম।

তারপরেই থেমে গেলেন গুরু শুক্রাচার্য। তিনি কি সত্য কথা বললেন তাঁর কন্যাকে! দেবযানীর জন্মের কথা কি এই সরল কিশোরীকে অকপটে বলা চলে? দেবতাদের চক্রান্তের কথা কি প্রকাশ করা যায়? শুক্র তৎপর ভাবে বললেন : তুমি সংযত হও মা, আমি এখন ধ্যানে বসব।

বলে তিনি অগ্নিহোত্রে প্রবেশ করে ধ্যানে বসলেন। কিন্তু মনোনিবেশ করতে পারলেন না। দেবযানীর জন্মের কাহিনী তাঁর মনে এল চলচ্চিত্রের মতো।

বারে বারে অসুররা দেবতাদের কাছে পরাজিত হচ্ছে। শক্তিতে নয়, পরাক্রমে নয়; কখনও ছলনায়, কখনও বিষ্ণুর কৌশলে। ইলাবৃত বর্ষ থেকে বিতাড়িত দেবতারা ক্ষীরোদ সাগরের তীরে বিষ্ণুর আশ্রয় নিচ্ছে। বিষ্ণুর চেষ্টাতেই তারা তাদের রাজ্য উদ্ধার করছে, অসুররা নির্বাসিত হচ্ছে পাতালে। সমুদ্রের তীরে এই পাতাল রমণীয় দেশ হলেও ইলাবৃত বর্ষ তাদের

জন্মভূমি। একই পিতার পুত্র তারা। সহোদর ভ্রাতা নয় বলেই কি তারা অবাঞ্ছিত? তাপস শ্রেষ্ঠ শুক্রের কাছে তারা আশ্রয় নিয়েছে। বলেছে, গুরুদেব, অন্যায়ের প্রতিবিধান করুন।

অন্যায়!

হ্যাঁ অন্যায়ই। ধর্ম যুদ্ধে তো আমরা পরাজিত হই না, আমরা পরাজিত হচ্ছি অধর্মের হাতে।

তোমরাও কি অধর্ম করে জয় লাভ করতে চাও?

না গুরুদেব, আমরা এমন শক্তি চাই যে অধর্ম করেও দেবতারা আমাদের আর জয় করতে পারবে না। আপনি আমাদের বাঁচাতে জানেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী! আপনি অপরাজেয় করুন আমাদের, বিষ্ণুও যেন ব্যর্থ হয় আমাদের জয় করতে।

শুক্র বললেন, সে তো আমার মন্ত্রশক্তি, মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র আমি তপস্যা করে পেয়েছিলাম। সেই মন্ত্রশক্তি দিয়ে আমি তোমাদের জীবিত রাখতে পারি। দেবগুরু বৃহস্পতি এই মন্ত্র জানেন না, যুদ্ধে নিহত দেবতাদের বাঁচাবার শক্তি তাঁর নেই।

কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের চেয়ে যে মৃত্যু ভাল গুরুদেব।

শুক্র সেদিন বলেছিলেন, তাহলে আমি আবার কৈলাসে যাব দেবাদিদেব মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করতে। একমাত্র তিনিই দিতে পারেন অপরাজেয় হবার মন্ত্র। কিন্তু দেবতাদের বিরুদ্ধে অপরাজেয় হবার মন্ত্র কি তিনি দেবেন?

অসুররা বলেছিল, কেন দেবেন না প্রভু? আমরা তো তাঁর কাছে কোন অপরাধ করি নি, কোন অন্যায় করি নি, অধর্মের কাজও করি নি। কেন তিনি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন! অক্ষুণ্ণ রাখবেন অধর্মের জয়কে!

তিনি দেবাদিদেব, সকলের প্রভু তিনি। তাঁরই ইচ্ছায় জগৎ পরিচালিত হচ্ছে।

তাঁকে আমাদের দুর্দশার কথা আপনি বুঝিয়ে বলুন, গুরুদেব।

বলব, নিশ্চয় বলব। তোমাদের জন্য আমি অসাধ্য সাধন করব। যত দিন তোমরা ধর্ম পথে থাকবে, শুধু তত দিন। তোমাদের জন্যেই আমি কৈলাসে যাব, তপস্যা করব মহাদেবের তুষ্টির জন্যে। কত দিনে তিনি তুষ্ট হবেন জানি না। কিন্তু আমার অবর্তমানে তোমাদের কী গতি হবে? কে তোমাদের রক্ষা করবে?

আমাদের জন্যে ভাববেন না প্রভু। আমরা শান্তির প্রস্তাব নিয়ে যাব দেবতাদের কাছে। তারা তা অগ্রাহ্য করলে আমরা আশ্রয় নেব আপনার মায়ের আশ্রমে। বিপদে তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।

বেশ, তাই হবে। কাল প্রত্যুষেই আমি যাত্রা করব। দেবতাদের সঙ্গে তোমরা এখন কোন বিবাদে লিপ্ত হবে না, এড়িয়ে চলবে সব রকম বিবাদ।

তাই হবে গুরুদেব, আপনার আদেশ আমরা অমান্য করব না।

শিষ্যদের নিকটে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে শুক্র হিমালয় যাত্রা করলেন। দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে পৌঁছলেন কৈলাসে। কোন প্রার্থনা না জানিয়ে তিনি মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন।

নন্দী বললেন, কী জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে কৈলাসে এসেছ, প্রভুকে তা বলবে না?

তিনি সন্তুষ্ট না হলে আমি কিছুই চাইব না।

পার্বতী মহাদেবকে বললেন, ওর প্রার্থনা পূরণ কর।

মহাদেব বললেন, ওতো সামান্য প্রয়োজনে আসে নি. ও অসাধ্য সাধনের মন্ত্র চায়। ওর শিষ্য-অন্ত প্রাণ। তাদের জন্যেই ও এসেছে, নিজের প্রয়োজনে নয়। যে নিজের জন্য কিছু চায় না, চায় পরের জন্যে, তাকে আমি ফেরাতে পারি না।

তবে তার প্রার্থনা পূরণ করছ না কেন?

ওতো সবার মঙ্গলের জন্যে কিছু চাইতে আসে নি! সে চাইতে এসেছে শুধু তার শিষ্যদের জন্যেই। একজনের উপকারে অন্য জনের যে অপকার হবে।

শুক্র সবই শুনলেন, বুঝলেনও সবই। এও বুঝলেন যে তাঁকে কঠোর তপস্যা করতে হবে। তাপস শ্রেষ্ঠ মহাদেবকে জয় করতে তপস্যাই একমাত্র মন্ত্র। প্রাণপণ করে তপস্যাতেই তাঁকে পেয়েছেন পার্বতী উমা। পঞ্চ শরে বিদ্ধ করে মদন তাঁর তপোভঙ্গ করতে পারে নি, তপস্যার জোরেই পার্বতী তা পেরেছিলেন। শুক্র তাঁর মন স্থির করে ফেললেন, হয় সিদ্ধি নয় মৃত্যু। এ দুয়ের মধ্যে কোন সন্ধি নয়। যে গুরুর জীবন শিষ্যের প্রয়োজনে লাগে না, সে জীবনের কোন মূল্য নেই। শিষ্যের মঙ্গল করতে না পারলে সে জীবনে গুরুরই বা প্রয়োজন কী!

একদিন পার্বতী বললেন, ও কি জীবন বিসর্জন দেবে তোমার সামনে? তোমার অভিধানে অসাধ্য বলে তো কোন কথা নেই, তুমি ওকে তপস্যার পথ বলে দিচ্ছ না কেন? তপস্যা করেই সে লাভ করুক তার প্রার্থিত বস্তু। ব্যর্থ হলে সে নিজেই ফিরে যাবে। তখন তুমি ফিরিয়ে দিও তাকে।

মহাদেব মেনে নিলেন এই কথা। শুক্রকে বললেন, তুমি যা চাও তা স্পষ্ট করে বল।

শুক্র বললেন, আমাকে এমন কোনো বিদ্যা দিন যা দেবগুরু বৃহস্পতির অজ্ঞাত এবং সেই বিদ্যার বলে আমি যেন আমার শিষ্যদের জয় সুনিশ্চিত করতে পারি।

মহাদেব বললেন, তুমি নিজের জন্যে কিছু চাও।

প্রভু, আমি তো নিজের জন্যেই সেই বিদ্যা চাইছি যে বিদ্যার বলে আমি আমার শিষ্যদের অজেয় করব।

মহাদেব ভাবলেন এক মুহূর্ত। তারপর বললেন, অসাধ্য সাধন করেই এই বিদ্যা লাভ হয়। তুমি নির্জনে গিয়ে শুধু অগ্নিকুণ্ডের ধূম পান করে তপস্যা করে যাও। নিজের সুখের চিন্তা কোরো না। একদিন তোমার সিদ্ধি লাভ হবে।

মহাদেবকে প্রণাম করে শুক্র তপস্যা করতে গেলেন।

আজ এই অগ্নিহোত্রের সামনে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে বসে শুক্রের মনে পড়ছে সেই কঠোর তপস্যার কথা। জনমানবহীন নির্জন পাহাড়ে, উন্মুক্ত আকাশের নিচে, শীতার্ত বাতাসের মধ্যে, অনাহারে অনিদ্রায় সেই একমাত্র চিন্তা—শিষ্যদের অজেয় করতে হবে। সামনে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, ধোঁয়া উঠছে অল্প অল্প। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই ধোঁয়া যাচ্ছে তাঁর নাকে ও মুখে। কিন্তু এই অগ্নিকুণ্ডে কে জোগাচ্ছে কাঠ? কে পরিচর্যা করছে অগ্নির?

শুক্র তাঁর চোখ মেলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ যে এক দেবকন্যা লজ্জায় জড়িত পদে কম্প্র বক্ষে নম্র নেত্রপাতে তাঁরই সেবায় নিরত। শুক্র বললেন, কে তুমি?

আমি কোন পণ্যা নারী নই, প্রভু। স্বর্গের অপ্সরাও নই। আমি দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তী। সেবার অভাবে আপনার তপস্যায় যাতে বিঘ্ন না হয়,

আমি সেই জন্যেই এসেছি।

নিজে থেকে?

না প্রভু, আমার পিতা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

আশ্চর্য! সে তো তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টির জন্যেই অপ্সরাদের পাঠায়। তবে সে তোমাকে পাঠাল কেন?

তাতো জানি না প্রভু। ধ্যানে আপনি তা জেনে নিন।

শুক্র অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের কী উদ্দেশ্য তাই ভাবতে লাগলেন গভীর মনোযোগে।

ইন্দ্র কেন তাঁর কন্যা জয়ন্তীকে পাঠিয়েছেন তপস্যারত দৈত্যগুরুর সেবায়, তা আজও তাঁর কাছে একটা রহস্য হয়ে আছে। শুক্র আজও এই প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পান নি। দিনের পর দিন জয়ন্তী তাঁর সেবা করেছে পরম যত্নে, তপে বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা কোন দিনই করে নি। তার জন্যেই যে তিনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, সে কথা তো অস্বীকার করতে পারেন না। তবে কি তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যা বলেই অবিচার করেছিলেন জয়ন্তীর উপরে? ইন্দ্র তাঁর শত্রু বলে জয়ন্তীকেও শত্রু ভেবেছিলেন?

তাঁর অবর্তমানে কত কী ঘটে গেছে, তপস্যারত দৈত্যগুরু তা জানেন না। জানলে ইন্দ্রের অভিসন্ধি তিনি হয়তো বুঝতে পারতেন। দৈত্য ও দানবকুলকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত করে দেবতারা উৎসব করছিলেন। কিন্তু গুরু বৃহস্পতি বললেন, আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

ইন্দ্র বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন?

বৃহস্পতি বললেন, আগুনের মতো শত্রুরও শেষ রাখতে নেই। তা রাখলে আবার তারা প্রবল হয়ে উঠবার সুযোগ পায়।

কিন্তু তারা তো রণে ভঙ্গ দিয়ে আত্মগোপন করেছে!

তারা শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে কিনা, তা কি বলতে পার?

দেবতারা গুরুকে সমর্থন করে বললেন. তাহলে আমাদের তৎপর হওয়াই উচিত। আনন্দ-উৎসবের অনেক সময় পাওয়া যাবে, আগে তাদের শেষ করে আসি।

এই বলে তারা ইন্দ্রের আদেশ নিয়ে যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হল।

চরের মুখে এই সংবাদ পৌঁছল অসুরদের কাছে। তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। গুরু তপস্যায় গেছেন, কবে ফিরবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাদের রাজা বলিকে বন্ধন করে বিষ্ণু তাঁকে পাতালে পাঠিয়েছেন। তিনি সেখানে কোথায় কেমন আছেন, তা তারা জানে না। পিতামহ প্রহ্লাদ গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যা করছেন। তাঁর পুত্র বিরোচন তো আগেই নিহত হয়ে ছিলেন। পৌত্র বলির হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে তিনি তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। গন্ধমাদন পর্বতের পথ তারা চেনে। সেখানে গিয়ে প্রহ্লাদকেই সব কথা জানাতে হবে। এ ছাড়া নিজেদের রক্ষা করার কোন পথ নেই।

একজন বলল, পিতামহ এই বিপদে কী করবেন? তিনি কি আমাদের জন্য আবার অস্ত্র ধারণ করবেন?

অন্য জন বলল, তিনি ধর্মাত্মা বলে দেবতারাও তাঁকে সম্মান করে। তিনি শান্তির প্রস্তাব নিয়ে গেলে দেবতারা তা অমান্য করবে না।

তিনি এ কাজে রাজী হবেন কেন?

আমাদেব বিপদ দেখে তিনি নিশ্চয়ই রাজী হবেন। কিন্তু আমরা যে গুরুদেবকে অন্য কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, প্রয়োজন হলে তাঁর মায়ের আশ্রমে আমরা আশ্রয় নেব।

দেবতারা যদি সেখানেও আমাদের আক্রমণ করে?

করবে না। মায়ের অসম্মান তারা করতে পারে না।

যাদের ধর্ম নেই, তারা সব পারে।

অনেক মন্ত্রনার পরে স্থির হল যে প্রথমে পিতামহ প্রহ্লাদের কাছেই তারা যাবে এবং তাঁকে রাজী করাবে দেবতাদের কাছে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে যেতে।

প্রহ্লাদ প্রথমে রাজী হন নি। বলেছিলেন, রাজনীতি থেকে আমি অবসর নিয়েছি। রাজ্য ত্যাগ করে সুখে আছি এখন। এ সবের মধ্যে আর নিজেকে জড়াতে চাই নে।

দৈত্যদের মধ্যে যে বড় সে বলল, তবে কি আপনি চান যে আপনার বংশে বাতি দেবার জন্যেও কেউ বেঁচে না থাক!

প্রহ্লাদ বিস্মিত হয়ে বললেন, এই রকম অবস্থা তোমাদের!

তারা বলল, দৈত্য ও দানব বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বিশ্ব থেকে। দেবতারা তারই উদ্যোগ করছেন। বলছেন, শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

এবারে আক্রমণ করলে আমাদের একজনও আর বাঁচবে না। মহারাজা বলির নির্বাসনের পরে বারে বারে আক্রমণ করে তারা আমাদের সমস্ত বীর সেনাপতিদের বধ করেছে। আপনার বংশে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো আর কেউ এখন বেঁচে নেই।

প্রহ্লাদ আশ্চর্য হয়ে বললেন, গুরুদেব তাদের বাঁচাতে পারেন নি?

পারবেন কী করে! যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের মৃতদেহ তো খুঁজে পাওয়া যায় নি! দেবতারা জানতে পেরেছে যে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে গুরুদেব তাদের বাঁচিয়ে তোলেন। তাই তারা নিজেরাই মৃতদেহ টেনে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলছে। তাদের নাম ধরে ডেকে গুরুদেব কোন সাড়া পান নি। মনের দুঃখে তিনি তপস্যা করতে গেছেন যুদ্ধে আমাদের অপরাজেয় করবেন বলে। আমরা তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তিনি না ফেরা পর্যন্ত আমরা কোন বিবাদে লিপ্ত হব না।

পিতামহ প্রহ্লাদ ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, গুরুদেবের শিক্ষাও তাই। শৈশবেই আমরা তাঁর নিকটে জেনেছিলাম যে শত্রু প্রবল হলে দেশ কাল ও বল জেনে সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চারটি উপায় প্রয়োগ করতে হয়। এই নীতির কথা তোমরা জানো?

তারা বলল, না।

সাম হল সন্ধি করে শান্ত ভাবে সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করা, আর দান হল শত্রু পক্ষের শক্তিশালী ব্যক্তিকে উৎকোচে বশীভূত করে স্বপক্ষে আনা।

ভেদ?

শত্রুপক্ষের মধ্যে কৌশলে ভেদ সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করা এবং দণ্ড প্রয়োগ মানে সবলে বশ করা। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে এক মত যে সময় বুঝে এর এক একটি উপায় গ্রহণ করতে হবে। তোমাদের যে অবস্থা, তাতে গুরুদেবের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিত। তিনি ফিরে এসে যা বলবেন তাই করবে।

দৈত্যরা বলল, কিন্তু তত দিন আমরা প্রাণে বেঁচে থাকব তো?

প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন, দুঃসময় এলে বুদ্ধিমানেরা শত্রুর সেবা করতেও দ্বিধা করে না। তোমরাও তাই কর। তারপর যখন বুঝবে যে নিজেদের যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় হয়েছে, তখন স্বমূর্তি প্রকাশ করবে।

কিন্তু শত্রুর সেবা করতে আমাদের বলবেন না পিতামহ, অত হীন হতে

আমরা পারব না। আমরা শান্ত প্রকৃতির তপস্বী হয়ে বাস করছি, দয়া করে এই কথাটি আপনি দেবতাদের জানিয়ে আসুন।

প্রহ্লাদ বললেন, এ'কথা তোমরাই কেউ জানিয়ে এসো।

আমাদের কথা দেবতারা বিশ্বাস করবে না, বিশ্বাস করবে আপনার কথা। আমাদের হিতের জন্য আপনি শুধু এই কাজটুকু করুন।

প্রহ্লাদকে রাজী হতে হল। তিনি গিয়ে দেবতাদের বললেন এই কথা।

বৃহস্পতি বললেন, তুমি বলছ এই কথা ?

তারা আমাকেই এই কথা বলবার জন্য পাঠিয়েছে। সত্যই এখন তারা নিতান্তই হীনবল বলে আর যুদ্ধ করতে চায় না। বলছে, এখন থেকে তারা তপস্বীর মতো শান্ত জীবন যাপন করবে।

বৃহস্পতি বললেন, অসুররা শান্ত হয়ে বসবাস করবে, এ কথা বিশ্বাস যোগ্য নয়। দেবতাদের তারা প্রতারণা করতে চায়।

কিন্তু দেবতারা বললেন, অবিরত যুদ্ধ করে আমরাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমরাও শান্তি চাই, আমরাও আর যুদ্ধ করব না।

দেবরাজ ইন্দ্র গুরু বৃহস্পতির দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, বেশ তবে দেখাই যাক, কত দিন তারা শান্ত থাকে। তবে আমি এখনই তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই যে এখন তারা শক্তিহীন, তাদের জয় করা সহজ। পরে তারা শক্তি সঞ্চয় করে পূর্বের মতোই দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে। বেগ পেতে হবে তোমাদেরই।

দেবতারা কোনো উত্তর দিল না দেখে ইন্দ্র প্রহ্লাদকে বললেন, আপনি এই কথা ওদের বুঝিয়ে বলবেন। ওরা যেন ছলনা বা প্রতারণার আশ্রয় না নেয়।

প্রহ্লাদ ফিরে এসে অসুরদের সব কথা জানিয়ে গন্ধমাদন পর্বতে ফিরে গেলেন।

কিন্তু ইন্দ্র চুপ করে রইলেন না। তিনি চর পাঠিয়ে খবর সংগ্রহ করলেন অসুরদের। জানতে পারলেন যে তাদের গুরু শুক্রাচার্য পুনরায় তপস্যা করতে গেছেন কৈলাসে, শিষ্যদের জন্য নূতন কোন মন্ত্র আনতে। এখন তিনি মন্ত্র ও ওষধি দিয়ে মৃত অসুরের প্রাণ দান করতে পারেন। এবারে তাদের

জন্য আর কোন্ বিদ্যা আনবেন তা জানা নেই। তিনি ফিরে এলে তাদের বোধ হয় আর জয় করাই সম্ভব হবে না। চিন্তান্বিত হলেন ইন্দ্র। দেবগুরু বৃহস্পতিকে এ কথা জানাতেই তিনি বললেন, আমি এই রকমই একটা ষড়যন্ত্রের সন্দেহ করেছিলাম। তা না হলে তারা প্রহ্লাদকে পাঠাত না।

এখন উপায় ?

উপায় একটাই। অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করে শেষ করে দাও সবাইকে। তাদের গুরু ফিরে এসে যেন একজন শিষ্যকেও না পায়।

ইন্দ্র বললেন, ঠিক বলেছেন। অতর্কিতেই আমরা তাদের আক্রমণ করব।

ইন্দ্র সেনাপতিকে বললেন সেনা সাজানোর জন্য। রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই অসুরকূল ধ্বংস করতে হবে, এই স্থির করে তারা রণসজ্জা করলেন।

দৈত্য ও দানবরা তখন তাদের পিতা কশ্যপের আশ্রমে নির্ভয়ে বাস করছিল। দেবতাদের সঙ্গে সন্ধি হয়েছে, যুদ্ধ আর হবে না। তারাও আশ্বাস দিয়েছে যে এখন তারা তপস্বীর মতো বল্কল পরে তপস্যা করবে। তাই তারা নিশ্চিন্তে নিদ্রিত ছিল। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বেই তারা মার-মার শব্দ শুনে জেগে উঠল। মশাল হাতে দেবতারা আসছে তাদের আক্রমণ করতে। চিৎকার করে বলছে, এসো, মরবার জন্যে অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এসো তোমরা।

অপ্রস্তুত অসুরেরা ঘুম ভেঙ্গে উঠেই দেখল অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত দেবতাদের। তাদের হাতে কোন অস্ত্র নেই, নিরস্ত্র তারা কশ্যপের আশ্রমে। ভয়ার্ত স্বরে তারা চিৎকার করে উত্তর দিল, আমরা যুদ্ধ করতে চাই না, অস্ত্র ত্যাগ করেছি আমরা। দেখছ না, তপস্যার জন্য আমরা বল্কল পরেছি।

দেবতারা বলল, তোমাদের ছলনা আমরা জেনে ফেলেছি। নতুন মন্ত্র আনতে তোমরা গুরুকে পাঠিয়েছ তপস্যা করতে। তারপর তোমরা আমাদের আক্রমণ করবে তো! তোমাদের সময় চাই, তাই সন্ধি করেই তোমরা সময় নিচ্ছ! আমরা বোকা নই, আমরা সব বুঝি। তোমাদের মিষ্টি কথায় আর আমরা ভুলব না।

অসুররা এই বিপদ দেখে ভয় পেয়ে গেল। সত্যিই তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বলল, যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করেছ তোমরা, অন্ধকারে

অতর্কিতে আক্রমণ করেছ আমাদের। আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় কেমন করে যুদ্ধ করব ?

তবে মর।

কিন্তু অসুররা গুরুকে কথা দিয়েছে, সন্ধি করেছে দেবতাদের সংগে। তাই যুদ্ধ না করে অন্ধকারেই তারা অরণ্যের পথ ধরে পালিয়ে গেল। কাছে এসে দেবতারা দেখলেন, কশ্যপের আশ্রমে আর একজনও অসুর নেই।

কোথায় গেল তারা ?

না, কশ্যপ জানেন না তারা কোথায় গেছে।

খোঁজ তাদের। এ সুযোগ ছেড়ে দেওয়া যাবে না। দেবগুরু বৃহস্পতি ঠিকই বলেছেন. শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

কিন্তু কোথায় খুঁজতে যাব তাদের ?

ইন্দ্র তাকালেন দেবগুরু বৃহস্পতির মুখের দিকে। বৃহস্পতি এক মুহূর্ত ধ্যান করে বললেন, মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে যাও। অসুরেরা নিশ্চয়ই তাদের গুরুর পিতার আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু মহর্ষি ভৃগু এখন আশ্রমে নেই। তপস্যার জন্য তিনি তো ভৃগুকচ্ছে গেছেন।

অসুররা তাহলে ভৃগু-পত্নীর আশ্রয় নিয়েছে।

ইন্দ্র বললেন, সেখানে আমরা কোন্ সাহসে যাব!

বৃহস্পতি বললেন, তোমরা নির্ভয়ে যাও। আমি বিষ্ণুর কাছে যাচ্ছি। তিনি এসে পড়লে তোমাদের আর কোন ভাবনা থাকবে না। যে কোন বিপদ থেকে তিনিই রক্ষা করবেন তোমাদের।

বলে বৃহস্পতি দ্রুত বেগে প্রস্থান করলেন। আর ইন্দ্র দেবতাদের নিয়ে অগ্রসর হলেন মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমের দিকে।

বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করে দৈত্যরা মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে এসে উপস্থিত হল। গুরু শুক্রাচার্যের মা তাদের ভয়ে বিহ্বল দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে তোমাদের ? এমন বিচলিত দেখছি কেন ?

দৈত্যরা বলল, আমরা আর বাঁচব না, মা।

কেন ?

আমাদের মেরে ফেলবার জন্যে আসছে দেবতারা। তারা আমাদের পিছু নিয়েছে।

তোমাদের মারবে কেন? কী দোষ করেছ তোমরা?

কোন দোষ করি নি। যুদ্ধে হেরে গিয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেছি আমরা। আমাদের গুরুদেব গেছেন কৈলাসে তপস্যা করতে। আমাদের পিতামহ যখন দেবতাদের কাছে গিয়ে বলেছিলেন যে আমরা আশ্রমে বল্কল পরে তপস্বীর শান্ত জীবন যাপন করব, তখন তারা অভয় দিয়েছিল আমাদের। আর এখন তারা ধর্ম মানছে না। পিতার আশ্রমে আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিল, আমরা পালিয়ে তোমার আশ্রমে এসেছি। যুদ্ধ করব না বলে গুরুদেবকে কথা দিয়েছি আমরা।

যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তারা তাঁর পায়ের উপরে লুটিয়ে পড়ে বলল, তুমি রক্ষা না করলে এ বিপদে আমাদের আর কেউ নেই।

ভৃগুপত্নী বললেন, ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন. রক্ষা করবে ধর্ম। এই আশ্রমে তোমরা নির্ভয়ে বাস কর।

দৈত্যরা চেঁচিয়ে উঠল. জয় হোক আমাদের মায়ের।

তারপর সবাই বলাবলি করতে লাগল. মায়ের কাছে আশ্রয় যখন পেয়েছি, তখন আর আমাদের কোন ভয় নেই।

কিন্তু ভৃগুপত্নী চিন্তায় ক্লিষ্ট হতে লাগলেন। প্রবল শক্তিধর তাঁর স্বামী গেছেন তপস্যায়। তাঁর ফিরে আসবার সময় হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই যদি দেবতারা তাঁর আশ্রম আক্রমণ করে, তাহলে তিনি কেমন করে তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখবেন! কেমন করে রক্ষা করবেন তাঁর পুত্রের এই শিষ্যদের! তিনি নারী বলে দেবতারা নারীর অমর্যাদা করবে না, এই তো তাঁর ভরসা। কিন্তু যারা কথা দিয়ে কথা রাখে না, তাদের আবার ধর্ম কোথায়! এই ভাবনা নিয়েই তিনি বিনিদ্র রজনী কাটালেন।

কিন্তু দৈত্যরা ঘুমিয়েছিল নিশ্চিন্তে। সন্তান যদি মায়ের আশ্রয়ে থাকে, তবে তার কোন বিপদ নেই। সন্তানকে মা বাঁচাবেন নিজের প্রাণ দিয়ে, জগতের এই ধর্ম। তাই মায়ের সম্মান রক্ষার জন্য সন্তানকে আক্রমণ করার অধিকার নেই কারও। সে অধর্ম পৃথিবী কখনও সইবে না, সইবে না পৃথিবীর কোন প্রাণী। এই মাতৃত্বই নারীর পরিণত রূপ, সত্য রূপ। তাই দেশকাল নির্বিশেষে নারীর মর্যাদা রক্ষায় সবাই সচেষ্ট।

কিন্তু বেশিক্ষণ তারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারল না। শত্রু এল ব্যূহ ভেদ করে তাদের হত্যা করতে। চিৎকার করে বলল, তোমরা আশ্রয় নিয়েছ এইখানে? বেরিয়ে এসো এখনি। যুদ্ধ কর আমাদের সঙ্গে।

কিন্তু যুদ্ধ করব কেমন করে? পিতামহের আদেশে আমরা যে অস্ত্র ত্যাগ করেছি, পরেছি বল্কল। তপস্বীর মতো শান্ত পবিত্র জীবন যাপনে আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ। কেমন করে আমরা ধর্ম ত্যাগ করব?

তবে তোমরা তপস্যার জন্য গুরুকে পাঠিয়েছ কেন? কেন ছলনা করে সন্ধি করেছ আমাদের সঙ্গে?

আমরা তো ছলনা করি নি, শর্ত ভঙ্গ করি নি। যুদ্ধ করলেই আমাদের সঙ্কল্প ভঙ্গ হবে। এ কাজ তোমরা করছ। তোমরা অভয় দিয়েছিলে আমাদের। শান্তির আবেদন তোমরা মেনে নিয়েছিলে। আজ কেন ধর্ম ত্যাগ করে আমাদের বধ করতে এসেছ?

ইন্দ্র বললেন, তর্ক নয়, বেরিয়ে এসো তোমরা। বাঁচতে চাইলে যুদ্ধ কর।

এই সময়ে বেরিয়ে এলেন দৈত্য গুরুর কল্যাণময়ী মা। বললেন, না, এরা আশ্রমের বাইরে যাবে না। আমি আশ্রয় দিয়েছি এদের, অভয় দিয়েছি। তোমরা ফিরে যাও।

দেবতারা পরস্পরের মুখের দিকে চাইল। কিন্তু ইন্দ্র উচ্চ কণ্ঠে বললেন, ফিরে যাবার জন্য আমারা আসি নি। এই অনাচারী অসুরদের আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

না। এদের কাউকে তোমরা পাবে না।

তবে বাধ্য হয়েই আমাদের আশ্রমে ঢুকতে হবে।

ভৃগুপত্নী বললেন, ভাল হবে না তার পরিণাম। আমি তোমাদের সাবধান করছি। মহর্ষির তপস্যার আগুনে ভস্ম হবে তোমরা।

তার আগেই অসুরদের আমরা ধ্বংস করে যাব।

ভৃগুপত্নী তাঁর দুই হাত জুড়ে আকাশের দিকে তাকালেন, বললেন, হে ঈশ্বর, হে ধর্ম, জগতের সমস্ত প্রাণীই তোমাদের আশ্রিত। আমি যদি এ জীবনে কোন অধর্ম করে না থাকি, তবে আজ এই বিপদের মুহূর্তে তোমরা আমার সহায় হও। পরম নিষ্ঠায় আমি সতীর ধর্ম পালন করেছি, প্রাণ দিয়ে পালন করেছি মায়ের ধর্ম। আজ এই আশ্রমে আমার পতি নেই, পুত্র নেই। আছে আমার সন্তানরা। তাদের আমি অভয় দিয়েছি। এই ধর্মহীন দেবতারা

যেন এই মুহূর্তে নিদ্রায় অভিভূত হয়ে যায়।

আকাশ থেকে কোন উত্তর এল না, এল আশ্বাস। দৈত্যরা আশ্চর্য হয়ে দেখল, দেবতারা হাই তুলছে, শ্রান্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাদের। বলছে, দেবরাজ, আমরা আর পারছি না। পথ শ্রমে ক্লান্ত হয়েছি আমরা। বিশ্রামের দরকার। আগে ঘুমিয়ে নিই, তারপর আক্রমণ করব অসুরদের।

বলে তারা পিছিয়ে এল। ইন্দ্র অসহায় ভাবে তাকালেন দেবতাদের দিকে। পথ শ্রমে তিনি নিজেও ক্লান্ত। বললেন, তাই হোক।

আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠল দৈত্যরা। বলল, মা, তুমি শুধু আমাদের মা নও, তুমি এই পৃথিবীর মা। আমরা ঠিকই বুঝেছিলাম, তোমার আশ্রয়ে আমাদের কোন ভয় নেই।

কিন্তু তাদের এই আনন্দ ও আশ্বাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হল না। বিষ্ণুকে নিয়ে বৃহস্পতি এসে উপস্থিত হলেন। দেবতাদের নিদ্রামগ্ন দেখে তাদের জাগাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বৃহস্পতি বললেন, মনে হচ্ছে এরা কোন দৈব শক্তিতে সম্মোহিত হয়েছে।

বিষ্ণু ইন্দ্রকে জাগিয়ে বললেন, এ কী করছ তোমরা? এ নিদ্রা যে তোমাদের কাল নিদ্রা হতে পারে।

ইন্দ্র কোন রকমে বললেন, তা বুঝেও যে কিছু করতে পারছি না।

বিষ্ণু বললেন, অসুররা এই সুযোগে তোমাদের সবাইকে বধ করতে পারে।

কিন্তু ইন্দ্র জানেন যে অসুররা তা করবে না, করতে পারবে না। তাদের যে নীতিবোধ তাতে ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন অন্য সময়ে তারা শত্রু নিপাত করবে না। বধ করতে হলে তারা ঘুম থেকে জাগিয়ে আগে অস্ত্র তুলে দেবে শত্রুর হাতে, তার-পরে দম্ভ করে বলবে, এসো, এই বারে যুদ্ধ কর আমাদের সঙ্গে। তা না হলে এতক্ষণ তাঁরা একজনও জীবিত থাকতেন না। ইন্দ্র বিষ্ণুকে এসব কথা বললেন না, তার বদলে বললেন, আমরা ঘুমে কাতর হয়ে আছি, আপনি এর উপায় বিধান করুন।

বিষ্ণু অসুরদের ডাকলেন, তোমরা এগিয়ে এসো।

ইন্দ্র বললেন, তারা আসবে না, আপনি শাসন করুন ভৃগুপত্নীকে, তিনি রক্ষা করছেন তাদের।

বৃহস্পতি বললেন, স্ত্রীলোক বলে আপনি কোন দ্বিধা করবেন না। স্ত্রী

যদি পুরুষের ন্যায় আচরণ করেন, তবে তিনি আর স্ত্রী বলে শাসনের অযোগ্য নন। ভৃগুপত্নী এখন পুরুষের কার্য করছেন, কাজেই তাকে আক্রমণ করলে অধর্ম হবে না।

ইন্দ্র বললেন, দেবগুরু যখন এই বিধান দিয়েছেন, তখন আর আপনার দ্বিধা কেন! ভৃগুপত্নীকে আপনি আহ্বান করুন।

দৈত্য গুরু শুক্রাচার্যের মাতা এগিয়ে এসে বললেন, কষ্ট করে আমাকে আহ্বান করতে হবে না। আমি নিজেই এসেছি। আমাকে কী করতে হবে বল।

বিষ্ণু বললেন, অসুরদের সমর্পণ করুন আমাদের হাতে।

না করলে?

অস্ত্র গ্রহণে আমাকে বাধ্য করবেন না।

মা হয়ে আমি কি সন্তানদের এগিয়ে দেব বলির জন্য! আমি দেবতা নই, আমি মানুষ। মানুষের কাছে তার সন্তানের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। আগে আমাকে বধ কর, তারপর হাত দিও আমার সন্তানদের দেহে।

বিষ্ণু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভৃগুপত্নীর তেজস্বিতায়। বললেন, আপনি আমাকে স্ত্রী বধে বাধ্য করছেন।

আমি তোমাকে বাধ্য করছি না, তুমি স্বেচ্ছায় এই অকার্যে উদ্যত হয়েছ।

বৃহস্পতি বললেন, অযথা বাক্য ব্যয় করবেন না।

ইন্দ্র বললেন, বিলম্ব করছেন কেন?

বিষ্ণু আর ইতস্তত না করে চক্র নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু তাঁর হাত কেঁপে গেল। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। পিছনে বজ্রের মতো গর্জন শুনে সবাই ফিরে দেখল, অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছেন মহর্ষি ভৃগু। বিষ্ণুর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, পাপিষ্ঠ নরাধম, অপেক্ষা কর ক্ষণকাল। আমার প্রথম কর্তব্য সম্পাদন করে তোমার বিচার করব।

বলে এগিয়ে গেলেন তাঁর পত্নীর দিকে। চক্রাঘাতে তিনি আহত হয়েছিলেন এবং সংজ্ঞা হারিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। মহর্ষি ভৃগু তাঁর কমণ্ডলু থেকে শীতল জল তাঁর চোখে মুখে সিঞ্চন করতেই তিনি সংজ্ঞা লাভ করলেন। তাই দেখে ভৃগু বললেন, তোমার আঘাত গুরুতর নয়। আমি

ওষধি দিয়ে তোমাকে অবিলম্বে নিরাময় করব।

তারপর বিষ্ণুর দিকে ফিরে বললেন, তুমি একের পর এক অধর্ম করে কাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়েছ। তাই আজ স্ত্রী বধে উদ্যত হয়েছিলে। তোমার পূর্বার্জিত পুণ্যফলের সামান্যই অবশিষ্ট আছে, তারই জন্য আজ এই স্ত্রী হত্যার পাপ হল না।

বিষ্ণু দাঁড়িয়ে রইলেন অধোবদনে। আর ভৃগু বলে যেতে লাগলেন, এরা সবাই জানে যে তোমরা অধর্ম করে বধ করেছিলে এদের দুই পূর্ব পুরুষ— হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুকে। বৃত্র বধেও তুমি ইন্দ্রের সহায়তা করেছিলে। সেই ব্রহ্মহত্যার পাপে ইন্দ্র পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল। সেই সময়ে দেবতারা চন্দ্রবংশের নহুষকে নিয়ে গিয়ে ইন্দ্র পদে অধিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু আজকের এই অপরাধের জন্য ইন্দ্রকে আমি অভিশাপ দেব না, সে তার কর্মফলের সমুচিত শাস্তি পাবে অচিরে। কিন্তু তুমি পাবে না। এদের পরম ধার্মিক রাজা বলিকে তুমি ছলনায় বন্ধন করে পাতালে নির্বাসিত করেছ, তা না করলে তোমার প্রিয় ইন্দ্র স্বর্গের অধিকার ফিরে পেত না।

ভৃগুপত্নী এগিয়ে এসে বললেন, ক্ষমাই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম। ক্ষমা করেই শান্ত হয় হৃদয়, ক্রোধ প্রকাশে নয়। আপনি এদের ক্ষমা করুন, প্রভু।

সবাইকে আমি ক্ষমা করেছি। কিন্তু বিষ্ণুকে ক্ষমা করব না, কঠিন কোন অভিশাপও দেব না। ভবিষ্যতে যাতে তার চৈতন্য লাভ হয়, আমি তাকে সেই বর দিচ্ছি। এর পর বারে বারে সে মানুষ মায়ের গর্ভে জন্ম নেবে, গর্ভ যন্ত্রনা থেকে মৃত্যু যন্ত্রনা পর্যন্ত ভোগ করবে মানুষের মতো। জীবনের যন্ত্রনাই তাকে মহত্তর জীবনের সন্ধান দেবে। সে বুঝতে পারবে যে দম্ভ নিয়ে দেবতা হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হতে হলে চাই হৃদয়। যে দিন সে মানুষের ধর্ম প্রচার করতে পারবে, সেই দিনই হবে তার মুক্তি।

বিষ্ণু নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন দেবতাদের নিয়ে।

অমরাবতীতে ফিরে এসে দেবরাজ ইন্দ্রের চোখে আর ঘুম নেই। তিনি বিষন্ন, চিন্তান্বিত, উদ্বিগ্ন। ইন্দ্রাণী শচী এসে প্রশ্ন করলেন, তোমার কি পরাজয় হয়েছে?

ইন্দ্র বললেন, এ পরাজয়ের চেয়ে অনেক গুরুতর। পরাজয়ের দুঃখ

আছে, কিন্তু অনুশোচনা নেই। অসুরদের সবংশে নিধন করতে গিয়ে আমি আমার সর্বনাশ ডেকে এনেছি।

শচী চমকে উঠলেন ভয়ে। বললেন, অনেক দিন পরে আমি সুখের মুখ দেখেছিলাম। সেবারের গ্লানির কথা আমি কখনও ভুলব না।

ইন্দ্র ব্যথিত ভাবে তাকালেন শচীর মুখের দিকে। শচী বললেন, আমরা কেউ জানতাম না তুমি কোথায় আত্মগোপন করেছিলে। এখানে তোমার সিংহাসনে বসেছিল আয়ুর পুত্র নহুষ। সে দেবতাদের আদেশ দিয়েছিল, আমি যখন ইন্দ্র পদে অধিষ্ঠিত তখন ইন্দ্রাণী শচী আমার সেবা করবে না কেন! এর চেয়ে অসম্মান স্ত্রী জাতির আর কিছুতে নেই। পতি জীবিত থাকতে পর-পুরুষের সেবা করার চাইতে তার মৃত্যু ভাল। আমি মরতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু দেবতারা আমাকে মরতে দেয় নি। আর দেবগুরু আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁর নিজের গৃহে। কত দুঃখে কত কষ্টে আমি রক্ষা করেছি নিজেকে, তা তুমি জানো। কী হবে তোমার স্বর্গরাজ্যে, যদি সারা জীবনে দুঃখই আমাদের সঙ্গী হয়!

ইন্দ্র বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। এবারে আমি সুখের জন্যেই সিংহাসন ত্যাগ করব।

শচী বললেন, তোমার চিন্তার ভাগ আমাকে দেবে তো!

দেব, কিছু লুকোব না তোমার কাছে।

বলে অসুরদের নিকটে নিজের পরাজয়ের কথা সবিস্তারে বললেন। মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপের কথাও বললেন। বিষ্ণুকে বার বার মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে। কিন্তু তাঁকে কোন অভিশাপ দেন নি। শুধু বলেছেন যে তিনি তাঁর কর্মফলের শাস্তি পাবেন অচিরে। ইন্দ্র বললেন, ঋষির কথা মিথ্যা হবার নয় রাণী, আমাকে এর পরিণাম মেনে নিতেই হবে।

তুমি কী ভয় পাচ্ছ?

কৈলাসে তপস্যা করছেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য। তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য এমন মন্ত্র আনবেন যাতে তারা আমাদের ওপরে প্রভুত্ব করবে চিরকাল। তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্রে মৃতকে বাঁচাতে পারেন। কত সাবধানে কত কষ্টে আমরা অসুরদের মৃতদেহগুলি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে ভস্মযাৎ করি। শুনেছি, তিনি ভস্মেও প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। তাই সেই ভস্ম নিয়েও আমাদের চিন্তার শেষ নেই। এবারে কী মন্ত্র আনতে গেছেন তা তিনিই জানেন।

শচী বললেন, আমাদের গুরুদেব কী বলছেন?

তিনি অপ্সরা পাঠাতে বলছেন কৈলাসে শুক্রাচার্যের নিকটে, তাঁর তপোভঙ্গের কথা বলছেন।

তুমি তাই করছ না কেন?

ইন্দ্র বললেন, তিনি বলেছিলেন শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই আমরা অসুরদের সবংশে নাশ করতে গিয়েই এই বিপদে পড়েছি।

না গেলেও তো এই বিপদ ছিল?

না। অসুররা সন্ধি করেছিল আমাদের সঙ্গে। আমরা শান্তির জীবন যাপন করতে পারতাম।

কিন্তু তাদের গুরুদেব তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে ফিরে এলে?

উচ্চ কণ্ঠে আমরা তাদের বলতে পারতাম, তোমরা সন্ধি করেছ আর যুদ্ধ করবে না। তবে কেন আবার এসেছ যুদ্ধ করতে? ধর্মের ভয় দেখালেই তারা পিছিয়ে যেত। শত্রুতা আমরাই করেছি বারে বারে। আমাদের মিত্র দেখলে তারা আমাদের সঙ্গে আর শত্রুতা করত না।

দুজনেই নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপরে ইন্দ্র আবার বললেন, হিরণ্যাক্ষকে আমরা চিনতে পারি নি। তাই একটা মারাত্মক ভুল করে আজ এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। পুলোমা দানবকে বধ করে তাঁর কন্যাকে পেয়েছিলেন প্রথম ইন্দ্র। আমাদের সে অপরাধ তারা ক্ষমা করেছিল। কিন্তু নিষ্পাপ হিরণ্যাক্ষকে বধ করাবার জন্য দৈত্যরা আমাদের কোন দিন ক্ষমা করবে না, দানবরাও এখন তাদেরই দলে।

শচী আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলেন, হিরণ্যাক্ষর ব্যাপারে তোমরা কী ভুল করেছিলে?

হিরণ্যাক্ষ আমাদের স্বর্গ রাজ্য অধিকার করতে আসে নি, সে এসেছিল তার নূতন যৌবনের দর্প নিয়ে। দেবতাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে সে তার বীরত্ব দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি নি। আমাদের গুরুদেবও বুঝতে পারেন নি। তিনি ভুল উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন হিরণ্যাক্ষকে অবজ্ঞা করলে স্বর্গ রাজ্য হারাতে হবে। তাই আমরা বিষ্ণুর শরণ নিয়েছিলাম। তিনি বরাহের শিরস্ত্রাণ পরে তাকে বধ করেছিলেন। তার ভাই হিরণ্যকশিপুকেও আমরা ভুল বুঝেছিলাম। তাই তাকে বধ করবার জন্যও আমরা বিষ্ণুকে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি

আমাদের অনুরোধ রেখেছিলেন। সিংহের শিরস্ত্রাণ আর বাঘ নখ পরে তিনি নরসিংহ রূপে তাকে বধ করেন। সেই থেকে অসুররা আমাদের চির শত্রু হয়েছে। বিষ্ণুর বুদ্ধিতে আমি বৃত্রকে বধ করেছি। সবাই ধিক্কার দিয়েছে আমাকে। সেই ব্রহ্মহত্যার জন্য তোমার যে অসম্মান হয়েছিল, তা আমার পাপেই। তাদের সঙ্গে মিত্রতার সুযোগ পেয়েও আমি তা হারালাম, হারালাম এই সিংহাসনের গর্বেই। সিংহাসন উচ্চাসন ঠিকই, কিন্তু মনকে উপরের দিকে যেতে দেয় না, টেনে নিচে নামায় মন। সিংহাসনের লোভে বুঝি যে কোন নীচ কর্ম করা যায়। ধিক এই সিংহাসনে।

শচী বললেন, তুমি এখন কী করবে ভাবছ ?

যা ভাবছি তা বলবার সাহস পাচ্ছি না।

কেন ?

তোমরা ভাববে, আবার আমি কোন ছলনার আশ্রয় নিতে যাচ্ছি।

তুমি নির্ভয়ে বল।

ইন্দ্র বললেন, শুক্রাচার্যের কাছে আমি কোন অপ্সরা পাঠাতে চাই না। তারা কেউ তাঁর তপোভঙ্গ করতে পারবে না, তপস্যার আগুনে তারা ভস্ম হয়ে যাবে।

তবে পাঠিয়ো না কাউকে।

আমি এমন একজনকে পাঠাবার কথা ভাবছি যে অসুর কুলকে আমাদের মিত্র করতে পারবে।

শচী সভয়ে বলে উঠলেন, কাকে ?

ইন্দ্র এ কথার উত্তর দিতে পারছিলেন না।

শচী চিৎকার করে উঠলেন, আমাদের প্রাণের কন্যা জয়ন্তীকে নয় তো ?

ইন্দ্র না বলতে পারলেন না দেখে শচী ফুঁপিয়ে উঠলেন, আমি জানতাম। তুমি এই রকমই কিছু ভাবছ, আর কাউকে বলতে পারছ না তোমার এই ভয়ঙ্কর বাসনার কথা। কিন্তু বলতে পারো, আমাদের এই কিশোরী কন্যা তোমার কাছে কী অপরাধ করেছে যে তাকে এই শাস্তি দেবে ?

না রাণী, সে কোন অপরাধ করে নি। তাকে কোন পাপ করতে আমি পাঠাব না। আমি তাকে সেই তপস্বী ব্রাহ্মণের সেবার জন্যে পাঠাতে চাই। দৈত্যগুরু তার সেবায় বশীভূত হবে। দেবতাদের রক্ষার জন্য মেয়ে আমার

সেই ব্রাহ্মণকে জয় করবে। আমাদের যাতে কোন অমঙ্গল না নয়, সে তাই দেখবে। আমি তাকে দৈত্যগুরুর হাতে সম্প্রদান করছি।

মন স্থির করেছ তুমি ?

হাঁা রাণী, দেবগুরুর পরামর্শ শুনেই আমি এই কথা স্থির করেছি। আর ছলনা নয়, এবারে সত্যের পথে আমরা জয় যাত্রা করব।

শচী চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, এ কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

কেন ?

মনে হচ্ছে, এর মধ্যেও তোমার কোন অভিসন্ধি আছে।

দুরভিসন্ধি ?

তা জানি নে। তোমার অভিসন্ধি বুঝতে পারি এমন অহঙ্কার আমার নেই। তোমার অভিসন্ধি বুঝতে না পেরেই আমি আমার পিতাকে হারিয়েছি, এবারে হারাচ্ছি কন্যাকে। জয় হোক দেবরাজ ইন্দ্রের।

ইন্দ্র বললেন, তুমি কি বিদ্রূপ করছ আমাকে ?

না, সে সাহস আমার নেই। আমি দূরে সরে যাচ্ছি। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।

বলে ইন্দ্রানী শচী বিদায় নিয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। আর ইন্দ্র ডেকে পাঠালেন কন্যা জয়ন্তীকে। কিশোরী কন্যার দেহে যৌবনের লক্ষণ ফুটে উঠছে একে একে, দেখা দিয়েছে লজ্জা। কাছে এসে জয়ন্তী জানতে চাইল, আমাকে ডেকেছ তুমি ?

হাঁা মা, আমি তোমাকে দৈত্য গুরু শুক্রাচার্যের হাতে সম্প্রদান করছি। আমার সারথি মাতলি তোমাকে কৈলাস পর্বতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তিনি তপস্যা করছেন, সেবা করে তাঁকে সুখী কোরো, আর সর্বদা আমাদের মঙ্গল চিন্তা কোরো।

এই আকস্মিক সংবাদে জয়ন্তী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। সহসা সে কোন কথা বলতে পারল না। ইন্দ্র বললেন, আমি আশীর্বাদ করছি মা, তুমি সফল হবে, সমর্থ হবে দেবতাদের মঙ্গল বিধানে। তোমার যাত্রা সার্থক হোক।

বলে সস্নেহে কন্যার যাত্রার আয়োজন করে দিলেন।

ইলাবৃতবর্ষ থেকে মানস সরোবরের পথে আসতে হয় কৈলাসে।

গন্ধমাদন পর্বতকে দক্ষিণে রেখে অন্তরিক্ষ হয়ে এই শুষ্ক রুক্ষ কঠিন পথ। ইন্দ্রের সারথি মাতলি জয়ন্তীকে পৌঁছে দিল কৈলাসের পাদদেশে। বলল, রথ এই পাহাড়ে উঠবে না। পায়ে হেঁটে উঠতে হবে।

মাতলির চোখে জল দেখে জয়ন্তী বলল, ছি ছি, তুমি কাঁদছ!

মাতলি বলল, আমি দেবরাজ নই, আমি তাঁর সারথি। তাই আমি আমার কন্যাকে এমন করে বিসর্জন দিতে পারতাম না। সিংহাসনের জন্যে তো নয়ই, নিজের প্রাণ থাকতে এ কাজ করতে পারতাম না।

জয়ন্তী বলল, দেবতাদের কল্যাণের জন্য পারতে। নিজের সুখটাই বড় নয়, বড় অপরের সুখ। পরের জন্যে নিজের সুখ বিসর্জন দেওয়ায় যে আনন্দ আছে!

মাতলি বলল, আমি গরিব, আমার সুখ আমার ছোট সংসার নিয়ে। তার বাইরের কথা আমি ভাবতে পারি না।

ভাবতে হয়।

মাতলি আশ্চর্য হল এই কথা শুনে। এইটুকু বয়সে জয়ন্তী যা ভাবতে শিখেছে, মাতলি তার জীবনের অপরাহ্ণে পৌঁছেও তা বুঝতে পারে না। এইখানেই বোধহয় তাদের প্রভেদ। ঈশ্বর সবাইকে এক রকম বুদ্ধি দিয়ে পাঠান নি, মেয়েদের মনও করেন নি পুরুষদের মতো। মায়ের জাত বুঝি পরের কল্যাণের জন্যেই নিজের জীবনকেও তুচ্ছ ভাবতে পারে। তাই সে নিরুত্তরে রইল।

জয়ন্তী বলল, তুমি ফিরে যাও, আমার জন্যে ভেবো না। আমার ভাগ্য আছে, আর আছেন ঈশ্বর। তিনি সবাইকে সমান ভালবাসেন।

মাতলি চোখ নামিয়ে বলল, আর একজন আছেন, তিনি ভাগ্যের বিধাতা। তাঁকেই আমরা ঈশ্বর ভেবে ভয় পাই। তাঁর বিচারের কোন নিয়ম কানুন নেই। স্বেচ্ছাচারী তিনি।

জয়ন্তী বলল, বাঁচতে হলে তাঁকে ভয় পেলে চলে না। তাঁর দরবারেও মৃত্যুদণ্ড একবার; আর সে দণ্ড সবাইকেই মাথা পেতে নিতে হয়। আমার জন্যে তুমি কেঁদো না, ফিরে গিয়ে বোলো যে আমার ভাগ্যকে আমি মেনে নিয়েছি হাসি মুখে।

তাই বলব।

বলে বিদায় নিল মাতলি। হাহাকার করে উঠল তার বুকের ভিতরটা।

কতটুকুই বা বয়েস এই মেয়ের, কিন্তু কেমন বিজ্ঞের মতো কথা বলতে পারল তাকে। দেবরাজ ইন্দ্র একা বিদায় দিয়েছেন তাঁর এই কন্যাকে। মা শচী বোধ হয় অন্তঃপুরে কেঁদেছেন লুকিয়ে। আর ভাই জয়ন্ত অপ্সরাদের নৃত্য দেখছিলেন নিজের মহলে। দেবগুরু বৃহস্পতি পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ করেছেন, কল্যাণ হোক দেবতাদের। কিন্তু কেউ বলেন নি, মা জয়ন্তী, তোমার কল্যাণ হোক। তবু সে নিজের কথা এখনও ভাবছে না, ভাবছে অপরের কথা। ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্যে লালিত হয়েও এ মেয়ে নিজের সুখের কথা ভাবতে শেখে নি।

দুর্গম দুস্তর পার্বত্য পথ কায়ক্লেশে অতিক্রম করে জয়ন্তী এক নির্জন স্থানে তপস্যারত দৈত্যগুরুকে দেখতে পেল। শীর্ণ কৃশ দেহের যেন একটি কঙ্কাল ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। বুকের পাঁজরের মধ্যে প্রাণ এখনও আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। কোনও আচ্ছাদন নেই, নেই কোন আশ্রয়। জীবন ধারণের জন্য কোনও চিন্তাও যেন নেই। সামনের যে অগ্নিকুণ্ড থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে, তাই তিনি পান করছেন। জয়ন্তী হত-বুদ্ধি হয়ে গেল দৈত্যগুরু শুক্রের এই ভয়ঙ্কর তপস্যা দেখে।

স্বর্গের কথা তার মনে পড়ল। সেখানে সে কোন দেবতাকে তপস্যা করতে দেখে নি। তপস্যা যে জীবনকে এই ভাবে নিগ্রহ, তা সে জানত না। পরম দেবতার কৃপালাভের জন্যে কি মানুষকে এই রকম কষ্ট করতে হয়! আশুতোষ যাঁর নাম, তিনিও কি অল্পে তুষ্ট হন না! আর কার জন্যে দৈত্যগুরু এই কষ্ট সহ্য করছেন?

দূর থেকে জয়ন্তী এই তপস্বীকে দেখছিল, কাছে যাবার সাহস হচ্ছিল না তার। পার্বতীর তপস্যার কথা তার মনে পড়ে গেল। সে শুনেছে যে তপস্যা করেই তপস্যা ভঙ্গ করা যায়। মদন তার পঞ্চশর নিক্ষেপ করে শিবের তপস্যা ভঙ্গ করতে গিয়ে নিজেই ভস্ম হয়ে গিয়েছিল তাঁর ক্রোধাগ্নিতে। নিকটে গেলে কি দৈত্যগুরুও ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠবেন! জয়ন্তী পিছিয়ে এল। তারপর চারি দিকে চেয়ে দেখল। তার মনে হল, দূরে কাউকে দেখা যাচ্ছে। বোধহয় শিবেরই কোন অনুচর। সেই দিকেই সে এগিয়ে গেল।

হ্যাঁ, সে শিবেরই অনুচর বটে। কৈলাসে নতুন আগন্তুক এসেছে দেখে

জয়ন্তীকে সে নন্দীর কাছে নিয়ে এল। নন্দী বললেন, তুমি কে মা? দেব কন্যা, না মানুষের ঘরে তোমার জন্ম?

জয়ন্তী বলল, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তী।

তা স্বর্গ ছেড়ে এখানে এসেছ কোন্ দুঃখে?

দুঃখে নয়, আমার পিতা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন দৈত্যগুরু শুক্রের সেবার জন্য।

নন্দী সবিস্ময়ে তাকালেন জয়ন্তীর মুখের দিকে। সহসা কোন প্রশ্ন করতে পারলেন না।

জয়ন্তী বলল, হ্যাঁ প্রভু, আমি সত্যি কথাই বলছি। দেবতার মঙ্গলের জন্য তিনি আমাকে তাঁর সেবা করতে বলেছেন।

নন্দী চিন্তান্বিত হলেন. কোন অপ্সরাকে না পাঠিয়ে ইন্দ্র তাঁর কন্যাকে পাঠিয়েছেন! এই কিশোরী কন্যার দেহে যৌবনের পদক্ষেপ দেখা দিয়েছে। আর তা জেনেও তিনি একে এক কঠোর তপস্বীর সেবার জন্য পাঠিয়েছেন! জীবনের সুখ বিসর্জন দিয়ে কি এই কন্যা দেবতাদের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে! নন্দী কোন কথা বলছেন না দেখে জয়ন্তী বলল, আপনি কিছু বলছেন না কেন, প্রভু?

নন্দী বললেন, মা, তপস্বীর সেবা বড় কঠিন কাজ। ভস্মে ঘৃত আহুতির যেমন কোন মূল্য নেই, এও তেমনি। দৈত্য গুরু এখন শিষ্যদের অপরাজেয় করার কথা চিন্তা করছেন একাগ্র মনে। আহার-নিদ্রার কথা ভুলে গেছেন, প্রকৃতির সমস্ত দুর্যোগ উপেক্ষা করে জীবন পণ করে ভাবছেন নূতন মন্ত্রের কথা। তোমার সেবা কি তিনি দেখতে পাবেন?

জয়ন্তী বলল, নাই বা দেখলেন! আমি তো কিছু দেখাতে আসি নি! আমি এসেছি তাঁর সেবা করতে. তাঁর তপস্যা সফল হলেই আমার সেবা সার্থক হবে।

কিন্তু তুমি কী পাবে মা?

আমার তো কোন বাসনা বা কামনা নেই!

আজ নেই ভাবছ, কিন্তু চিরকাল যে এমনই থাকবে তা কি বলতে পার? তৃষ্ণা আছে বলেই তো জীবন, আর তৃষ্ণার সংক্রান্তি নেই বলেই জীবনে যুদ্ধেরও শেষ নেই।

এর পর নন্দী বলতে পারলেন না যে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর তৃষ্ণা চরিতার্থের

জন্যই নিজের এই সরল সুন্দর কন্যাকে দেবতার মঙ্গলের নামে বলিদান করেছেন। এই তৃষ্ণাই সকলকে অমানুষ করে, তৃষ্ণাকে বলি দিতে পারলে দেবতাও মানুষ হতে পারে। দুর্লভ এই মনুষ্যত্ব।

জয়ন্তী বলল, আমি কী করব, প্রভু?

তুমি ফিরে যাও।

ফিরে যাবার পথ তো আমার খোলা নেই। আমার পিতা যে আমাকে—

জয়ন্তী তার মাথা নত করল লজ্জায়। সেই লজ্জাবনত মুখে নন্দী তার সংকল্পের পরিচয় পেলেন। বললেন, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি মা, তোমার সাধনা সফল হবে।

জয়ন্তী বলল, আমার পিতাও আমাকে আশীর্বাদ করেছেন।

কিন্তু মা—

বলুন, প্রভু।

তোমার শুধু সাধনা নয়, জীবনও সফল হবে বলতে পারলে আমি খুশী হতাম। সংসারে জীবনেরও একটা মূল্য আছে, তা অবহেলা করে নষ্ট করবার জিনিষ নয়। যৌবনটা হারাবার জন্য নয়, উপভোগের জন্যই ঈশ্বর তা দিয়েছেন সমস্ত প্রাণীকে। ফুলে ফলে ভরে উঠলেই জীবন সার্থক, তপস্যায় তা শুকিয়ে গেলে চলবে না।

জয়ন্তী বলল, তপস্যা তবে কিসের জন্যে?

নন্দী বললেন, নিজেকে জানবার জন্যে, জীবন ও জগৎকে জানবার জন্যে, জগতের জন্য নিজের জীবনকে ফুলের মতো প্রস্ফুটিত করবার জন্যে। তুমি দেবকন্যা, তপস্যা তোমার জন্যে নয়।

কিন্তু পার্বতীতো তপস্যা করেছিলেন!

তিনি যে পর্বতের কন্যা, প্রস্ফুটিত হবার জন্যেই তাঁর তপস্যার প্রয়োজন ছিল।

শিব তপস্যা করেন কেন?

নিজেকে জানতে। নিজেকে জানলেই অজ্ঞাত শক্তির অধিকারী হওয়া যায়।

দৈত্যগুরু তপস্যা করছেন কেন?

যে শক্তি তাঁর নেই, সেই শক্তি লাভের জন্য। দেবাদিদেব মহাদেব বলেছেন, তপস্যাতেই তিনি তাঁর প্রার্থিত শক্তি লাভ করবেন।

কিন্তু—

নন্দী বললেন, তোমার আশঙ্কা আমি বুঝি মা। দৈত্যগুরু জীবন পণ করে তপস্যা করছেন। তিনি সিদ্ধিলাভ করুন, আমরা তাই চাই।

জয়ন্তী বলল, বাধা কিসের, প্রভু ?

অনাহারে অনিদ্রায় তিনি কাতর হয়ে পড়েছেন। নিজের দিকে তাকাবার তাঁর অবসর নেই।

তবে তো আমার পিতা যথার্থ কাজই করেছেন। তাঁর সেবা করে আমি তাঁর সিদ্ধি লাভের সহায় হতে পারব।

নিরুত্তরে রইলেন নন্দী। তাই দেখে জয়ন্তী বলল, আপনি কি আমাকে সমর্থন করছেন না ?

তপস্যার সময় স্ত্রীলোকের সেবা অনেক সময়ে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায় মা। তবে ইন্দ্রিয় জয় করেছেন দৈত্যগুরু শুক্র। তাঁর মতো তপস্বী ত্রিভুবনে দুর্লভ।

জয়ন্তী বলল, এই তপস্বীর সেবা করে আমি ধন্য হতে চাই, প্রভু। আমি তার তপোভঙ্গ করতে চাই না, তার সিদ্ধির সহায় হতে চাই। আপনি আশীর্বাদ করুন আমাকে।

আর কিছু চাও না ?

না, প্রভু।

হর পার্বতীর দর্শন ?

তাঁরা আমার হৃদয়ে বিরাজ করুন সর্বক্ষণ, আমি নিমেষের দর্শন চাই না।

সাশ্রু নয়নে নন্দী বললেন, তোমাকে আশীর্বাদ করতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু কী আশীর্বাদ করব ভেবে পাচ্ছি না।

নন্দীকে প্রণাম করল জয়ন্তী।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে নন্দী বললেন, তুমি সন্তানবতী হও।

জয়ন্তী চমকে উঠে বলল, এ কী আশীর্বাদ প্রভু !

নন্দী বললেন, হ্যাঁ মা, মাতৃত্বেই নারী জীবনের সম্পূর্ণতা। সার্থক হোক তোমার এই আত্মত্যাগ।

জয়ন্তী ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দৈত্যগুরু শুক্রের দিকে। খুব নিকটে এসে দেখল সেই তপস্বীকে। একজন প্রবীণ পুরুষ অনাহারে শীর্ণ হয়েছেন। নীলাভ শিরা উপশিরা দেখা যাচ্ছে সারা দেহে। কিন্তু অবসন্ন দেখাচ্ছে না একটুও, মনে হচ্ছে সংকল্পের দৃঢ়তার জন্যই তিনি শক্ত হয়ে আছেন।

জয়ন্তীর মনে পড়ল, সে শৈশবে শুনেছে যে এই দৈত্যগুরু তাঁর শিষ্যের মঙ্গলের জন্য একটি চোখ হারিয়েছিলেন। যে প্রহ্লাদ সম্প্রতি তাঁর পিতার কাছে এসেছিলেন অসুরদের নিকট থেকে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে, তাঁর পৌত্র বলি তখন স্বর্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং রাজ্যহারা হয়ে তাঁর পিতা গিয়েছিলেন বিষ্ণুর কাছে সাহায্যের প্রার্থী হয়ে।

দৈত্যদের সঙ্গে দেবতাদের বিবাদের কথাও জয়ন্তীর অজ্ঞাত নয়। অনেকের কাছেই সে এই পুরাতন কাহিনী শুনেছে। হিরণ্যকশিপুকে বধ করে বিষ্ণু প্রহ্লাদকে রাজা করেছিলেন পাতালের। কিন্তু হিরণ্যকশিপু তাঁর নিহত ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধককে এই রাজ্য প্রদান করেছিলেন। অন্ধক প্রহ্লাদের বশ্যতা মেনে নিয়েছিলেন বলেই কোন বিবাদ হয় নি। অন্ধকের অকাল মৃত্যুর পর রাজা হয়েছিলেন প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। এই ধার্মিক ও দানশীল রাজা দানবরাজ বৃষপর্বার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরুচিকে বিবাহ করে-ছিলেন। বলি এঁদের পুত্র।

সবাই গোপন করবার চেষ্টা করলেও জয়ন্তী শুনেছে যে তার পিতা ছলনা করে বধ করেছিলেন বিরোচনকে। বিরোচন যখন প্রার্থীদের দান করছিলেন, তখন তার পিতা ছদ্মবেশে এসে বিরোচনের সমুকুট মস্তক চেয়েছিলেন দান। ধার্মিক দৈত্যরাজ তাই দিয়েছিলেন। বলি তখন শিশু। দৈত্য গুরু তাঁকেই তাঁর পিতার শূন্য সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।

দৈত্যরা এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছিল। প্রহ্লাদের ভাগিনেয় বৃত্র তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে ফিরে এলে দৈত্যরা তাঁর সহায়তায় স্বর্গরাজ্য অধিকার করেছিল। জয়ন্তী সে কাহিনীও শুনেছে। তার পিতা বিষ্ণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃত্রকে বধ করেছিলেন অন্যায় ভাবে। তারপর দীর্ঘ দিন তাঁকে এই হত্যার পাপে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল মানস সরোবরে। চন্দ্রবংশের রাজা নহুষকে এনে স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন দেবতারা। তাঁর হাতে মায়ের নিগ্রহের কথাও শুনেছে জয়ন্তী। ঋষিদের সহায়তায় তার পিতা স্বর্গ রাজ্য ফিরে পেয়েছেন।

কিন্তু দৈত্যরা তাদের অপমান ভোলে নি। বড় হয়ে বলি আবার স্বর্গরাজ্য অধিকার করেছিলেন। আর সেই ধার্মিক রাজাকে বিষ্ণু ছলনায় বন্ধন করেছেন। যজ্ঞের পর বলি যখন দান করছেন, তখন উরুক্রম নামে এক বামনের ছদ্মবেশে বিষ্ণু এসেছিলেন ত্রিপাদ ভূমি চাইতে। জয়ন্তী সেই মর্মান্তিক

কাহিনীও শুনেছে।

নর্মদার উত্তর তীরে ভৃগুকচ্ছে বলি রাজার জন্যে যজ্ঞ করেছিলেন যাজ্ঞিকেরা। বেদবেদাঙ্গবিদ শুক্রাচার্য স্বয়ং এই যজ্ঞের পুরোহিত। চারি দিকে দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ রব। এমন সময়ে চিত্র কুণ্ডলে মণ্ডিত বামন রূপী বিষ্ণু যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হলেন নামগান করতে করতে। খর্ব দেহ, মুক্তা মেখলায় শোভিত কটি, কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় বামস্কন্ধে লম্বিত, মাথায় জটা কলাপ এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। দৈত্যগুরু তাঁকে দেখেই চিনেছিলেন। অরিন্দম বলিকে বলেছিলেন, ছদ্মবেশে বিষ্ণু এসেছেন দেবতাদের হিতের জন্যে। আমার সঙ্গে মন্ত্রণা না করে এঁকে দান কোরো না।

বলি বললেন, যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং আমার গৃহে এসেছেন, এতেই আমি ধন্য। বলে বামনকে অভ্যর্থনা করে পাদ্য অর্ঘ দিয়ে তাঁকে বললেন, পথশ্রমে আপনার কষ্ট হয় নি তো! আপনার পদার্পণে আমাদের কুল পবিত্র হল। এইবারে আপনার অভিলষিত বস্তু গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন।

বামন বললেন, আপনার কুলে তো দান করব বলে কেউ প্রত্যাখ্যান করেন নি, আপনার উপযুক্ত কথাই বলেছেন। তবে আপনার কাছে আমার সামান্যই প্রার্থনা—আমার নিজের ত্রিপাদ পরিমাণ ভূমি আমাকে দান করুন।

বামনের কথা শুনে বলি হেসে বললেন, আপনি বালক বলে আপনার বুদ্ধি এখনও পরিণত হয় নি। তাই আপনি ত্রিলোকের অধিপতির নিকটে ত্রিপাদ ভূমি চাইছেন। আমি আপনাকে একটি দ্বীপ দান করতে পারি। আমার কাছে দান গ্রহণের পর আর কারও কাছে যাতে আপনার ভিক্ষা করতে না হয়, আপনি সেই রকম কিছু আমার কাছে চান।

বামন বললেন, বাসনার শেষ নেই। তাই জিতেন্দ্রিয় না হলে ত্রিলোক লাভেও সুখ নেই। এই জন্যই জ্ঞানীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিগ্রহ করেন না।

বলি হেসে বললেন, তথাস্তু। আমি আপনাকে ত্রিপাদ ভূমিই দেব।

এইবারে দৈত্য গুরু বলিকে বাধা দিয়ে বললেন, সাবধান, এই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ তোমার সর্বস্ব হরণ করতে এসেছেন। এঁকে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি ভাল কর নি। এখনও সতর্ক হবার সময় আছে।

বলি নির্ভয়ে বললেন, হোক ছলনা, আমাকে আমার সত্য পালনে আজ্ঞা করুন, প্রভু।

গভীর ক্ষোভে শুক্র বললেন, তুমি তোমার সত্য পালনে সমর্থ হবে না। এই মায়া রূপ পরিবর্তিত হলে তুমি ত্রিপাদ ভূমি তাঁকে দিতে না পেরে নরক-বাসী হবে। এখনও তোমার ফেরার পথ আছে, তুমি নিরস্ত হও।

বলি বললেন, আপনার কথা সত্য। কিন্তু আপনার কথা মানতে হলে আমার সত্য ভঙ্গ হবে। বিষ্ণু আমাকে বঞ্চনা করতে পারেন, কিন্তু আমি কাউকে বঞ্চনা করতে পারব না। যদি সত্য রক্ষা করতে পারি, তাহলে নরকে আমার ভয় নেই, মৃত্যুকেও আমি ভয় পাই নে।

দৈত্যগুরু এবারে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি অজ্ঞ হয়েও তোমার অভিমান পণ্ডিতের মতো। আমার উপদেশ লঙ্ঘন করলে তুমি অচিরেই শ্রীভ্রষ্ট হবে।

দৈত্যগুরুর পরম স্নেহে লালিত বলি এই অভিশাপেও বিচলিত হলেন না। বললেন, প্রভু, আপনার অভিশাপ আমি মাথা পেতে নিলাম। তারপর তিনি বামনকে ভূমি দানের জন্য উদ্যত হলেন।

কিন্তু শিষ্যের কল্যাণের জন্য দৈত্য গুরু শান্ত থাকতে পারলেন না। যে ভৃঙ্গার থেকে বলি দানের জন্য জল নেবেন, তিনি সেই ভৃঙ্গারে মক্ষিকার রূপে প্রবেশ করে জল রোধ করলেন। ভৃঙ্গার থেকে জল পড়ছে না দেখে বুদ্ধিমান বামন সেই ভৃঙ্গারের মুখে একটা কুশ দিয়ে খোঁচা দিলেন। তাতেই দৈত্য গুরুর একটি চোখ কুশ বিদ্ধ হয়ে নষ্ট হয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

জয়ন্তী দৈত্য গুরুর মুখের দিকে তাকালেন। নিমীলিত চোখে তিনি ধ্যান মগ্ন আছেন। তাঁর দু চোখে এখন দৃষ্টি আছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। শিষ্যের মঙ্গলের জন্য যিনি তাঁর চোখ দিয়েছেন তিনি যে তাঁর প্রাণও দিতে পারেন, তাতে জয়ন্তীর কোন সংশয় নেই। মুগ্ধ বিস্ময়ে জয়ন্তী তাকিয়ে রইল এই শিষ্যপ্রাণ তপস্বীর দিকে।

তার পিতার কথাও মনে পড়ল। তিনি তাকে এই অসাধারণ মানুষটির হাতে সম্প্রদান করেছেন। ঠিকই করেছেন। দেবতাদের মধ্যে এমন আত্ম-ত্যাগী পুরুষ নেই। দেবাসুরের দ্বন্দ্বে দেবতাদের কোন ভূমিকা নেই। তাদের সহায়তায় দেবরাজ কোন যুদ্ধ জয় করতে পারে নি। অথচ অসুররা সংঘবদ্ধ হয়ে দেবতাদের পরাজিত করেছে বারবার। তারা এক জাত, এক প্রাণ। এরা সবাই কশ্যপের সন্তান, তাদের মায়েরাও সবাই দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। জ্যেষ্ঠা অদিতির সন্তান দেবতারা স্বর্গ রাজ্য পেয়েছিলেন। পুরুষানুক্রমে তাঁরা এই রাজ্য ভোগ করতে চাইছেন। তাই কনিষ্ঠা ভগিনী দিতি ও দনুর সন্তান

দৈত্য ও দানবরা স্বর্গের সুখ ভোগে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যান্য ভগিনীর গর্ভ-জাত সন্তান গন্ধর্ব অপ্সরা প্রভৃতি সকলেই দেবতাদের আধিপত্য মেনে নিয়েছেন। দৈত্য ও দানবরাও এই বিধান মেনে নিয়েছিলেন। জয়ন্তী শুনেছে যে হিরণ্যাক্ষকে অকারণে বধ না করলে সিংহাসন নিয়ে কোন বিবাদই হত না, বৈমাত্রেয় ভাইদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় থাকত। প্রথম ইন্দ্রের জন্যই এই বিবাদ আরম্ভ হয়েছে এবং তা চলে আসছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছে দৈত্য ও দানবরা। রাজনীতি নয়, কোন কৌশল বা ছলনা নয়, শুধু সত্য পথ অবলম্বন করেই তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ঐশ্বর্য ও বিলাসে ডুবে না থেকে তারা তপস্যায় শক্তি সঞ্চয় করছে। ধর্ম তাদের সহায় হচ্ছে, আর ধর্মেরই জয় হচ্ছে।

তার পিতা এখন স্বর্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু ধর্ম যুদ্ধে তিনি এই সিংহাসন পুনরাধিকার করেন নি। বিষ্ণু ছলনায় তা জয় করে তাঁকে দিয়েছেন। যুগ্ম ভাবে সমুদ্র মন্থনের পর বলিকে বঞ্চিত করেছিলেন তার পিতা। অমৃত কুম্ভ মোহিনী মূর্তিতে হরণ করে দেবতাদের দিয়েছিলেন ক্ষিরোদ সাগরবাসী বিষ্ণু। তবু দেবতারা রাজ্য রক্ষা করতে পারেন নি। প্রতারিত বলি বাহু বলে এই রাজ্য জয় করেছিলেন। আর দেবতারা পুনরায় ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

ভৃঙ্গারের জল হাতে নিয়ে বলি বামনকে ভূমিদান করলেন। তারপরেই বামনের রূপ যেন পরিবর্তিত হতে লাগল। কিন্তু বলি বিচলিত না হয়ে বললেন, বলুন, তিন পায়ে আপনি কত দূর অধিকার করতে চান।

বামন বললেন, আমার এই এক পায়ে আমি পৃথিবীর সমস্ত ভূমি অধিকার করলাম, আর দ্বিতীয় পায়ে অধিকার করলাম স্বর্গ। এই বারে বল, আমি আমার তৃতীয় পা রাখব কোথায় ?

বলি হেসে বললেন, এই জগৎ তো আমি সৃষ্টি করি নি যে এ এমন ছোট বলে আমি লজ্জা পাব! যে সৃষ্টি কর্তা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তারই দৃষ্টির দোষে এই ত্রিভুবন এমন ক্ষুদ্র হয়েছে যে আপনি আপনার তৃতীয় পা রাখবার স্থান পাচ্ছেন না। কিন্তু আমি মিথ্যা বলি না, কথা দিয়ে সত্য রক্ষা করতে জানি। আপনি আমার সঙ্গে কপটতা করতে পারেন, কিন্তু আমি আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আমি আমার মাথা পেতে দিচ্ছি, আপনি আপনার তৃতীয় পা আমার মাথায় রাখুন।

বলে বলি তার মাথা নত করলেন বামনের সামনে। বামন তাঁকে রাজ্য-চ্যুত করে পাতালে পাঠালেন নির্বাসনে, আর সেই রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন তার পিতাকে। তার পিতা দেবরাজ ইন্দ্র নিষ্কণ্টকে এই রাজ্য ভোগ করতে চান। তাই তাঁর কন্যা জয়ন্তীকে পাঠিয়েছেন কৈলাসে তপস্যারত দৈত্য গুরুর সেবার জন্যে। সেবা করে বশ করতে হবে দৈত্যগুরুকে। তিনি যেন দেবতাদের অনিষ্ট না করেন, তারই ব্যবস্থা করতে হবে জয়ন্তীকে। দেবাসুরের মধ্যে পুনরায় প্রীতির বন্ধন কি সম্ভব? আর সে কাজে কি সমর্থ শুধু এই অনাহারে ক্লিষ্ট দুর্বল তপস্বী? কী প্রশান্ত তন্ময় মূর্তি এই তাপসের! কী বলিষ্ঠ সঙ্কল্প! এই কি সত্যের রূপ! ধর্মের প্রকাশ!

জয়ন্তী এখন কী করবে?

জয়ন্তী মনে মনে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল ধ্যানস্থ ঋষি শুক্রকে। কোন দ্বিধা না করে এঁরই পায়ে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে নিশ্চিন্ত হল। দৈত্যগুরু তাকে দেখতে পেলেন না, কিছু জানতেও পারলেন না। নিঃশব্দ নিবেদনের পরে জয়ন্তীর আর কোন ভয় রইল না। মনে সাহস এল, বুকে ভরসা এল, দেহে এল বল। তপস্বীর সেবা করতে হয় কী ভাবে, সে কথা তার জানা ছিল না, কিন্তু কী ভাবে ঐ মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তা বুঝতে তার কষ্ট হল না। যে মানুষ অগ্নিকুণ্ডের ধূমপান করে জীবন ধারণ করে আছেন, তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আহারের প্রয়োজন। তারপর অন্য কথা।

জয়ন্তী চারিদিকের অরণ্য থেকে শুকনো কাঠ আহরণ করে আনল। আগুন যাতে নিভে না যায়, সেই চেষ্টাই হল তার প্রথম কাজ। জয়ন্তী নতুন কাঠ দিল অগ্নিকুণ্ডে, অল্পক্ষণ পরেই সেই কাঠ জ্বলে উঠল। জয়ন্তী দেখল, নিঃশ্বাসের সঙ্গে দৈত্যগুরু সেই ধূম পান করছেন পরম তৃপ্তিতে।

পাশে তাঁর শূন্য কমণ্ডলু দেখতে পেল। তা গড়াগড়ি যাচ্ছে মাটিতে। দৈত্যগুরু কত দিন জল পান করেন নি তা জয়ন্তী জানে না। তার নিজেরও তৃষ্ণা পেয়েছিল পথ শ্রমে। সেই কমণ্ডলু কুড়িয়ে নিয়ে জলের অন্বেষণে গেল।

পাহাড়ে ঝর্ণার শব্দ শোনা যায়। কান পাতলেই সেই ধ্বনি সঙ্গীতের

মতো মধুর মনে হয়। জয়ন্তী দেখল যে নিকটেই একটি ঝর্ণা পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরঝর শব্দে নিচে নেমে গেছে। কমণ্ডলু মাটিতে নামিয়ে রেখে অঞ্জলি ভরে জলপান করতে গিয়েও থমকে গেল। না, সে নিজে এই জল পান করতে পারবে না। সেই উপবাসী তপস্বী কত দিনের তৃষ্ণা বুকে নিয়ে বেঁচে আছেন, জয়ন্তী তা জানে না। অঞ্জলির জল জয়ন্তী ফেলে দিল, তারপর কমণ্ডলু ভরে নিল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ শীতল জলে। ধীর পদক্ষেপে সেই জলপূর্ণ কমণ্ডলু এনে রাখল তপস্বীর সামনে। তারপর সরে গেল পিছনে।

জয়ন্তী বুঝতে পারল যে দৈত্য গুরু সেই শীতল জলের স্পর্শ অনুভব করেছেন। চোখ মেলে চাইলেন কমণ্ডলুর দিকে তারপর পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে কমণ্ডলুর সমস্ত জল নিঃশেষ করে ফেললেন। জয়ন্তীর বুঝি রোমাঞ্চ হল, পুলকিত হল মন। তার সেবা গ্রহণ করেছেন তপস্যারত ঋষি। তিনি পুনরায় ধ্যানে মগ্ন হতেই সে আবার সেই কমণ্ডলু ভরে জল এনে রাখল। এবারে সে নিজেও আকণ্ঠ জল পান করে তার ক্লান্তি দূর করল।

অরণ্যে অন্বেষণ করে নানা রকমের সুপক্ক ফল পেল জয়ন্তী। সেই ফল এনে দৈত্যগুরুর সামনে রাখল। তিনি সেই ফলও খেলেন। কদলী পত্র এনে বীজন করল তাঁকে এবং রাত্রে নিদ্রার জন্য পল্লব এনে শয্যা রচনা করে দিল।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে দৈত্য গুরু দেখলেন যে তাঁর নিত্যকর্মের জন্য কেউ প্রাদেশ প্রমাণ কুশ ও কুসুম চয়ন করে রেখেছে। কিন্তু যে রেখেছে, তাকে তিনি দেখতে পেলেন না। তাকে দেখবার কথা তাঁর মনেও এল না। এ সবই যেন তাঁর প্রাপ্য, এমনি একটা ভাব জন্মাল তাঁর মনে। এমন কি মধ্যাহ্নে যে জয়ন্তী তাঁর মাথার উপরে নিজ পরিধেয় বস্ত্রের আতপত্র রচনা করত, তাও তিনি বুঝতে পারতেন না। তাঁর মন তখন সিদ্ধি লাভের জন্য একাগ্র হয়েছে। সেই এক চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তার কথা তাঁর মনে এল না।

নেপথ্যে থেকেই যে তপস্বী পুরুষের সেবা করতে হবে, জয়ন্তী তা জানে। এই নিয়ে সে অনেক কথাই শুনেছে। অনেক পুরাতন কথা। স্বর্গের নিপুণ অপ্সরাগণও যে এ কাজে ভয়ে ব্যাকুল হয়, তা সে দেখেছে। শিবের ধ্যান ভাঙ্গাবার ভার পড়েছিল মদনের উপরে। কোন অপ্সরা তাঁর সঙ্গে যেতে সাহস পায় নি বলেই বসন্ত গিয়েছিলেন পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে। সব রকমের

সতর্কতা অবলম্বন করেও মদন রক্ষা পান নি, পঞ্চশর নিক্ষেপ করার পরেই শিবের রোষাণলে তিনি দগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আর তারপরেই আবার তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব। ইতিহাসে পরিণত হয়েছে এই মদন ভস্মের কাহিনী।

এর পরের কথাও শুনেছে জয়ন্তী। ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরা যখন কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন, তখন তার পিতা সিংহাসন হারাবার ভয়ে কাতর হয়েছিলেন বলে সে শুনেছে। শুধু তিনি নন, ত্রিশিরার উগ্র তপস্যা দেখে সবাই ভেবেছিলেন যে ত্রিশিরা ত্রিভুবন জয়ের জন্য শক্তি সঞ্চয় করছেন। দেবগুরু বৃহস্পতি মন্ত্রণা দিয়েছিলেন, না, চুপ করে থাকলে চলবে না, তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে হবে। কিন্তু কী ভাবে তা সম্ভব? কে যাবে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করতে? স্বর্গের শ্রেষ্ঠ অপ্সরারা একের পর এক অস্বীকার করল এই কাজে অগ্রসর হতে। মদনের দুর্দশার কথা তারা জানে। এ কাজে জীবন নষ্ট করতে তারা পারবে না। কিন্তু দেবরাজের আজ্ঞা অমান্য করবে কেমন করে? অমরাবতীর সভায় নাচতে হলে দেবরাজের বিপদে যে এগিয়ে যেতেই হবে! শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে কেউ একা যাবে না, যাবে দলবদ্ধ হয়ে। শুধু উর্বশী বা মেনকা নয়, যাবে রম্ভা তিলোত্তমা ঘৃতাচীরাও। হাস্যে লাস্যে নাচে গানে তারা ত্রিশিরার চারিদিক ঘিরে এমন এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবে যে ত্রিশিরার তপস্যা ভঙ্গ হবে নিশ্চিত ভাবে, অথচ তিনি চোখ মেলে কাউকে দেখতে পাবেন না! তিনি মোহাবিষ্ট হবেন, রোষাগ্নি নির্বাপিত হবে তাঁরই কামনায়।

তারপর? একজন এগিয়ে যাবে সেই তপস্বীকে বশ করতে। এ কাজে তো সবাই সমান দক্ষ। সবাই সম্মত এই কাজে। কাজেই দলবদ্ধ হয়ে গেল তারা সেই নির্জন পর্বতে। কৈলাসের মতো দুর্গম নয়। মুনি ঋষির বাস আছে সেই পর্বতে। আশ্রম নির্মাণ করে তাঁরাও সেখানে ধর্ম চর্চা করেন। শান্ত সমাহিত এই পরিবেশ অধ্যাত্ম সাধনার উপযুক্ত স্থান।

অপ্সরারা এসে দূর থেকে দেখল ত্রিশিরাকে। দারুণ গ্রীষ্মে তিনি তখন পঞ্চাগ্নি সাধনে রত। আগুন জ্বলছে তাঁর চারি দিকে। মাথার উপরেও অগ্নি বর্ষণ করছেন গ্রীষ্মের সূর্য। হেমন্তে ও শীতে তিনি হিম শীতল জলে অবস্থান করে তপস্যা করেছেন। আশ্চর্য তাঁর ক্ষমতা। তিনি সুরাপান করেন, অধ্যয়নও করেন, আবার তাঁর চারি দিকেই সমান দৃষ্টি। তাই সবাই

তাঁর নাম দিয়েছে ত্রিশিরা। তিনি যেন এক মুখে সুরাপান ও এক মুখে অধ্যয়ন করছেন এবং তৃতীয় মুখে দৃষ্টি রেখেছেন চারি ধারে। দূর থেকে তাঁকে দেখেই অপ্সরারা ভয় পেয়ে গেল। তিনি তাঁদের দেখতে পেলেই নিশ্চিত বিপদ।

কিন্তু দেবরাজের আদেশ তাদের মানতেই হবে। তাই তারা দূর থেকে ক্রমে ক্রমে নিকটে আসতে লাগল। তাদের নৃত্যগীত তপস্বীকে প্রলুব্ধ করল না। কামশাস্ত্রোচিত বিবিধ ভাবভঙ্গি প্রকাশে তারা দক্ষ। ধীরে ধীরে নিকটবর্তী হবার সাহস সঞ্চয় করে তারা সব রকম চেষ্টা চালাল দীর্ঘ দিন ধরে। ত্রিশিরা তাঁর স্থির দৃষ্টি মেলে রইলেন সকলের দিকে, কিন্তু কী দেখলেন তিনিই জানেন। এতটুকু বিভ্রম জন্মাল না তাঁর মনে, সে দৃষ্টিতে যেন মন নেই। অসীমে নিবদ্ধ মন দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত হল না, ব্যর্থ হল অপ্সরাদের পুরুষের চিত্ত-জয়ের সকল কলা-কৌশল। লজ্জায় মুখ অবনত করে তারা অমরাবতীতে ফিরে গেল। দেবরাজ ধিক্কার দিলেন তাদের। তারপর নিজে এসে বজ্রাঘাতে ত্রিশিরাকে বধ করলেন। সেই ধার্মিক তপস্বীকে বধ করবার জন্য সমস্ত মুনি ঋষি তাঁকে ধিক্কার দিলেন। আর পুত্রহারা পিতা ত্বষ্টা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বৃত্রকে বললেন এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে।

কিন্তু সে ঘটনাও ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। জয়ন্তী এখানে এই সব কথা চিন্তা করতে আসে নি। পিতা তাকে দৈত্যগুরু শুক্রের হাতে সম্প্রদান করেছেন। নিজের মুখে তো সে কথা বলা যায় না, আকারে ইঙ্গিতেও না। যা পারা যায়, তা হল নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন—নীরবে, নির্দ্বিধায়, নির্ভীক চিত্তে, কোন প্রত্যাশা না করে, নিজেরই তৃপ্তির জন্য, নারী জীবনের চরিতার্থতার জন্য। অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। তাই জয়ন্তী এক মৌন তপস্বীর সেবা করতে লাগল দিনের পর দিন, সকল প্রকারে তাঁকে আরাম দেবার চেষ্টায় সমস্ত মন প্রাণ সমর্পণ করল। দৈত্য গুরু এই সেবা গ্রহণ করলেন নিজের অজ্ঞাতসারে পরম পরিতৃপ্তিতে। কত দিন কত মাস কত বৎসর কেটে গেল, জয়ন্তীও তার হিসাব রাখল না।

এক দিন নন্দী এসে দৈত্য গুরুকে ডেকে নিয়ে গেলেন শিবের কাছে। শিব তাঁকে ডেকেছেন। শুক্র বিচলিত হয়ে বললেন, কেন, আমি কি ব্যর্থ হয়েছি

তপস্যায় ?

সে কথা তিনিই জানেন।

দৈত্য গুরু শিবকে প্রণাম করে করজোড়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। শিব বললেন, তুমি তো দীর্ঘ দিন তপস্যা করলে, কী জেনেছ তুমি ?

শুক্র বললেন, যা জানি তাই জেনেছি। এই জগতের একাংশই আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। দৃষ্টির বাহিরে যা, সেই বিশালতার সামান্যও জানতে পারি নি। জ্ঞানের যে শেষ নেই তা বুঝেছি। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সারা জীবন চেষ্টা করেও তার পরিমাপ করা যাবে না।

শিব বললেন, ঠিকই জেনেছ তুমি। সিদ্ধিলাভ হয়েছে তোমার তপস্যায়। জীবন দিয়েই জীবনকে জানতে হয়।

বুঝেছি প্রভু।

আমার কাছে তুমি কী চাইতে এসেছিলে ?

যা চাইতে এসেছিলাম সে মন্ত্র আমি পেয়ে গেছি। আমার আর কিছু চাই না। এই বিশাল বিশ্বে আমার চাওয়া যে কত সামান্য কত তুচ্ছ তা বুঝতে শিখেছি।

শিব সহাস্যে বললেন, এরই জন্যে তপস্যা। আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর সম্মান পাবে মানুষের কাছে। আজ যারা তোমার ধার্মিক শিষ্যদের কলঙ্কিত করছে কৌশলে, তারা ব্যর্থ হবে কালের বিচারে। এক দিন আসবে, যেদিন তোমার শিষ্যরা ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বমহিমায়। সিংহাসন আরাধ্য নয়, আনন্দময় জীবনের জন্যই আরাধনা। তোমার শিষ্যদের তুমি এই মন্ত্র দিও।

আপনার আজ্ঞা আমি শিরোধার্য করলাম, প্রভু।

বলে দৈত্য গুরু শুক্র শিবকে পুনরায় প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

নন্দী তাঁকে পৌঁছে দেবার সময় বললেন, এবারে কি তুমি ফিরে যাবে ?

শুক্র বললেন, আমার কাজ তো ফুরিয়েছে !

নন্দী হেসে বললেন, না।

ফুরোয় নি !

যে কন্যার সেবায় ও যত্নে তুমি সিদ্ধিলাভ করলে, তার প্রতি কর্তব্য তোমার বাকি আছে।

দৈত্য গুরু পরম বিস্ময় নিয়ে তাকালেন নন্দীর মুখের দিকে।

সূর্যাস্তের আর বিলম্ব ছিল না। তিনি এখন অরণ্যের আড়ালে গেছেন বলে ছায়া নেমেছে ভূমিতে। নিত্যকর্মের জন্য শুক্র অগ্নিহোত্রের সামনে বসলেন চোখ বন্ধ করে। ধ্যানে মগ্ন হতেই মনে হল যে এই অগ্নিকুণ্ডে এত কাল কাঠ জুগিয়েছে কে? কে জুগিয়েছে তাঁর কুশ ও কুসুম? দারুণ গ্রীষ্মে কে ব্যজন করেছে তাঁকে, আর পল্লব দিয়ে কে রচনা করেছে তাঁর শয্যা?

আজ তাঁর অনুভূতি তীক্ষ্ণ, সম্পূর্ণ সজাগ তিনি। ক্ষণকাল পরেই কারও নিঃশব্দ উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারলেন। সহসা চোখ মেলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ যে এক দেবকন্যা, লজ্জায় জড়িত পদে কম্প্র বক্ষে নম্র নেত্রপাতে তাঁর সেবায় নিরত। শুক্র বলে উঠলেন, কে তুমি?

আমি কোন পণ্যা নারী নই, প্রভু। স্বর্গের অপ্সরাও নই। আমি ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তী। সেবার অভাবে আপনার তপস্যায় যাতে বিঘ্ন না হয়, আমি সেইজন্যই এখানে এসেছি।

নিজে থেকে?

না প্রভু, আমার পিতা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

আশ্চর্য! সে তো তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টির জন্যেই অপ্সরাদের পাঠায়! তবে সে তোমায় পাঠাল কেন?

ধ্যানে আপনি তা জেনে নিন।

শুক্র অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের কী উদ্দেশ্য তাই ভাবতে লাগলেন গভীর মনোযোগে। তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবার দায়ীত্ব নিয়ে তো এই কন্যা এখানে আসে নি! সে চেষ্টা সে কখনও করে নি। বরং তপস্যায় সিদ্ধিলাভের জন্যই এই কন্যা দিনের পর দিন সযত্নে সেবা করেছে তাঁর। এর পিছনে ইন্দ্রের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে, দৈত্য গুরু তা বুঝতে না পেরে বললেন, পিতা তোমাকে কী আদেশ করেছিলেন, বলবে?

লজ্জায় মাথা নোয়াল জয়ন্তী।

লজ্জা নয়, ভয় নয়, কোন সঙ্কোচ নয়, তুমি সত্য কথা বল। আমি আদেশ করছি, কিছু গোপন কোরো না আমার কাছে।

জয়ন্তী কোন রকমে বলল, তিনি আমাকে আপনার হাতে সম্প্রদান করেছেন।

সম্প্রদান! আমার হাতে! কিন্তু কেন? কী উদ্দেশ্যে? কী অভিপ্রায় তাঁর?

সেবা করে তিনি আপনাকে সুখী করতে বলেছেন, বলেছেন সর্বদা তাঁদের মঙ্গল চিন্তা করতে।

শুক্র বললেন : জানি না, এর পিছনেও ইন্দ্রের কী অভিসন্ধি আছে। কিন্তু তোমার পরিচর্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি তোমার মঙ্গল চাই। তোমার বাসনার কথা বল, আমি তা পূরণ করে যাব।

বাসনা! আমি তো কোন বাসনা-কামনা নিয়ে আপনার কাছে আসিনি, প্রভু। আমি আমার অধিকার চাই, আমরণ আপনার সেবার অধিকার।

শুক্র যেন গর্জন করে উঠলেন, অসম্ভব!

অসম্ভব কেন?

আমি সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হতে চাই না। আমি—

আমি কি কোন মায়ায় আবদ্ধ করেছি আপনাকে, না আপনার ধর্ম রক্ষার সহায় হয়েছি? তবে কেন আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন? সেকি শুধু দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যা বলে?

তুমি শত্রুপক্ষের কন্যা। তোমাকে আমি আমার গৃহে স্থান দিতে পারি না। অসম্ভব সে কাজ। আমার শিষ্যদের কাছে তা পরম অবিশ্বাসের কাজ হবে।

কেন তা হবে?

তোমাকে শত্রু পক্ষের চর ভাববে সকলে। তোমার কুটিল পিতার এও এক চক্রান্ত বলে ভাববে তারা। তোমাকে গৃহে স্থান দিলে আমাকেও তারা আর বিশ্বাস করবে না। এই বোধহয় তার উদ্দেশ্য।

কিন্তু প্রভু, কন্যার জীবন নিয়ে কি তিনি খেলা করেছেন মনে হয়?

মানুষ এ রকম নিষ্ঠুর খেলা খেলতে পারে না। কিন্তু সে তো মানুষ নয়, সে দেবতা। দেবরাজ সে। তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। সে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য শত্রুকেও কন্যাদান করতে পারে, বিক্রয় করতে পারে নিজের পত্নীকে।

জয়ন্তী দু হাতে তার কান ঢাকল। কিন্তু শুক্র বললেন, তুমি লজ্জা পাচ্ছ, কিন্তু তার কোন লজ্জা নেই। স্বর্গের সিংহাসনই তার একমাত্র কাম্য।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে শান্ত হলেন দৈত্যগুরু। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তুমি অন্য কিছু চাও জয়ন্তী, তোমাকে আমি অদেয় কিছু রাখব না।

জয়ন্তী কাঁদছিল দু হাতে মুখ ঢেকে। বলল, তবে আমাকে একটা

অনুমতি দিন।

কী অনুমতি?

আপনার সামনে আপনার এই অগ্নিকুণ্ডে আমি আমার জীবন বিসর্জন দিতে চাই।

চমকে উঠলেন দাম্ভিক দৈত্যগুরু। বললেন. কেন, কী প্রয়োজন তার?

আমার জীবনেরই বা আর কী প্রয়োজন!

এই তো তোমার জীবনের আরম্ভ।

কিন্তু—

বল।

জয়ন্তী ইতস্তত করল একটুখানি, তারপর বলল, পিতা যাঁর হাতে আমাকে সম্প্রদান করলেন, তিনি গ্রহণ না করলে মৃত্যু ছাড়া অন্য পথ আমার কী আছে! আমি তো দ্বিচারিণী হতে পারি না, প্রভু।

এ কথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না দৈত্যগুরু। তাই দেখে জয়ন্তী বলল, আমি মিনতি করছি, আত্মহত্যা পাপ বলেই অনুমতি চাইছি, আমাকে মরতে দিন। আশীর্বাদ করুন যেন আমি কুলটা বলে চিহ্নিত না হই।

গম্ভীর স্বরে শুক্র বললেন, না, এ অনুমতি আমি দিতে পারি না। আমি মানুষ। কাউকে জীবন দান করতে পারি না, কিন্তু জীবন রক্ষা করা আমার কর্তব্য। প্রয়োজন হলে শত্রুর জীবনও আমাকে রক্ষা করতে হবে। এর চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই।

তবে আমি কী করব, আপনিই বলুন।

যদি একটা প্রতিশ্রুতি দাও, তবে বলি।

বলুন। আমি আপনার যে কোন কথা রাখব, এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

শুক্র ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন, তোমাকে আমি স্বগৃহে নিয়ে যেতে পারি না। কিন্তু কোন নির্জন স্থানে কিছু কালের জন্য তোমার সঙ্গে সংসার ধর্ম পালন করতে পারি। সন্তানের জন্ম হলে তুমি আমাকে মুক্তি দেবে, এই প্রতিশ্রুতি দাও।

আনন্দে উজ্জ্বল হল জয়ন্তীর মুখ, বলল, আপনি আমাকে গ্রহণ করলেন, এই আমার পরম সৌভাগ্য। ভবিষ্যতের কথা আমি ভাবি না।

শুক্র বললেন, তবে এসো, আমরা গন্ধমাদন পর্বতের পাদদেশে কিছু কাল বাস করি। তুমি সুখী হও, সার্থক হও। জীবন সম্পূর্ণ হলে হাসি মুখে

তুমি আমাকে বিদায় দিও।

জয়ন্তী প্রণাম করল দৈত্যগুরু শুক্রকে। তারপর দুজনে মনে মনে কৈলাসবাসী শিব ও পার্বতীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে গন্ধমাদন পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন। দক্ষিণে হিমালয়ের অন্তরিক্ষ প্রদেশে বিবস্বানের গন্ধর্ব রাজ্য। বিবস্বানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুর পুত্র ও পৌত্ররা রাজত্ব করছেন নানা স্থানে। তারও দক্ষিণে পৃথু রাজার রাজ্য পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করেছেন এই বংশের রাজারা। দেবরাজ যখন আত্মগোপন করে মানস সরোবর অঞ্চলে বাস করছিলেন, তখন অরাজক স্বর্গরাজ্যের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন চন্দ্র বংশের রাজা নহুষকে। তাঁর পুত্র যযাতি এখন পৃথিবীতে রাজত্ব করছেন। দৈত্য বংশের বলি পাতালে নির্বাসিত হয়েছেন। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এই পাতাল বিভিন্ন নামে সুদূর বিস্তৃত। দানব বংশের কনিষ্ঠ পুত্র বৃষপর্বাও পৃথিবীতে রাজত্ব করছেন। নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে পৃথুর সাম্রাজ্য। ইলাবৃত বর্ষের স্বর্গ রাজ্যের চেয়ে পৃথিবীর রাজারা প্রবল হয়ে উঠছেন। অমরাবতীতে ইন্দ্র তাই নিশ্চিন্ত বোধ করছেন না। গন্ধমাদনের দিকে পৃথিবী থেকে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেবার কথা ভাবছেন। এই পথ যত দিন থাকবে, দেবাসুরের বিবাদ তত দিন বন্ধ হবে না। স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝখানে গন্ধমাদন পর্বতের একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথই দুটি দেশের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। এটি বন্ধ করে দিলেই দুই দেশের বিবাদ শেষ হয়ে যাবে।

দৈত্যগুরু শুক্র জয়ন্তীকে নিয়ে চলে এলেন এই গন্ধমাদন পর্বতেরই সানুদেশে। তারপর একটি রমণীয় স্থান নির্বাচন করে আশ্রম রচনা করলেন। অদূরে একটি নির্ঝরিনী স্বচ্ছ জলের ধারা নিয়ে সশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে। কয়েকটি ফলবতী বৃক্ষ ছায়া বিস্তার করেছে একটি প্রাঙ্গনের চারি ধারে। মাঝখানে দুর্বাদল শ্যাম তৃণভূমি। নিকটে ও দূরে আরও কয়েকজন তপস্বী কুটীর নির্মাণ করে বাস করছেন। শুক্রও জয়ন্তীর সহায়তায় একটি পর্ণকুটীর নির্মাণ করলেন।

নানা জাতের মৃগ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে এখানে। বনের পশু প্রাণী হিংসা শেখে নি, প্রাণীকে ভয় করতে জানে না। তাই নির্ভীক চিত্তে ঘুরে বেড়ায়, কাছে আসে গৃহপালিত পশুর মতো। সবৎস গাভী বিচরণ করে, অশ্বও দেখা যায়। কী অপরূপ শান্ত পরিবেশ! কী শান্তির জীবন!

যাঁরা এখানে বসবাস করছেন, তাঁরা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে নির্ঝরিণীর

জলে অবগাহন স্নান করছেন উষার বন্দনা গান করে। প্রণাম করছেন জ্যোতির্ময় সূর্যকে, যাঁর প্রকাশে জেগে উঠছে জগৎ, ফুল ফুটছে বৃক্ষের শাখায়। অগ্নিহোত্রের অগ্নি রক্ষার জন্য শুকনো কাঠ সংগ্রহ করছেন তাঁরা, কুশ দিয়ে আসন রচনা করছেন, ফল আহরণ করছেন, দুহিতারা দোহন করছে গাভী। অরণ্যের নানা স্থানে যে নীবার ধান্য জন্মে, তাই সংগ্রহ করে রেখেছেন গৃহিনীরা। নূতন আগন্তুক জয়ন্তীকেও তাঁরা সাহায্য করলেন ঘর বাঁধতে। ধান দিলেন, রন্ধন শেখালেন, শেখালেন গাভী দোহন। গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করতে শিখল রাজকন্যা জয়ন্তী। জীবনের আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল তার নারী হৃদয়। এ জীবনের আস্বাদ সে আগে পায় নি। সমস্ত শরীর ও মন দিয়ে সে এই জীবনের সমস্ত রস পান করে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবার চেষ্টায় উন্মুখ হয়ে উঠল।

অন্যান্য তপস্বীদের আশ্রমে জয়ন্তী শিশুদের কলকাকলি শুনল, দেখল তাদের নানা রকমের খেলা। সেই সব শিশুদের মায়েদেরও দেখল, দেখল তাদের বাৎসল্য রসের আনন্দ। হৃদয়ের কোন গোপন স্থানে শুনল একটি মধুর বারতা এবং তা অকপটে প্রকাশ করল তার প্রভুর নিকটে। দৈত্যগুরু শুক্র সস্নেহে প্রশ্রয় দিলেন জয়ন্তীর সেই অভিলাষকে। দেবযানীর জন্মের সূচনা হল।

অগ্নিহোত্রের সামনে বসে বিগত জীবনের কথা ভাবছেন দৈত্যগুরু শুক্র। কন্যা দেবযানী তার মায়ের কথা জানতে চাইছে। কিন্তু সে কথা তিনি কন্যাকে বলতে পারছেন না। তাঁর নিজের মনেই একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলেছিল দীর্ঘ দিন ধরে। তিনি তাঁর আশ্রমে সেদিন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েছিলেন। একদিন নয়, পর পর কয়েক দিন তাকে দেখেছিলেন। তাকে চর বলে সন্দেহ হয়েছিল—দেবরাজ ইন্দ্রের চর। কিন্তু এই সন্দেহ হবার পর তাকে আর দেখতে পান নি।

দেবযানীর তখন জন্ম হয়েছে। সে তখন শিশু। মায়ের কোল থেকে মাটিতে নামতে শিখেছে দেবযানী। দৈত্য গুরুর মনে হল, চক্রান্তকারী ইন্দ্র সুকৌশলে তাঁকে সংসারে আবদ্ধ করে রেখেছেন।

দৈত্য গুরু শুক্রের মনে পড়ছে সেদিনের কথা। জয়ন্তী বোধ হয় তার

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারে নি। তাই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল পাল্টা প্রশ্ন করে, কী বলছ তুমি ?

শুক্র বলেছিলেন, তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার আগে তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে, এক দিন তুমি আমাকে মুক্তি দেবে। আজ আমি মুক্তি চাইছি তোমার কাছে !

কেন, কী করেছি আমি ? হঠাৎ আজ তুমি মুক্তির কথা ভাবছ কেন ?

যাদের জন্যে আমি তপস্যা করতে বেরিয়েছিলাম, তাদের কথা ভুলে গিয়ে আমি গভীর অন্যায় করেছি এত কাল। এবারে আমাকে যেতে হবে।

কিন্তু আমি তো তোমার কাছে কোন দোষ করি নি।

শুক্র ভাবলেন মুহূর্ত কাল, তারপর বললেন, না, কোন দোষ কর নি।

তবে আমাকে ত্যাগ করে যাবে কেন ? আমিও কি তোমার সঙ্গে যেতে পারি না ?

গম্ভীর স্বরে শুক্র বললেন, না।

কেন ?

বলে যেন আর্তনাদ করে উঠল বিস্মিত জয়ন্তী।

তুমি ইন্দ্রের কন্যা, ইন্দ্র আমার শিষ্যদের শত্রু। তাকে ঘৃণা করে তারা। তোমাকে আমার গৃহে দেখলে আমার প্রতিও তারা শ্রদ্ধা হারাবে।

তোমার কাছে কি তাদের এই শ্রদ্ধাই আমার চেয়ে প্রিয় ? এত দিনের এত সেবা দিয়েও কি আমি তোমার বুকে একটুখানি স্থান সংগ্রহ করতে পারি নি ? তোমার কাছে কি কোন মূল্য নেই আমার ভালবাসার ?

শুক্র শান্ত স্বরে বললেন, তুমি উতলা হয়ো না জয়ন্তী। তোমার কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু—

বল।

শিষ্যদের কাছে আমি অঙ্গীকার বদ্ধ আছি। আমাকে ফিরে যেতেই হবে।

জয়ন্তী বলল, আমি তো তোমাকে ফিরে যেতে বাধা দিচ্ছি না, বলছি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। তুমি আমাকে গৃহে স্থান দিয়েছিলে তোমার সহধর্মিণী রূপে, আজ সে অধিকার আমার কেড়ে নিতে চাইছ কেন ?

তুমি ভুল বুঝেছ জয়ন্তী। তোমার কোনো অধিকার আমি কেড়ে নিচ্ছি না। তুমি এই আশ্রমেই থাকবে, এইখানে এই মর্যাদা নিয়ে। তপস্বীরা যেমন

তপস্যা করতে যান, আমি তেমনি করেই তোমার অনুমতি নিয়েই স্বগৃহে ফিরে যেতে চাই।

আবার কবে ফিরে আসবে ?

জানি না ফিরব কিনা।

মনের কোনে ফিরে আসার বাসনা নিয়ে কি যেতে চাও ?

তা বলতে পারি না।

তবে কি চিরকালের জন্যেই যেতে চাইছ ?

মনে কর তাই সত্যি।

আর্ত কণ্ঠে জয়ন্তী বলল, তবে আমি আমাদের কন্যাকে কী পিতৃ পরিচয় দেব ? তারই জন্যে কি আমাকে বেঁচে থাকতে হবে ? এই শাস্তি দিয়ে যেতে চাও আমাকে !

উদ্‌গত কান্নায় ভেঙে পড়ল জয়ন্তী। আর শুক্র স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তুমি আমাকে মুক্তি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে !

দিয়েছিলাম। তোমাকে পাবার জন্যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ভেবে-ছিলাম যে সেবায় যত্নে ভালবাসায় তোমাকে আমি চিরকাল ধরে রাখতে পারব, প্রতিশ্রুতির কথা তুমি ভুলে যাবে।

সত্যিই আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

তবে আজ এত দিন পরে এ কথা তোমার মনে পড়ছে কেন ?

কেন তা শুনতে চাও ?

বল।

তোমার পিতার চর এখনও আমার পেছনে ঘুরছে। না জানি আমার শিষ্যরা এখন কেমন আছে, কী অবস্থা হয়েছে তাদের। আমি তাদের গুরু, নিজের প্রাণ দিয়ে তাদের রক্ষা করা আমার কর্তব্য।

জয়ন্তী বলল : সহধর্মিণীর প্রতি কি তোমার কোন কর্তব্য নেই ?

প্রগল্‌ভ হয়ো না জয়ন্তী, বৃথা তর্ক কোরো না।

এতো নিষ্ঠুর তুমি ! এমন নির্মম নির্দয় !

শুক্র বললেন : হ্যাঁ, কর্তব্য পালনের জন্য অটল অবিচল।

জয়ন্তী বলল, পিতা ঠিকই বলেন, অসুররা নির্মম নির্দয় নিষ্ঠুর, যুদ্ধে তারা প্রাণ দিতে পারে অবলীলায়, মৃত্যুকে ভয় পায় না, শোক করে না প্রিয়জনের

মৃত্যুতে। ঠিকই বলেন আমার পিতা। তাদের সঙ্গে থেকে তুমিও এমন নিষ্ঠুর হয়েছ।

শুক্র কোন প্রতিবাদ করলেন না, উত্তরও দিলেন না কোন।

যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে যখন তিনি বিদায় জানাতে এলেন, তখন জয়ন্তীও কোন কথা না বলে দেবযানীকে তুলে দিল তাঁর হাতে। তারপর প্রণাম করল পাদ স্পর্শ করে।

বিদায়ের সময়ে আর কোন কথা হল না। জয়ন্তী দাঁড়িয়ে রইল নির্বাক হয়ে। আর শিশু কন্যা দেবযানীকে কোলে নিয়ে দৈত্য গুরু স্বগৃহে যাত্রা করলেন নিঃশব্দে।

এর পরের কথা তিনি জানেন না। জয়ন্তী কোথায় আছে, কেমন আছে, বেঁচে আছে কিনা, তাও তাঁর জানা নেই। নিজের হৃদয়-হীণতার কথা তিনি কন্যাকে বলতে পারেন না। বলা যায় না। কন্যা এখন বড় হয়েছে, বুদ্ধি বিবেচনা হয়েছে তার। পিতাকে সে ক্ষমা করবে না, করতে পারবে না। কন্যাকে তিনি বোঝাতে পারবেন না যে তিনি ভুল করেন নি। তাঁর নিজের মনেই সন্দেহ জেগেছে, নিজেকেই তিনি আজকাল সমর্থন করতে পারছেন না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় তাঁর সেই পুরাতন আশ্রমে ফিরে যেতে। কিন্তু ভয় হয় ইচ্ছার চেয়ে বেশি। আশ্রম শূন্য দেখলে তাঁর শূন্য হৃদয় হাহাকার করে উঠবে। অবিচার করেছেন তিনি, অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে এই অবিচার করেছেন। অমানুষের কাজ করেছেন। অধর্মের কাজ। মানুষের পরম ধর্ম ক্ষমা ও প্রেম, নিষ্ঠুরতা নয়, অহংকার নয়। অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে প্রেমকে অবজ্ঞা করে তিনি মনুষ্যত্বেরই অবমাননা করে এসেছেন।

জয়ন্তীকে নিয়ে স্বগৃহে ফেরার আর কোন বাধা ছিল কিনা, সে কথাও তিনি অনেক দিন ভেবেছেন। এখন মনে হয় যে সব চেয়ে বড় বাধার কথা তাঁর হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল। সে বাধা দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা সুরুচি। শর্মিষ্ঠার জন্ম তখনও হয় নি। সুরুচিই ছিল বৃষপর্বার একমাত্র কন্যা। ঘর আলো করা এই কন্যাটি ছিল পিতামাতার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। বৃষপর্বা দৈত্য কুলের পরম ধার্মিক রাজা বিরোচনের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছিলেন। যুবক বিরোচনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে পিতা প্রহ্লাদ তপস্যা করতে চলে গেলেন।

নানা কারণে রাজ্য পালনে তাঁর রুচি ছিল না। কোন গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি ক্ষত বিক্ষত হচ্ছিলেন মনে মনে। বোধ হয় একটা পাপ বোধও প্রবল হয়ে উঠেছিল। তিনিই যে তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। ত্রিভুবনের অধীশ্বর ছিলেন তাঁর পিতা। স্বর্গচ্যুত দেবতারা তাঁকে বধ করবার জন্য বিষ্ণুর শরণ নিয়েছিল। মাঝে মাঝেই খণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিল, তারপর বিষ্ণু এসে যোগ দিলেন যুদ্ধে। প্রহ্লাদেরা পাঁচ ভাই, বড় চারজনই এই যুদ্ধে নিহত হল। প্রহ্লাদ বিষ্ণুর শরণ নিলেন গোপনে এবং হিরণ্য-কশিপুকে অতর্কিতে আক্রমণ করার সুযোগ এনে দিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বার বার বলেছেন যে বিনা দোষে যে তার পিতৃব্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছে, সে দৈত্যকুলের বন্ধু নয়, তাকে প্রশ্রয় দিও না। সে শত্রু, শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা হয় না। কিন্তু প্রহ্লাদ এ কথা শোনেন নি। সায়াহ্নের অন্ধকারে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন বিষ্ণুকে, লুকিয়ে রেখেছিলেন একটি স্তম্ভের আড়ালে। মস্তকে সিংহের শিরস্ত্রাণ, হাতের অঙ্গুলিতে বাঘ নখ। অপ্রস্তুত হিরণ্যকশিপুকে সহসা আক্রমণ করে বিষ্ণু তাঁকে বধ করতে পেরে-ছিলেন। কেউ না জানলেও প্রহ্লাদ এ কথা জানেন, নিজের অপকীর্তির জন্যে অনুশোচনা এসেছিল পরে। বিষ্ণু তাঁকে স্বর্গ রাজ্যের অধিকার দেন নি, দিয়েছিলেন ইন্দ্রকে। আর তাঁকে বসিয়েছিলেন দৈত্যকুলেরই সিংহাসনে, তাঁর পিতৃব্য অন্ধককে সরিয়ে। ভাইএ ভাইএ বিবাদ করতে জানত না দৈত্য ও দানবেরা। তাই অন্ধক এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু অনুতাপে পুড়ে প্রহ্লাদ রাজত্ব করতে চান নি। অন্ধককেই পুনরায় সিংহাসনে বসিয়ে নিজে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। অন্ধকের অকাল মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পুত্র বিরোচন রাজা হবার যোগ্য হয়ে উঠতেই তাকে সিংহাসনে বসিয়ে ফিয়ে গিয়েছিলেন।

ধার্মিক বলে অহঙ্কার ছিল বিরোচনের। ইন্দ্র তাই সুকৌশলে এই বীর পুরুষের প্রাণ হরণ করেছিলেন। বিরোচন যখন দান করছিলেন অকাতরে, তখন ইন্দ্র প্রার্থীর বেশে এসে সংকল্পবদ্ধ বিরোচনের কাছে তার সমুকুট মস্তক চেয়েছিলেন। ধার্মিক বিরোচন কোন দ্বিধা না করে তাই দিয়েছিলেন। আর বৃষপর্বার প্রিয় কন্যা সুরুচি যৌবনে পদার্পন করবার স্বল্পকাল পরেই বিধবা হয়েছিল। বলির জন্ম হয়েছিল তখন, তাই তাকে কোলে নিয়ে স্বামীর শোক ভোলবার চেষ্টা করেছিল সুরুচি। দৈত্য গুরু শুক্র এই শিশুকেই

সিংহাসনে বসিয়ে দৈত্য রাজ্য রক্ষা করছিলেন। ইন্দ্র নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন দৈত্য ও দানবকুলের সঙ্গে। ত্রিশিরা ও বৃত্রকে বধ করলেন অন্যায় ভাবে, বলিকে বন্ধন করে পাতালে পাঠালেন বিষ্ণুর সহায়তায়। পুত্রকে হারিয়ে সুরুচি এক সময়ে ফিরে এসেছিলেন পিতৃগৃহে বৃষপর্বার কাছে। তিনি সবই জেনেছেন। কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত হতে চান না বৃষপর্বা। অথচ ইন্দ্র এখনও তাঁর পুরনো শত্রুদের ভুলতে পারছেন না।

দৈত্যগুরু শুক্রের মনে যে একটা ভয় সঙ্গোপনে ছিল, তা তিনি সেদিন বুঝতে পারেন নি। তিনি এখন দানবরাজ বৃষপর্বার রাজ্যে বাস করছেন তাঁর রাজধানীতে, তাঁরই প্রাসাদের সন্নিকটে। তিনি তাঁরও গুরু, গুরু সমগ্র দানব ও দৈত্যকুলের। তাঁরই প্রাসাদে তাঁর প্রিয় কন্যা সুরুচি বিধবার বিষণ্ণ জীবন যাপন করছিলেন। এই ঘটনার জন্য রাজপরিবারের প্রত্যেকে এখনও প্রবল ঘৃণা পোষণ করে ইন্দ্রের প্রতি। আর সেই ইন্দ্রের কন্যা তাঁরই গৃহিনী হয়ে এসেছে শুনলে মর্মাহত হত সকলেই। হয়তো বা তাঁকেও সকলে ঘৃণা করতে আরম্ভ করত। সেই পরিবেশে গুরুর সম্মানে তাঁকে বঞ্চিত হতে হত।

আজ তাঁর অন্য কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে তাঁর নিজের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি একটি নিষ্পাপ জীবনকে নষ্ট করে এসেছেন। কখনও ভেবেছেন যে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন সব কথা সবার কাছে স্বীকার করে, কিন্তু পরক্ষণেই পিছিয়ে এসেছেন। সত্যকে লুকিয়েছেন দেবযানীর মায়ের পরিচয় গোপন করে। অনেকেই হয়তো জানে, সন্দেহ করে অনেকেই। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউই কিছু বলে না। সে বোধহয় গুরুর সম্মানে। তাই দেবযানী মাঝে মাঝেই তাঁকে প্রশ্ন করে, আমার মা কোথায় বাবা? কেন মা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে?

ধীরে ধীরে চোখ খুললেন দৈত্যগুরু শুক্র। দেখলেন, অগ্নিশালায় তাঁরই কাছে বসে আছে দেবযানী। বিষণ্ণ ব্যথিত তার দৃষ্টি। সে বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে মায়ের কথা জানতে চেয়ে তার পিতার কোন দুর্বল স্থানে সে আঘাত দিয়ে ফেলেছে। তাই পিতাকে চোখ মেলতে দেখে কোন কথা না বলে রাত্রির আহার আনতে চলে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রায় একই সময়ে কতকটা একই ভাবে দানবরাজ বৃষপর্বার কনিষ্ঠা কন্যা শর্মিষ্ঠা তার মাকে জিজ্ঞাসা করল : দেবযানীর মা নেই কেন মা?

মহারাণী বললেন : সকলের কি মা থাকে?

কেন থাকে না?

আমিও এক দিন থাকব না।

কেন?

কেউ চিরকাল থাকবার জন্যে আসে না। সবাইকেই যেতে হয়। কেউ আগে যায়, কেউ যায় পরে। আমাকেও এক দিন যেতে হবে।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন : তোমার সখীরা কোথায়?

শর্মিষ্ঠা বলল : আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

তবে তুমি যাচ্ছ না কেন তাদের কাছে?

তারাও যে দেবযানীর মায়ের কথা জানতে চায়! দেবযানী বলেছে, সে জানে না, মাকে তার মনে পড়ে না। কেন মা, তোমার কথা কি আমি কখনও ভুলে যেতে পারব?

মহারাণী বললেন : খুব শৈশবের কথা মনে থাকে না। কিন্তু তার মায়ের কথা জানবার জন্যে আজ তোমাদের এমন কৌতূহল কেন?

আমার এক সখী বলছিল, সে নাকি দেবকন্যা. কোন দেবকুমার আসবে তার কাছে।

দেবকুমার আসবে দানব রাজ্যে! নানা, তা কি সম্ভব হতে পারে!

হ্যাঁ মা আমরা শুনেছি, দেবযানীকে নিয়ে যাবার জন্যে এক দেবকুমার আসছে।

মহারাণী সবিস্ময়ে বললেন : দেবযানী জানে এই কথা?

না মা, তাকে আমরা কিছুই বলি নি। শুধু তার মায়ের কথা জানতে চেয়েছিলাম। কাঁদতে কাঁদতে সে তাদের আশ্রমে ফিরে গেছে।

শর্মিষ্ঠার মাথায় হাত বুলিয়ে রাণী বললেন : এ সব কথা তোমরা আর

কাউকে বোলো না।

কেন, মা?

দেবতারা আমাদের শত্রু ছিল। ভয়ঙ্কর শত্রু। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। কত জন মারা গেছে তার কোন হিসেব নেই। তাই দেবতাদের কথা আর মুখে এনো না। আবার সেই পুরনো শত্রুতা জেগে উঠতে পারে।

দেবযানী কি তাহলে দেবকন্যা নয়?

সে আমাদের আচার্যের কন্যা, গুরুকন্যা। সবার প্রিয় সে, সবার পূজনীয়। তার জন্ম নিয়ে কোন প্রশ্ন করতে নেই। যাও মা, তোমার সখীদের কাছে গিয়ে বল, এ সব কথা নিয়ে আলোচনা যেন আর না করে। মহারাজা জানতে পারলে রুষ্ট হবেন।

কেন, মা?

দেবতাদের নিয়ে তিনি কোন অলোচনা পছন্দ করেন না। পুরনো কথা মনে পড়ে গেলে তিনি কষ্ট পান।

কেন কষ্ট পান, মা?

তাঁর বয়েস যখন কম ছিল, তখন তাঁকেও অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছিল। যে আত্মীয় বন্ধুরা যুদ্ধে মারা গেছেন, তাঁদের কথা মনে পড়লে কষ্ট পান তিনি। তুমি যাও মা, তোমার সখীদের সঙ্গে খেলা কর।

বলে শর্মিষ্ঠাকে এক রকম জোর করেই বিদায় দিলেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে দানবরাজ বৃষপর্বা এসে পড়তে পারেন এবং এই আলোচনা শুনলে ক্রুদ্ধ হবেন।

কয়েকজন দাসী তাঁর পরিচর্যা করছিল। যে তাঁকে তালপাতার পাখায় ব্যজন করছিল, সে বলল: মহারাজা এখন আসবেন না, তিনি নৃত্য সভায় গেছেন। সুরা নিয়ে গেছে কিঙ্করেরা।

মহারাণী বললেন: আজ কি কোন অতিথি এসেছেন?

তা জানি নে। তবে নৃত্য গীতের আজ একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে বলে শুনেছি। আজ কোন নতুন অপ্সরা এসেছে অলকাপুরী থেকে, প্রধান গন্ধর্ব তাকে সভায় আনবে।

তাই বুঝি আজ অন্তঃপুরে অনেককে দেখছি না।

দাসী মাথা নিচু করে রইল। আর মহারাণী বললেন: এই ব্যসন

স্ত্রীলোকের জন্য নয়। নৃত্যগীত করে স্ত্রীলোক পুরুষের মন ভোলাবে, এ ভাল নয়। এ কাজ নিন্দার্হ। এ সব দেখাও অনুচিত।

দাসী কোন উত্তর দিল না। সে জানে শর্মিষ্ঠা নৃত্য গীতের অনুরাগী, সুযোগ পেলে সেও একজন শিল্পী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সমাজের নিয়মে তাকে এই বাসনা ত্যাগ করতে হয়েছে। সে অন্তরালে থেকে গন্ধর্বদের গান শোনে, আর নাচ দেখে অপ্সরাদের। সখীদের মুখে সংবাদ পেয়ে আজও সে হয়তো আড়ালে থেকে নাচ গান উপভোগ করবে। কিন্তু দাসীর কাছে কোন উত্তর না পেয়ে মহারাণী বললেন : কোন কথা বলছ না যে? তোমরা কী আমাকে সমর্থন কর না?

দাসী বলল ঃ আপনার কথা তো আমরা অমান্য করতে পারি না। আপনি যা বলবেন তাই আমরা ন্যায্য কথা বলে মানব।

অর্থাৎ আমি যদি নৃত্য গীতকে ভাল বলি, তাহলে তোমরাও নাচ গান করতে আরম্ভ করবে, এই তো!

আপনার মনোরঞ্জনই আমাদের ধর্ম। নিজের মতামতের কোন মূল্য আশা করা আমরা পাপ বলে মনে করি।

তা হলে কি—

কথাটা আরম্ভ করেও মহারাণী থেমে গেলেন। নৃত্য গীতে শর্মিষ্ঠার অনুরাগের কথা তাঁর কানে এসেছে। কিন্তু তিনি নিজের চোখে কিছু দেখতে পান নি। তিনি চাইছিলেন যে দাসীরা কেউ সে কথা তাঁকে বলুক। নিজে থেকে সরাসরি কোন প্রশ্ন করতে তাঁর দ্বিধা উপস্থিত হল। তিনি তাই অন্য প্রসঙ্গে চলে এলেন, বললেন ঃ সুযোগ পেলে কি তোমরাও নৃত্যসভায় গিয়ে বসবে?

দাসী বলল ঃ আপনি গেলে আমাদেরও যেতে হবে বৈকি।

মহারাণী বুঝতে পারলেন যে নৃত্য গীত চর্চাকে এরা কোন দুর্নীতি বলে মনে করে না। এরাও বোধহয় বিশ্বাস করে যে এক সময়ে কৈলাসেও নৃত্য গীতের চর্চা ছিল। লোকে বলে যে প্রথম যৌবনে পার্বতীও নেচেছেন শিবের সঙ্গে। তাঁদের কাছেই নাচ গান শিখেছেন অলকাপুরীর গন্ধর্ব ও অপ্সরারা। কিন্তু এ সব তো শোনা কথা। এ সবের পিছনে কোন সত্য আছে কিনা কে জানে! আর থাকলেই বা কি! পুরুষের সামনে মেয়েরা কোমর দুলিয়ে নাচবে, এ বড়ই লজ্জার কথা! যাদের এই পেশা, তারাই নাচুক। ঘরের

মেয়ে বউরা নাচবে কেন !

অন্যান্য পরিচর্যাকারিণী দাসীরাও মহারাণীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারা শুনছিল মহারাণীর কথা। কিন্তু কেউই কোন কথার প্রতিবাদ করছিল না। প্রতিবাদের কথাগুলি তাঁর নিজেরই মনে পড়ে যাচ্ছিল বলে তিনি নিজেই কৈফিয়ৎ দিচ্ছিলেন। বললেন: আমাদেরই ব'শের এক মেয়ে ইলাবৃত বর্ষের রাণী ছিলেন। হ্যাঁ, আমি পুলোমা দানবের মেয়ে শচীর কথাই বলছি। সে অমরাবতীতে ছিল ইন্দ্রের সঙ্গে। কিন্তু তাকে তো ইন্দ্র নাচাতে পারে নি। এই বংশের মেয়ে কখনই নাচবে না। তাই ইন্দ্র অলকাপুরী থেকে বেছে বেছে সব সুন্দরী অপ্সরাদের নিয়ে গিয়ে তার সভায় নাচাচ্ছে। জন কয়েক নামী গন্ধর্বও আছে তাদের সঙ্গে গাইবার জন্যে।

দাসীরা কেউ বলতে পারত যে ইন্দ্রানী ইন্দ্রের পাশে বসে এই গান শোনেন এবং নাচ দেখেন অপ্সরাদের। কিন্তু এ কথা বলা ধৃষ্টতা হবে ভেবে সবাই নীরবে রইল। কিন্তু মহারাণীরও মনে পড়ে গিয়েছিল এই কথা। তাই বললেন: লোকে অবশ্য বলে যে শচী ইন্দ্রের সভায় তার পাশে বসে এই নাচ দেখেছে। তোমরাও বোধহয় শুনেছ ?

বলে সবার দিকেই তাকালেন। কিন্তু কেউ কোন উত্তর দিল না দেখে বললেন: কথাটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা জানি না। আর সত্যি হলেও তা দোষের ভাবব না এই জন্যে যে ইন্দ্র চরিত্রের লোক তাতে শচীর এতে রাজী না হয়ে কোন উপায় ছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে অনেক কিছু করতে হয়েছে বলে শুনেছি।

এইবারে একজন দাসী বলল: কেন মহারাণী ?

মহারাণী কোন দ্বিধা না করে বললেন: সুরা ও নারীর প্রতি ইন্দ্রের দুর্বলতার কথা তো কারও অজানা নয়, তাই তাকে ঘরে বেঁধে রাখবার জন্যে ইন্দ্রানীকে অনেক আব্দার মেনে নিতে হয়। হয়তো ভয় পায় যে সে নিজে ইন্দ্রের পাশে না বসলে ইন্দ্র হয়তো অপ্সরাদেরই কাউকে নিজের পাশে টেনে নেবে। সুরার নেশায় তা অসম্ভব বলে আমার মনে হয় না। ইন্দ্রের তো লাজ-লজ্জা বলে কিছু নেই। তার অনেক কুকীর্তির কথা আমরা জানি। সে ঘটনা তোমরা শোন নি ?

কোন্ ঘটনা ?

সে অনেক পুরনো ঘটনা। ইন্দ্রের তখন বয়স কম, আর উদ্ধত স্বভাব।

পুলোমার কন্যা শচীকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। পুলোমাকে নিহত দেখে সবাই সন্দেহ করেছিল যে ইন্দ্রই তাকে বধ করেছে, কিন্তু এমন ভাবে বধ করেছে যে কেউ তার প্রমাণ পায় নি বলে দানবরা প্রতিশোধ নিতে যায় নি। আর শচী তার পিতার মৃত্যু মেনে নিয়েছিল। এটাও একটা কারণ।

তারপরেই বললেন: হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম তোমাদের?

একটা পুরনো ঘটনা।

মনে পড়েছে। ইন্দ্র সেই শচীকে পাশে বসিয়ে অপ্সরাদের নাচ দেখছে দেবতাদের সঙ্গে। সুরার মাত্রা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। তাই ঐ রকমের একটা বেহায়াপনা করে বসল।

নিঃশব্দে সবাই তাদের কৌতূহল বিস্তার করে দিল।

মহারাণী বললেন: তাকে বেহায়াপনাই বলব। কী একটা কাজে দেবগুরু বৃহস্পতি ছুটে এসেছিলেন ইন্দ্রের কাছে। সভার দরজায় তাঁকে দেখেও তার চৈতন্য হল না। অপ্সরারা নাচ থামিয়েছিল, কিন্তু ইন্দ্র হেঁকে বলল, থামলে কেন? চালিয়ে যাও। আর—ভাবতেও আমার লজ্জা করে—

কিন্তু কথাটা তিনি শেষ করলেন না, বললেন: দেবগুরু লজ্জায় চোখ নামিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন খানিকক্ষণ, তারপর ফিরে গিয়েছিলেন।

কেন?

শিষ্যের এই ঔদ্ধত্য তিনি সহ্য করতে পারেন নি এবং শুধু সভাঘর থেকে নয়, তাঁর রাজ্য থেকেই চলে গিয়েছিলেন।

কোথায়?

তা কেউ জানে না, বোধহয় আত্মগোপন করেছিলেন কোথাও। ইন্দ্রের যখন চৈতন্য হয়, তখন নিজের অপরাধ বুঝতে পেরে গুরুকে অনেক খুঁজেছিল। কিন্তু কোথাও আর তাঁকে পায় নি। আর এই ঘটনার ফলেই তো দেবতাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ বেড়ে গিয়েছিল।

সহসা অন্তঃপুরে সাড়া পড়ে গেল, নৃত্যসভা থেকে মহারাজা চলে আসছেন।

দানবরাজ বৃষপর্বা অন্তঃপুরে এলেন। যথেষ্ট বয়স হয়েছে তাঁর। দনুর

কনিষ্ঠ পুত্র তিনি। কিন্তু বয়সে তাঁর বিমাতা দিতির পৌত্র প্রহ্লাদের চেয়েও ছোট। দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের বড় বড় যুদ্ধের কথা তাঁর মনে নেই। তখন তিনি নিতান্তই শিশু। হিরণ্যাক্ষর মৃত্যু হয়েছিল তাঁর জন্মের পূর্বে, হিরণ্যকশিপু নিহত হয়েছিলেন অতর্কিত আক্রমণে। যে যুদ্ধে দেবতাদের পরাজিত করে হিরণ্যকশিপু স্বর্গরাজ্য অধিকার করেছিলেন, সে যুদ্ধও তাঁর জন্মের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। তাঁর ভাগিনের বৃত্রের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হয়েছিল, তখন তিনি যুবক। সেই যুদ্ধে জয় হয়েছিল তাঁদের। বৃত্র রাজত্ব করেছিলেন কিছু দিন। স্বর্গচ্যুত হয়ে দেবতারা পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন অনেক দিন। তারপর ইন্দ্র সন্ধি করেছিলেন বৃত্রের সঙ্গে। মৈত্রীর সন্ধি হয়েছিল অগ্নি সাক্ষী করে, ঋষিরা মধ্যস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু কুচক্রী ইন্দ্র সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে বিষ্ণুর সঙ্গে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিলেন নিঃসঙ্গ বৃত্রকে। নিরস্ত্র বৃত্রকে বধ করেছিলেন অন্ধকারে সমুদ্রের তীরে বজ্র নিক্ষেপ করে। বৃত্র বধের জন্যই বিষ্ণুর মন্ত্রণায় এই বজ্র নির্মিত হয়েছিল। যুদ্ধে বারুদের ব্যবহার এই প্রথম। ভদ্রাশ্ব বর্ষ থেকে এই বারুদ আনা হয়েছিল এবং তা ব্যবহার করা হয়েছিল এক অতিকায় জন্তুর অস্থির মধ্য দিয়ে। এই বজ্রের আবিষ্কার হবার পর থেকেই ইন্দ্র দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু বজ্রের ব্যবহারে আত্মনাশের আশংকা আছে বলেই ইন্দ্র প্রাণ সংশয় না হলে এই অস্ত্র ব্যবহার করে না। অস্ত্রটি রেখেছে শত্রুকে ভয় দেখাবার জন্য এবং পূর্বের মতো ছলে ও কৌশলেই কাজ হাসিল করতে চায়। অন্তঃপুরে আসবার পথে বৃষপর্বা ভাবছিলেন এই সব পুরাতন কথা। তাঁর জামাতা বিরোচনকেও ইন্দ্র বধ করেছে ছলনা করে, দৌহিত্র বলিকেও এইভাবেই বন্ধন করে পাতালে পাঠিয়েছে। সত্যবদ্ধ বলি বিষ্ণুর এই ছলনা মেনে নিয়েছিল। তাই দেবতারা স্বর্গ রাজ্য ফিরে পেয়েছে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বলির সঙ্গে পাতালে যান নি, তিনি তাঁর রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন এবং দানব জাতির পৌরহিত্য করছেন।

দানবরাজ বৃষপর্বা অন্তঃপুরে এসেছেন জেনে তাঁর মহিষী এগিয়ে এসেছিলেন। স্বামীকে সামনে দেখে প্রশ্ন করলেন: তোমার শরীর সুস্থ তো।

তুমি কি আমাকে অসুস্থ ভাবছ?

না।

তবে?

খবর পেয়েছিলাম, তুমি নৃত্য সভায় কোন নতুন অপ্সরার নৃত্য দেখতে গেছ। তাই তোমাকে এত সত্বর ফিরতে দেখে ভাবনা হচ্ছে। তবে কি কোন দুঃসংবাদ পেয়েছ ?

মহারাজা বললেন : দুঃসংবাদ ঠিক নয়, চিন্তিত হবার মতো একটা সংবাদ চরেরা সংগ্রহ করে এনেছে।

মহারাণী বললেন : ইলাবৃত বর্ষ থেকে কোন দেবকুমার আসছে দেবযানীকে নিয়ে যাবার জন্য, এই তো ?

পরম বিস্ময়ে মহারাজা তাকালেন তাঁর মহিষীর মুখের দিকে। বললেন : তুমি আমার আগেই এ খবর পেয়েছ! কার কাছে পেয়েছ ?

মহারাণী বললেন : অমন আশ্চর্য হচ্ছ কেন ? তোমার রাজ্যে যা ঘটছে, তা তোমার আগেই জানতে পায় তোমার প্রজারা। পররাজ্যের খবরও তারা তোমার আগেই পেয়ে থাকে।

মহারাজা চিন্তিত ভাবে বললেন : তার মানে আমার চরেরা গোপনীয়তা রক্ষা করে আমার কাছেই। অর্থাৎ আমাকে নৃত্য সভা থেকে বাইরে ডেকে এনে যখন এই সংবাদ দিল, তার আগেই তারা তা সর্বত্র প্রচার করে বসে আছে। তবে তুমি কার কাছে এই সংবাদ পেয়েছ, তাই আমার জানা দরকার।

মহারাণী শান্ত ভাবে বললেন : আরাম করে বোসো, তারপর বলছি।

বলে মহারাজাকে তাঁর আসনে বসিয়ে নিজে বসলেন তাঁর কাছে। তারপর বললেন : শর্মিষ্ঠা তার সখীদের কাছে শুনেছে যে দেবযানী দেবকন্যা, তাকে নেবার জন্যে আসছে কোন দেবকুমার।

বৃষপর্বা বললেন : দেবযানীর সম্বন্ধে আমারও একটা সন্দেহ ছিল এই রকমই। কিন্তু আমি তা কারও কাছে কোন দিন প্রকাশ করি নি।

আমাকেও তো কিছু বল নি!

না। সন্দেহ অকারণ হতে পারে বলেই তা প্রকাশ করি নি। আমি দেশের রাজা, সন্দেহের কথা প্রকাশ করে দেশে একটা অশান্তির সৃষ্টি করা আমার অনুচিত হত।

এখন কি তোমার আর কোন সন্দেহ নেই ?

প্রমাণ না থাকলে সন্দেহ থেকেই যায়। আর গুরুদেব যখন এ বিষয়ে কিছু বলতে চান নি, তখন তা জানবার জন্য আমি কোন কৌতূহলও প্রকাশ

করি নি। তবু—

বল।

একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

মহারাণী বললেন : কী প্রশ্ন ?

গুরুদেব তপস্যা করে ফিরেছিলেন এই শিশুকন্যা কোলে নিয়ে। দেবযান পথে ফিরেছিলেন বলেই তার নাম রেখেছিলেন দেবযানী। দেবযানীর জননী কোন দেবকন্যা হলে গুরুদেব তাঁকে সঙ্গে আনেন নি কেন ? দেবকন্যা বলে ? কিন্তু গুরুদেব তো জানেন যে দেবতাদের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই এবং আমি এই বিরোধ প্রাণপণে এড়িয়ে চলি। কাজেই কোন দেবকন্যাকে সঙ্গে আনলে তাঁকে আমার রাজ্যে কোন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হত না।

মহারাণী কোন মন্তব্য করলেন না।

বৃষপর্বা বললেন : আরও একটা কথা আছে।

কী কথা ?

গুরুদেব ফিরে আসার পর অনেক বছর কেটে গেছে। সেই শিশুকন্যা এখন কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করতে চলেছে। দুদিন পর তার বিবাহের কথা ভাবতে হবে।

মহারাণী বললেন : শর্মিষ্ঠার কথা তো আমরা ভাবতে আরম্ভ করেছি। তারা একই বয়সী।

বৃষপর্বা বললেন : তাইতেই তো ভাবছি, দেবতারা এত দিন কেন কোন খবর নেন নি দেবযানীর ? এবং দেবযানীর কথা হঠাৎ তাঁদের মনে পড়লই বা কী কারণে ? গুরুদেবকে এ বিষয়ে এত দিন নির্বাক দেখে আমার ধারণা হয়েছিল যে দেবযানীকে দাবী করবার কেউ নেই।

মহারাণী বললেন : আমায় কী মনে হয়েছে জানো ?

বলো।

দেবযানীর রূপ দেখে আমার মনে হয়েছে যে সে কোন অপ্সরার কন্যা। কৈলাসে অপ্সরাদের যাতায়াত আছে, আর তারা যে রকমের জীবন যাপন করে, তাতে সন্তানের জন্ম দেবার পরে তাকে ফেলে যাওয়াই সম্ভব। গুরুদেব হয়তো কোন পরিত্যক্ত কন্যাকে কুড়িয়ে পেয়ে নিজের কন্যা বলে সযত্নে লালন করছেন।

বৃষপর্বা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন ; তুমি কি গুরুদেবকে দেবযানীর জনক

মনে কর না ?

মহারাণী বললেন : তাঁকে আমরা জিতেন্দ্রিয় বলেই জানি। কোন স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁর কোন দুর্বলতা কেউ কোন দিন দেখে নি। কাজেই কোন অপ্সরার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হবেন, এ কথা ভাবা যায় না।

তোমার যুক্তি আমি খণ্ডন করতে পারব না। কিন্তু দেবযানীর প্রতি তাঁর স্নেহ ও বাৎসল্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। অপরের কন্যাকেও কি এই ভাবে বুকে করে মানুষ করা যায়!

গুরুদেবের পক্ষে তা সম্ভব।

সম্ভব ?

শিষ্যের জন্য তিনি প্রাণ দিতে পারেন, তাঁর হৃদয়টা কত বড় ভাবো! যুদ্ধে বিগ্রহে ক্ষত বিক্ষত দৈত্যকুলে আর কজন অবশিষ্ট আছে! অথচ তাদের জন্য তাঁর কত মায়া, কত ভাবনা! তপস্যা করতে যাবার আগে কত দুশ্চিন্তায় তিনি কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন বল!

বৃষপর্বা বললেন : তাঁর অবর্তমানে দৈত্যদের আমি রক্ষা করার আশ্বাস দিতে পারি নি বলে সত্যিই তিনি বিচলিত হয়েছিলেন।

মহারাণী বললেন : কিন্তু তুমি এই আশ্বাস দিতে পারতে। তাদের রক্ষা করার শক্তি তোমার ছিল।

মহারাজা মেনে নিলেন এই কথা। বললেন : তা হয়তো ছিল। কিন্তু দেবতাদের সঙ্গে নতুন কোন বিরোধ আমি চাই নি। আমি জানতাম যে তারা যে চরিত্রের লোক, তাতে সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে ছাড়বে না।

কিসের সুযোগ ?

দৈত্যদের কোন অধিপতি এখন নেই, তারা এখন অরক্ষিত। অথচ শত্রু। এই সময়ে ইন্দ্র তাদের বধ করবার একটা ছুতো নিশ্চয়ই খুঁজবে।

মহারাণী বিমর্ষ ভাবে বললেন : একটা কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি। আমাদের বড় মেয়ে সুরুচির বিবাহ আমরা দৈত্য কুলেই দিয়েছিলাম। ইন্দ্রের ছলনাতেই সে বিধবা হয়েছে। আমাদের দৌহিত্র বলিকেও সে বন্ধন করে পাতালে নির্বাসিত করিয়েছে। ইন্দ্র কি আমাদেরও শত্রু নয় ? দৈত্যকুলকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করা কি আমাদেরও কর্তব্য ছিল না ? গুরুদেব কি এই আশা করেন নি আমাদের কাছে ?

নিশ্চয়ই করেছিলেন।

তবে আমরা পিছিয়ে গিয়েছিলাম কেন ?

পুরাতন শক্রতা আমরা ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। এই ভাবে চলতে থাকলে শক্রতার শেষ কোন দিন হবে না। পুরুষানুক্রমে তা চলে আসছে এবং চলতে থাকবে। তাই আমি এই শক্রতার ওপরে একটা ছেদ টানতে চেয়েছিলাম। গুরুদেবকে বুঝিয়ে বলেছিলাম সব কথা। তিনি বুঝেও ছিলেন। তাই রাগ করেন নি আমার ওপরে, কোন জোর করেন নি। আর তিনি নিজেও যুদ্ধ-বিরোধী। তিনিও বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধ দিয়ে যুদ্ধের অবসান হয় না, যুদ্ধ বর্জন করেই তা সম্ভব। আর এর জন্য একজনকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

মানে ?

আঘাতের উত্তরে প্রত্যাঘাত নয়, আঘাতের অপমান একজনকে হাসি মুখে মেনে নিতে হবে। যে তা মেনে নিতে পারবে, সেই হবে জয়ী। আঘাত করে কষ্ট দেওয়া যায়, জয় করা যায় না। জয় হয় ভালোবাসায়।

মহারাণী আশ্চর্য হয়ে বললেন : একি তোমার নিজের কথা ?

বৃষপর্বা বললেন : না, আমার কথা নয়। এ কথা আমি গুরুদেবের কাছেই শুনেছি। তপস্যা করতে যাবার সময়ে সমস্ত দৈত্যকে তিনি বল্কল পরে আশ্রমে তপস্বীর জীবন যাপন করতে বলে গিয়েছিলেন। অস্ত্র ত্যাগ করিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কথা ছিল, দেবতারা আক্রমণ করলে তারা যুদ্ধ করবে না, আত্মরক্ষার জন্যে পালিয়ে যাবে তাঁর মায়ের আশ্রমে। তিনি তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করবেন। তিনিও চান যে এই দীর্ঘ কাল ব্যাপী শক্রতার অবসান হোক।

কিন্তু আমাদের দৌহিত্র বলির কী হবে ? সে কি চিরকাল নির্বাসনেই থাকবে ?

মহারাজা বললেন : ফিরে আসার উপায় তো তার নেই। সত্যবদ্ধ হয়েই সে নির্বাসনে গেছে। তার পিতা বিরোচনও তো সত্যবদ্ধ হয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছে। তারা এ কালের উপযোগী ছিল না। সত্যের মর্যাদা যে একালে আর নেই, তা তারা বুঝেও বোঝে নি। সত্যের জন্য নিজেদের সর্বনাশ তারা নিজেরাই ডেকে এনেছে। কালের গতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে নি বলেই তাদের এই দুর্গতি হয়েছে। দেবতাদের আচরণ দেখেই আমরা শিক্ষা নিয়েছি।

বলে বৃষপর্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মহারাণী বললেন : চল, কিছু আহার করে বিশ্রাম করবে এখন।

মহারাজা বললেন : হ্যাঁ, কাল সকালে কী সংবাদ পাব জানি নে।

তুমি কি কোন দুঃসংবাদ পাবে বলে আশঙ্কা করছ?

যে আসছে সে দেবযানীকে নিয়ে যেতে, না অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, তা না জানা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

মহারাণীও উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন : তা ঠিক।

শয্যা গ্রহণ করবার পরেও রাজা বৃষপর্বা উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেন। ছলের অভাব নেই ইন্দ্রের এবং দেবগুরু বৃহস্পতিও চান না যে কেউ শান্তিতে বাস করুক। তাঁরা নিজেরা নিষ্কণ্টকে বাস করবার নামে পর রাজ্যে সারাক্ষণ অশান্তির সৃষ্টি করছেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় যে দৈত্য রাজারা ইন্দ্রদের ঠিকই চিনেছিলেন। তাই তাঁদের বারে বারে স্বর্গচ্যুত করেছিলেন। বাহুবলে দেবতারা স্বর্গ রাজ্য উদ্ধার করতে পারে নি, প্রতি বারেই তারা ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। এ কাজে তাদের মন্ত্রণা দিয়েছেন দেবগুরু বৃহস্পতি, আর শক্তি জোগাতে এগিয়ে এসেছেন ক্ষীরোদ সাগরবাসী বিষ্ণু। তিনি ধাতুর ব্যবহার জানেন। ধাতু নির্মিত নানা রকমের শিরস্ত্রাণ আছে তাঁর, বাঘনখ প্রভৃতি অস্ত্র আছে। চক্র নামে এমন একটি অস্ত্র নির্মাণ করেছেন যা নিক্ষিপ্ত হবার পরে পুনরায় ফিরে আসে। বিষ্ণুর বুদ্ধিতেই ইন্দ্র আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী হয়েছেন। এই সব আধুনিক অস্ত্রের সামনে তাঁরা এখন নিতান্তই দুর্বল। শুধু বাহুবলে জয় লাভ করতে হলে প্রাণ দিতে হয় অনেককে। স্বর্গ থেকে যে আসছে, তাকে প্রতিহত করবার উপায় ভাবতে লাগলেন দানবরাজ বৃষপর্বা। বাধা দেবেন, না অভ্যর্থনা করবেন তাকে? বাধা দিলে বিপত্তি হতে পারে, আবার অভ্যর্থনা করলেও দুর্বল ভাবতে পারে। তার সঙ্গে কি দেখা করবে, না গুরুদেবের কাছে যাবে সরাসরি? প্রহরীদের তিনি কী নির্দেশ দেবেন?

কিছু দিন আগের কথা তাঁর মনে পড়ছে। গুরুদেব তখনও কৈলাস থেকে ফিরে আসেন নি। তাঁর তপস্যা শেষ হয়েছে কিনা, সে সংবাদও তাঁর অজ্ঞাত ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, গুরুদেব তপস্যা করতে গেছেন এবং তপস্যা শেষ হলেই ফিরে আসবেন এই ধারণা নিয়েই তাঁরা নিশ্চিন্ত

ছিলেন। এর বেশি কোন খবরই তাঁরা রাখবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু ইন্দ্র নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারছিলেন না। নানা রকমের ভয়ে ও ভাবনায় তিনি চারি দিকে চর পাঠিয়েছিলেন এবং সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন।

একবার একটি চর তাঁর রাজ্যে ধরা পড়েছিল। তাকে সভায় এনে উপস্থিত করেছিল তাঁর রাজ্যের প্রহরীরা। মহারাজা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : তুমি কী সংবাদ আহরণে এসেছ? সে বলেছিল, দৈত্যগুরু কোথায় আত্মগোপন করে আছেন, তাই জানবার চেষ্টায় এসেছি। মহারাজা বলেছিলেন, তিনি তো কৈলাসে তপস্যা করছেন! সে বলেছিল, না, তাঁর তপস্যা শেষ হয়ে গেছে, কৈলাসে তিনি আর নেই।

মহারাজা বৃষপর্বা বিশ্বাস করেন নি এই কথা, তাই বলেছিলেন, এ হতেই পারে না। তপস্যা শেষ হলেই তিনি ফিরবেন, এই কথা বলেই তিনি গিয়েছিলেন। তাঁর তপস্যা শেষ হয় নি। তুমি অন্য কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেছ। সত্য বল, তা না বললে তোমাকে শূলে দেব। মহারাজার মনে আছে, সেই চর শপথ করে বলেছিল যে সে মিথ্যা বলে নি। দৈত্যগুরু কৈলাসে নেই বলে দেবরাজ ইন্দ্র চারি দিকে চর পাঠিয়েছেন তাঁকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে।

মহারাজা জানতে চেয়েছিলেন, কেন, কী দরকার তাঁকে। কিন্তু সেই চর বলেছিল, দরকারের কথা জানি নে, আমাদের ওপরে আদেশ তাঁকে খুঁজে বার করার। কোথায় কী করছেন তিনি, সেই সংবাদ দিতে হবে দেবরাজকে। মহারাজা বলেছিলেন, সত্যি বলছ? সে শপথ করে বলেছিল, একটি বর্ণও সে মিথ্যা বলে নি। তারপর তিনি প্রধান অমাত্যদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন সেই চরকে। তার কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে গুরুদেবের সন্ধান পেলে তাঁকে জানাতে হবে আগে। ইন্দ্র খবর পাবার আগেই যেন বৃষপর্বা সংবাদ পান তাঁর গুরুদেবের।

না, গুরুদেবের সংবাদ তিনি ইন্দ্রের চরের নিকটে পান নি। তিনি তাঁর নিজের চরের নিকটে শুনেছিলেন যে গুরুদেব তাঁদের পিতা কশ্যপের আশ্রমে ফিরে এসেছেন এবং সেখানে তিনি দৈত্যদের উপদেশ দিচ্ছেন। সেই উপদেশের মর্মার্থ জেনে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। নিজের দুই কানকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। ভেবেছিলেন নিজে গিয়ে দেখে আসবেন

গুরুদেবকে, স্বকর্ণে শুনবেন তাঁর নূতন উপদেশ। নিজের কানে না শুনলে কিছুতেই তা বিশ্বাস হবে না।

দৈত্যরা মহর্ষি ভৃগুর আশ্রম ত্যাগ করে তাঁদের পিতার আশ্রমে ফিরে এসে শান্তিতেই বাস করছিল। তিনি শুনেছিলেন যে ভৃগু তাঁদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন। অনেক দুঃখে বিষ্ণুকে তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং তারপর অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন। কারও অনিষ্ট করা তো ধর্ম নয়, সবার মঙ্গল প্রার্থনাই ধর্ম। বিষ্ণুকে অভিসম্পাত করে তিনি ধর্মচ্যুত হয়েছেন। তাই তিনি দৈত্যদের ডেকে বলেছিলেন, তোমরা এই আশ্রম ত্যাগ করে স্বস্থানে যাও।

পরম নিশ্চিন্তে তারা জীবন যাপন করছিল, তাই বিচলিত হয়ে বলেছিল, কোথায় যাব আমরা? ভৃগু বলেছিলেন, যেখান থেকে এসেছিলে, সেখানেই ফিরে গিয়ে বাস কর।

কিন্তু দেবতারা যে আমাদের বাঁচতে দেবে না। বলে কাতর ভাবে তাঁর আশ্রয় চেয়েছিল তারা। কিন্তু ভৃগু রাজী হন নি। কঠোর ভাবে বলেছিলেন, তোমরা সবাই আমার কাছে সমান। তোমরা ভাইএ ভাইএ বিবাধ করবে আমার চোখের সামনে, আর এক পক্ষকে আমি সমর্থন করব! তা হয় না। কেমন করে সবাই ভুলতে পার যে তোমরা একই পিতার সন্তান! মাতা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মাতামহ তো একজনই।

দৈত্যরা কোন উত্তর দিতে পারে নি, ভৃগুর এই ভৎর্সনা তারা মাথা পেতে নিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, এই জগৎ যখন পাপে পঙ্কিল হয়ে গিয়েছিল, তখনই এসেছিল প্রলয়। বন্যার জলে ডুবে গিয়েছিল ত্রিভুবন। নৌকায় আশ্রয় নিয়ে এই সৃষ্টি রক্ষা করেছিলেন দক্ষিণের রাজা সত্যব্রত। প্রচেতারা তপস্যা করছিলেন জলে নিমগ্ন হয়ে, অরণ্যে আবৃত হয়ে গিয়েছিল স্বর্গ ও পৃথিবী। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টি করলেন, দক্ষকে বললেন প্রজা সৃষ্টি করতে। মরীচির পুত্র কশ্যপের হাতে দক্ষ তাঁর কন্যাদের দিয়ে বলেছিলেন, প্রজা সৃষ্টির ভার তুমি নাও। এর ফল কি এই হল? ভাইএ ভাইএ বিবাদ করে সৃষ্টি নষ্ট করবে তোমরা? প্রলয়ের জলেও কি জগৎ পাপ মুক্ত হল না? উত্তর দাও, মৌন আছ কেন সকলে?

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল দৈত্যরা। তার পর একজন বলেছিল, আমরা কথা দিয়েছি গুরুদেবকে, জীবন বিপন্ন হলেও আমরা শান্তি ভঙ্গ করব

না। অস্ত্রত্যাগ করে বল্কল পরেছি। আক্রান্ত হয়ে পালিয়ে এসেছি এখানে, আশ্রয়ের জন্যে এসেছি। প্রাণ সংশয়েও আমরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে অস্ত্রধারণ করি নি। গুরুদেব ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তপস্বীর জীবন যাপন করব।

তাই কর, কিন্তু এখানে নয়। স্বস্থানে ফিরে গিয়ে যা ইচ্ছে তাই কর তোমরা। বলে দৈত্যদের বিদায় দিয়েছিলেন মহর্ষি ভৃগু।

দৈত্যরা তাই ফিরে এসেছিল তাদের পিতার আশ্রমে। গুরুদেবের ফেরার অপেক্ষা করছিল। এই সময়ে এক দিন তারা দেখল যে তিনি আসছেন ধীর পদক্ষেপে। কিছু স্থূল কিছু স্ফীত দেহ, কিন্তু শান্ত ও প্রসন্ন নয় পূর্বের মতো। ইনিই কি তাদের গুরুদেব না অন্য কেউ আসছেন এই দিকে। একজন অপরকে বলল, এগিয়ে গিয়ে দেখ তো ভাল করে।

একজন নয়, তারা কয়েকজন এক সঙ্গে এগিয়ে গেল এবং নিজেরা কোন প্রশ্ন না করে আগন্তুককেই কথা বলার অধিকার দিল। তিনি বললেন, কী আশ্চর্য! তোমরা চিনতে পারছ না আমায়!

তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

আগন্তুক বললেন, এই কয়েক বছরে এমন বিস্মৃতি হয়েছে তোমাদের? হায় আমার দুর্ভাগ্য! যাদের জন্যে আমি তপস্যা করতে গেলাম, তারাই আমাকে ভুলে গেছে!

একজন তৎপর ভাবে বলল, না গুরুদেব, আপনাকে ভুলে যাবো এমন অকৃতজ্ঞ আমরা নই।

বলে প্রণাম করল তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দৈত্যরাও তাঁকে প্রণাম করল ভূমি স্পর্শ করে। কিন্তু একজন বলল, এ কী চেহারা হয়েছে আপনার?

গুরু সহাস্যে বললেন, কিছু স্ফীত দেখছ আমাকে? হ্যাঁ, তা দেখবারই কথা। তপস্যায় প্রীত হয়ে মহাদেব আমাকে যে মন্ত্র দিয়েছেন তার গুণই এই রকম। তপস্যায় যে দেহ শীর্ণ হয়েছিল, তা দুদিনেই এই রকম হয়েছে।

দেহের বর্ণ—

বলে একজন থেমে যেতেই গুরুদেব বললেন, কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ বর্ণ তো হবেই। পঞ্চাগ্নির প্রভাবে এই রকম হয়েছে। আশ্রমের স্নিগ্ধ পরিবেশে কিছু কাল কাটালেই আমার বর্ণ আবার ফিরে পাব। তা তোমরা কেমন ছিলে?

যে তাঁকে প্রথম প্রণাম করেছিল সে বলল, আপনার অবর্তমানে আমরা অনেক কষ্ট পেয়েছি, প্রভু! দেবতারা আমাদের সঙ্গে সন্ধি করেও সন্ধির শর্ত

ভঙ্গ করেছে।

দুরাত্মারা তোমাদের কোনো অনিষ্ট করে নি তো?

বলে গুরুদেব সবার মুখের দিকে তাকালেন।

সেই চেষ্টাই করছিল, কিন্তু সফল হয় নি।

গুরুদেব ব্যগ্র ভাবে প্রশ্ন করলেন, কী করেছিলে তোমরা?

আমরা অস্ত্র ত্যাগ করেছি বলে পিতামহ প্রহ্লাদকে পাঠিয়ে সন্ধি করেছিলাম, সেই সন্ধির শর্ত আমরা ভঙ্গ করি নি। পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম আপনার মায়ের আশ্রমে। ভেবেছিলাম যে দুর্বৃত্ত দেবতারা সেখানে গিয়ে আমাদের আক্রমণ করবে না। কিন্তু কী বলব আপনাকে, তারা স্ত্রীলোকের সম্মানও রাখে নি, বিষ্ণুকে এনেছিল মাকে বধ করবার জন্যে। আর—

আর কী?

তাদের গুরু বৃহস্পতিই বিষ্ণুকে উত্তেজিত করেছিল স্ত্রীবধে! যাদের গুরু এই রকম, তাদের চরিত্র যে এমন হীন হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

তোমরা সত্যি বলছ?

আমরা শপথ করে এই কথা বলতে পারি। আপনিই তো আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে সবার উপরে হল ধর্ম, আর সেই ধর্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যা দিয়ে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু কোন মহৎ কাজ হয় না। গুরুদেব, আমরা আপনার শিক্ষা মাথায় করে রেখেছি। প্রাণ দেব, কিন্তু সত্য ভঙ্গ করব না, ধর্মচ্যুত হব না।

গুরু নীবর হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, কিছু ভাবলেন গম্ভীর হয়ে, তারপরে বললেন, এবারে আমি মহাদেবের কাছে নতুন শিক্ষা লাভ করে এসেছি, পেয়েছি নতুন মন্ত্র। এবারে আমি তোমাদের সেই শিক্ষা দেব। দেবতাদের কাছে আর তোমাদের পরাজিত হতে হবে না, আর তোমাদের বল্কল পরে তপস্বীর মতো কৃচ্ছ্রসাধনও করতে হবে না। তোমরাও দেবতাদের মতো ভোগ করতে পারবে, সুখের মুখ দেখবে। ভোগেই তো সুখ।

দৈত্যরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল দেখে গুরুদেব বললেন, আজ নয়, কাল থেকে আমি তোমাদের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করব। পথ শ্রমে আজ আমি কিছু ক্লান্ত আছি। এখন বিশ্রাম করব।

দৈত্যরা তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিল। ফলমূল এনে রাখল আহারের

জন্য। তারপর এক নির্জন স্থানে এল একজন বয়োবৃদ্ধের ডাকে। সে বলল, ভাই সব, তোমরা আমাকে যাই বল, আমার মনে একটা খট্‌কা লেগেছে।

কী খট্‌কা?

এত দিন গুরুদেব আমাদের বুঝিয়েছেন, নিজে ভোগ করে সুখ নেই, সুখ ত্যাগের দ্বারা ভোগ করে। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করবে অপরের জন্যে, সবার জন্যে। তাতেই পরম সুখ।

একজন বলল, ঠিক কথা।

আর একজন বলল, এই জন্যেই তো নতুন শিক্ষা দিচ্ছেন গুরুদেব।

দানবরাজ বৃষপর্বা শয্যায় শুয়ে ভাবছিলেন যে এই রকমই হয়, এক জনের সুচিন্তিত মত সম্মিলিত কণ্ঠের জোরে চাপা পড়ে যায়। গণমতে চিন্তার অবকাশ কম, তাই একজনের চিন্তা বিকশিত হয়ে উঠবার সুযোগ সব সময় পায় না। আসলে স্বাধীন চিন্তাই প্রগতির মূলে, তার পূর্ণ সুযোগ না থাকলে সমাজ এগোতে পারে না। মানুষকে তার স্বাধীন চিন্তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে প্রাণবন্ত সমাজও মৃতের মতো শীতল হয়ে যাবে। তাই মানুষকে স্বাধীন ভাবে ভাবতে ও বলতে দিতে হবে। এই অধিকারে বিধি নিষেধ আরোপ করলে চলবে না।

সেদিন যে দৈত্যটি তার সন্দেহ প্রকাশ করতে চেয়েছিল, তাকে থামিয়ে না দিলে দৈত্যরা অভিশপ্ত হত না। সে নাকি ক্ষুব্ধ হয়ে সবাইকে বর্জন করেছিল, পর দিন নূতন শিক্ষা নিতে গুরুর নিকটে আসে নি। গুরু বলেছিলেন, অসৎ থেকেই সৎ উৎপন্ন হয়েছে, অর্থাৎ চৈতন্য এসেছে জড় পদার্থ থেকে। আবার জড় পদার্থের উৎপত্তি ভূত চতুষ্টয় থেকে। সোজা কথায়, জড় স্বভাব ভূত চতুষ্টয় থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি।

শিষ্যদের মুখের দিকে চেয়ে গুরুর মনে হয়েছিল যে তারা এই তত্ত্ব বোধহয় বুঝতে পারে নি। তাই বললেন, ভূত চতুষ্টয় তোমরা জানো—ক্ষিতি অপ্‌ তেজ ও মরুৎ এই হল ভূত চতুষ্টয়। এই চার ভূতের সমন্বয়ে যে দেহ, তাই চরম সত্য। আমরা যে এত দিন দেহের অতিরিক্ত আত্মার কথা তোমাদের বলেছি, তা অলীক। এর কোন অস্তিত্ব নেই। গুড় তণ্ডুল প্রভৃতি মদ্যের উপাদানগুলি সুরায় মিশ্রিত হলে যেমন তা মাদকে পরিণত হয়, তেমনি ক্ষিতি অপ্‌ তেজ ও মরুৎ এই চার ভূত দেহের আকার নিলেই তা চৈতন্য লাভ করে। এর একটির অভাবেই দেহ নাশ হয় এবং তারই নাম অপবর্গ বা মোক্ষ।

দৈত্যরা নিঃশব্দে এ কথা মেনে নিল। এ তো যুক্তির কথা। আর গুরুদেব যখন বলছেন, তখন এর পর আর তর্ক চলে না। গুরুদেব বললেন, তবেই দেখ, আত্মার অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করেছি। তাই কর্মফল জন্মান্তর পরলোক —এ সব থাকতে পারে না। আত্মাই যদি না থাকে তো জন্মান্তর কিসের, আর পরলোকই বা থাকবে কী করে? আর পরলোক বা জন্মান্তর না থাকলে কর্মফল ভোগ করবে কোথায়?

কিন্তু এত দিন যে আমরা—

আমরাই তো এ কথা তোমাদের বুঝিয়েছি। কেন বুঝিয়েছি?

দৈত্যরা নীরবে রইল।

গুরুদেব বললেন, পূর্ব পুরুষেরা আমাদের এই কথাই বুঝিয়েছিলেন। আমরা যা শিখেছিলাম, তাই বুঝিয়েছি তোমাদের। এইবারে তপস্যা করে মহাদেবের বরে জানলাম যে যা শিখেছিলাম তা ভুল, যা শিখিয়েছিলাম তা ভুল। ভুল বুঝে ভুল শিখে তোমাদেরও আমরা ভুল শিখিয়েছি। এক কথায় বঞ্চনা করেছি তোমাদের। মনে হয় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে এই সব প্রচার করেছিলেন, জন সমাজকে অন্ধ করে রেখেছিলেন, মিথ্যার জাল রচনা করে। আত্মার কথা তোমরা ভুলে যাও, এই শব্দটা মুছে ফেল মন থেকে। পরকালে বা পরলোকে সুখের আশায় ইহকালের ও ইহলোকের সুখ হেলায় হারিয়ো না। ভোগের দ্রব্য আকণ্ঠ ভোগ করে নাও। এই সংসারে সুখ দুঃখ মিশ্রিত বলে যারা এই সুখ ভোগে বিরত থাকে, তারা পশুর মতো মূর্খ।

দৈত্যদের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। আজ তাদের গুরুদেব এই সব কী বলছেন! তপস্যা করে ফিরে কি তিনি তাদের চিরদিনের ধারণা পালটে দেবেন! কিন্তু গুরুদেব তাদের মুখের দিকে চেয়ে এই কথাটি বোঝাবার জন্যে বললেন, মাছে আঁশ ও কাঁটা আছে বলে কি তোমরা মাছ খাবে না? না, মাছ খাওয়া ছেড়ে দেবে? ধানেও তো তুষ আছে, কুটো-কাটি আছে। তা বলে কি অন্নাহারও ত্যাগ করবে?

দৈত্যরা বলল, না, তা কেন করব।

তবেই বল, সুখের মধ্যেও দুঃখ আছে বলে সুখ ভোগ ত্যাগ করবে কেন? কোন্ যুক্তিতে? আমরা যে আত্মার কথা বলি, এ সবই আমাদের লৌকিক কল্পনা! চৈতন্য লাভ করে আমরা যখন বলি, দেহ আত্মা নয়, আত্মা

দেহাতীত, আমি আত্মা নই, আত্মা অন্য কিছু, এ একেবারে মিথ্যা কথা। দেহ নাশ হলেই সবই শেষ হয়ে যায়। পুনর্জন্ম থাকলে তো কর্মফল ভোগ করবে, পরলোক থাকলে তো সুখ ভোগ করবে। এ সব যখন নেই, তখন তোমরা কোন্ ভোগের আশায় এই জন্মে কৃচ্ছ্র সাধন করবে!

একজন বলল, ঠিক কথা।

আর একজন তাকে সমর্থন করে বলল, তাই তো মনে হচ্ছে।

গুরুদেব বললেন, তাই বলছিলাম, এক দিন তোমাদের আমি ভুল শিখিয়েছি। এইবারে কঠোর তপস্যায় আমি সত্য জেনে এসেছি। তাই বলছি, যত পার সুখ ভোগ কর, এই জন্মেই সমস্ত সুখের আশা মিটিয়ে নাও। যত দিন বাঁচবে, সুখ ভোগের চেষ্টা করেই বাঁচবে, ঋণ করেও ঘৃত পান করবে। এই দেহ একবার ভস্মীভূত হলে পুনরাগমনের সম্ভাবনা আর নেই।

এর পর গুরুদেব বললেন আজ এই পর্যন্তই থাক, কাল, আমি আবার তোমাদের ভাল করে বোঝাব।

বলে তিনি বিশ্রাম করতে গেলেন।

এর পর দৈত্যরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। বলল, সত্যিই তো, মরবার পর আমরা কর্মফল ভোগ করব, এর মধ্যে যুক্তি কোথায়? আমরাই যদি না রইলাম, তবে সুখ ভোগ করবে কে?

বিজ্ঞ জনেরা বলল, সব কথারই প্রমাণ যখন আছে, তখন আমরা এ কথারও প্রমাণ চাই।

অনেরা বলল, এ খুব যুক্তিযুক্ত কথা। কাল আমরা গুরুদেবের কাছে প্রমাণ চাইব। প্রমাণ না পেলে আমরা এ কথা মানব না।

তাই পর দিন তারা গুরুদেবের নিকটে এসে এই কথা বলল! গুরুদেব সহাস্যে বললেন, তোমরা সত্যিই বুদ্ধিমান। প্রমাণ না পেলে কোন কথা তোমরা মানবে না। আর এই প্রমাণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হওয়া চাই, অনুমান প্রমাণ হলে চলবে না। লোকে বলল যে পুনর্জন্ম আছে, সৃষ্টিকর্তাও বারে বারে জন্ম নেন, তাহলে তোমরা কি সেই কথা মেনে নেবে? নিশ্চয়ই না। বলবে, কারও পুনর্জন্ম হয়েছে তা আমাদের দেখাও, তার পূর্ব জন্মের কথা সে আমাদের কাছে প্রমাণ করুক, তবেই আমরা মানব। পরলোক দেখে তো কেউ ফিরে আসে নি! আত্মা কেউ দেখেছে? দেহ নাশ হবার পর আত্মা দেহ থেকে কী ভাবে বেরোয়? সেই আত্মার রূপ কী? আত্মা সত্যিই থাকলে কেন

আমরা আত্মা দেখতে পাই নে ? আমরা কী প্রত্যক্ষ করেছি যে এই সব আজগুবি কথা আমাদের মানতে হবে !

দৈত্যরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ভাবল, গুরুদেব তাদের ঠিক কথাই বলছেন। এই তো সত্য। এরই তো প্রমাণ চায় তারা। গুরুদেব তাদের মুখের দিকে চেয়ে খুশী হলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে শিষ্যরা তাঁকে সমর্থন করছে মনে মনে। আরও কিছু দিন পর তারা মুখেও সমর্থন করবে। তাই বললেন, এইবারে তোমাদের যুক্তির কথা কিছু বলছি।

দৈত্যরা মাথা নেড়ে বলল, বলুন।

গুরুদেব বললেন, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে আমরা পশু বলি দিই, দিই তো ?

হ্যাঁ।

কেন দিই ? কী ভাবি আমরা ? কী বলি ?

এ কথার উত্তর তারা দিতে পারল না, তাই নিরুত্তরে রইল।

গুরুদেব বললেন, বলি, ঐ যজ্ঞে নিহত পশুর মোক্ষ লাভ হবে। ঠিক তো ?

সবাই মাথা নেড়ে বলল, ঠিক।

তাহলেই বল, ঐ যজ্ঞে আমরা আমাদের বুড়ো বাপ মাকে বলি দিই না কেন ? খুব সহজেই তো তাদের মোক্ষলাভ হতে পারত !

দৈত্যরা বলে উঠল, খুব ঠিক কথা।

গুরুদেব বললেন, ঠিক কথা তো ! আরও বলি শোন। শ্রাদ্ধে আমরা পিণ্ডদান করি কেন ? তাতে প্রেতের পরিতৃপ্তি হবে। প্রেত হল মৃত ব্যক্তি, যে মারা গেছে এবং যার নামে শ্রাদ্ধ হচ্ছে। তোমরা কি কেউ দেখেছ যে সেই মৃত ব্যক্তি পিণ্ড ভক্ষণ করেছে ? এক দিন গৃহের বাইরে অন্ন রেখে এসে ঘরের ভেতর তোমার পিতা মাতাকে সেই অন্ন খেতে বল। তাঁরা কি ঘরের ভেতরে থেকে বাইরের অন্ন খেতে পারবেন ?

কখনই না।

তবেই বল, মৃত ব্যক্তি পিণ্ড খাবে কেমন করে ?

দৈত্যরা বলল, সত্যিই তো।

আর একজন প্রশ্ন করল, তবে এই সব নিয়মের প্রচলন হয়েছে কেন ?

গুরুদেব বললেন, খুবই যুক্তি যুক্ত কথা। এ সমস্তই ধূর্তের চাতুরি। এক শ্রেণীর লোক জীবিকার উপায় করবার জন্যই যে এই সব কথা প্রচার করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই !

এ সব তো আমরাও এত দিন মেনে আসছি !

সত্য কথা জানতাম না বলেই এত দিন মেনেছি। আর মানব না। তোমাদেরও মানতে বলব না।

গুরুদেব এই ভাবেই দিনের পর দিন বোঝাতে লাগলেন যে এত দিন তিনি ভুল কথা বলেছিলেন শিষ্যদের, ভুল শিখিয়েছিলেন। তার জন্য তিনি দুঃখিত, অনুতপ্ত। তাঁরই শিক্ষায় অসুররা এত দিন কিছুই ভোগ করে নি, তাদের জীবন অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

তারপর তিনি এক দিন দেবরাজ ইন্দ্রের কথা বললেন। ইন্দ্র এই রকমই চাইত। অসুররা কিছু ভোগ করতে না চাইলে তারা নিজেরাই জগতের সব কিছু ভোগ করতে পারবে। বললেন, দেখছ না তাদের ? সমুদ্র মন্থনের সময়ে যা কিছু ভোগের সামগ্রী উঠেছিল, তা সবই নিয়েছে তারা। তোমরা কী পেয়েছ ? তোমাদের ভাগে একজন অপ্সরাও পড়ে নি। ইন্দ্র এই অপ্সরাদের সকলকেই নিজের সভায় স্থান দিয়েছেন। প্রতি দিন নৃত্য গীত হচ্ছে সভায়, সুরাপান করছে মনের আনন্দে। আর তোমরা আমার শিক্ষায় এই আশ্রমে তপস্বীর মতো কঠিন জীবন যাপন করছ !

দৈত্যরা বলল, ঠিক কথা। জগতে যখন এত ভোগের সামগ্রী, তখন আমরা তপস্বীর জীবন যাপন করব কেন ? তাহলে এখন আমরা কী করব, গুরুদেব ?

গুরুদেব বললেন, দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি। আর কিছু দিন তোমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর।

তারপরেই বললেন, কিন্তু আমার একটা ভয় হচ্ছে।

দৈত্যরা সবিস্ময়ে বলল, আপনার ভয় হচ্ছে !

ভয় মানে আশঙ্কা।

কী আশঙ্কা গুরুদেব ?

ইন্দ্র নিশ্চয়ই কোন ছিদ্রান্বেষণ করছে, তোমাদের বিপথে চালনার কোন ষড়যন্ত্র।

তা কী করে সম্ভব ?

সম্ভব নয় ! মনে কর, আমারই ছদ্মবেশে কেউ এসে যদি তোমাদের ভুল পথে চালনার চেষ্টা করে, বলে আমিই শুক্রাচার্য, আমিই তোমাদের গুরু এত দিন যা শিখিয়েছি, ঠিকই শিখিয়েছি।

ঠিক এই সময়ে বনান্তরালে দেখা গেল এক উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি পুরুষকে। দীর্ঘ ঋজু দেহ সবল সুঠাম, কোলে একটি শিশুকন্যা। আশ্চর্য তাঁর রূপ। অথচ তাঁকে চেনা মনে হচ্ছে। দৈত্যরা এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

দানবরাজ বৃষপর্বা নিদ্রাহীন চোখে ভাবছিলেন এই সব পুরনো কথা। কত সরল কত নির্বোধ এই দৈত্যরা, শিশুর মতো বিশ্বাস করে সবাইকে। তাই তাদের ছলনা করতে পারে যে কোন ধূর্ত ব্যক্তি।

দৈত্যদের দু-একজন আগন্তুকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে গুরুদের বলে উঠলেন, কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?

তারা বলল. কেমন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে ওঁকে।

অস্পষ্ট স্বরে গুরুদেব বলে উঠলেন, সাবধান, এ নিশ্চয়ই ইন্দ্রের কাজ. কাউকে ছলনা করতে পাঠিয়েছে। তোমরা ওর কথায় ভুলো না যেন !

দৈত্যরা বলল, না গুরুদেব, ছলনায় আর আমরা ভুলব না। বারে-বারে বঞ্চিত হয়ে আমরা এখন সাবধান হতে শিখেছি।

যারা এগিয়ে গিয়েছিল, তারা বলল, কে তুমি ছলনা করতে এসেছ আমাদের ?

পরম বিস্ময়ে আগন্তুক তাকালেন সেই দৈত্যদের দিকে। ধীর শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, চিনতে পারছ না আমাকে ?

না।

ভার্গব শুক্রাচার্যকে তোমরা চিনতে পারছ না ?

দৈত্যরা হেসে উঠল অট্টহাসি, বলল, পারবে না আমাদের ছলনা করতে। আমরা জানি, তুমি ইন্দ্রের কাছ থেকে এসেছ ছলনা করে আমাদের সর্বনাশ করতে।

কে তোমাদের এই কথা বলেছে ?

আমাদের গুরুদেব।

আগন্তুক আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমার অবর্তমানে তোমরা কি আর কাউকে গুরুর পদে বরণ করেছ ?

আর কাউকে আমরা বরণ করব কেন ! আমাদের গুরুদেবই তো ফিরে এসেছেন। তিনি নতুন মন্ত্র এনেছেন কৈলাস থেকে।

মিথ্যা কথা। কোন খল ব্যক্তি তোমাদের বঞ্চনা করেছে।

তুমিই বঞ্চক, তুমিই আমাদের বঞ্চনা করতে এসেছ। কিন্তু তা পারবে না। গুরুদেব তোমার কথা আমাদের আগেই বলেছেন, আগেই আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন।

আরও কয়েকজন দৈত্য এগিয়ে এসেছিল। তারা বলল, ফিরে যাও এখনই। তা না হলে সমূহ বিপদ হবে তোমার। তোমার দুরভিসন্ধি কি আমরা জানি না ভেবেছ?

আগন্তুক বললেন, তোমাদের গুরুদেবের দর্শন কি একবার পেতে পারি? ফিরে যাবার আগে সেই মহাপুরুষকে একবার দেখতে পাব না?

দৈত্যারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বলল, এসো, এইখান থেকেই দেখে যাও। তুমি তাঁর কাছে যেতে পারবে না।

আগন্তুক দূর থেকেই তাঁকে দেখে বললেন, আরে, এ যে দেবগুরু বৃহস্পতি! আমার মতো বেশভূষা করে এসেছে! কী আশ্চর্য! এঁকে তোমরা গুরু বলে ভাবলে কী করে!

দৈত্যদের একজন বলল, এ ভারি মজার কথা বলছে তো! নিজে এসেছে আমাদের গুরুদেব সেজে, আর আমাদের গুরুকে বলছে বৃহস্পতি!

আর একজন বলল, দাঁড়াও, আমাদের গুরুদেব কী বলতে চাইছেন জেনে আসি।

বলে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল দ্রুত বেগে। তাকে কাছে আসতে দেখেই গুরুদেব বললেন, কী বলছে লোকটা? আমাকে দেবগুরু বৃহস্পতি বলছে না তো?

হ্যাঁ, গুরুদেব। কিন্তু আমরা তাঁর কথা বিশ্বাস করি নি।

বিশ্বাস কোরো না। ইন্দ্রকে পরাজিত করে আমি তোমাদের ত্রিভুবনের রাজা করব জেনেই ইন্দ্র একজন বঞ্চনাকারীকে পাঠিয়েছে। দূর করে দাও তাকে। আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের, অবিলম্বে আমি তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করব।

যে আজ্ঞা, গুরুদেব।

বলে দৈত্যরা 'মার' 'মার' করে আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গেল।

আর গুরুদেব একজনকে ডেকে বললেন, ওর কোলে একটি শিশু দেখছি না? তোমাদের গুরুদেবের কোলে কি কখনও শিশু দেখেছ?

ঠিকই তো।

বলে সে চেঁচিয়ে উঠল. লজ্জা নেই তোমার। কোলে শিশু নিয়ে আমাদের গুরুদেব সেজেছ ?

আগন্তুক বললেন, কে কি সেজেছে পরে বুঝতে পারবে। কিন্তু তখন দেরি হয়ে যাবে তোমাদের। আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে তোমরা নিজেদের সর্বনাশই ডেকে আনছ।

দৈত্যরা বলল, যাও যাও, তোমার চালাকি বুঝতে আমাদের আর বাকি নেই। গুরুদেবের কৃপায় আমরা আগে থেকেই সতর্ক ছিলাম।

আগন্তুক বললেন, বেশ, আমি যাচ্ছি। তোমাদের মতো মূর্খ অবিবেচক শিষ্য থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। বিপদে পড়লে আমার কাছে তোমরা আর এসো না, ঐ বৃহস্পতির কাছেই যেও।

একজন টিটকিরি দিয়ে বলল, ঐ বাচ্চাটা কোথা থেকে কুড়িয়ে এনেছ ? ওর মাকেও আনলে না কেন ? গুরুপত্নী বলে আমরা খুব মান্য করতাম তাঁকে।

বলে একটা অসভ্য ইঙ্গিত করল। আগন্তুক তা দেখতে পেয়ে বললেন, ছি ছি, এরই মধ্যে তোমরা এত নিচে নেমে গেছ ! গুরুকে চিনতে না পারো, সাধারণ শালীনতা বোধও কি হারিয়ে ফেলেছ ! তোমাদের এই আচরণে আমি সর্বনাশের লক্ষণ দেখছি। জানি না, কে তোমাদের রক্ষা করবে বিপদে !

বলে তিনি ফিরে গেলেন। দৈত্যরা দাঁড়িয়ে দেখল, বড় বড় গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেল আগন্তুকের দীর্ঘ ঋজু দেহ। এক ঝলক বাতাস মরমরিয়ে উঠল দীর্ঘশ্বাসের মতো।

তোমরা কী করছ ওখানে দাঁড়িয়ে ?

গুরুদেবের ডাক শুনে দৈত্যরা তৎপর হয়ে ফিরে এলো। গুরুদেব বললেন, লোকটা চলে গেছে তো ?

একজন বলল, হাঁ, গেছে।

গুরুদেব বললেন, খুব বেঁচে গেছ তোমরা। আমি উপস্থিত না থাকলে তোমাদের আজ কী দশা হত একবার ভেবে দেখ। ও বোধহয় জানত না যে আমি তপস্যা শেষ করে ফিরে এসেছি। তাই আমাকে দেখতে পেয়েই আত্মরক্ষার জন্যে পালিয়ে গেল।

কিন্তু কী বলছিল জানেন গুরুদেব ?

কী ?

বলছিল, আপনিই দেবগুরু বৃহস্পতি, আমাদের গুরুর ছদ্মবেশ ধরে এসেছেন।

গুরুদেব হেসে উঠলেন এই কথা শুনে, বললেন, তাই বলছিল বুঝি ! খুব শেয়ানা লোক। তা তোমাদের শাপ দেয় নি তো কোন ?

একজন বলল, না, কোন শাপ দেয় নি।

আর একজন বলে উঠল, দেয় নি মানে ! ও তো পরিষ্কারই বলে গেল, আমাদের সর্বনাশের আর দেরি নেই। এই কথাই তো শাপ !

গুরুদেব বললেন, আমি তোমাদের বর দিচ্ছি, তোমরা নির্ভয়ে বাস কর। যতদিন আমি এখানে আছি, ইন্দ্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

দৈত্যরা বলল, জানেন গুরুদেব, আপনার অবর্তমানে আমরা অনেক কষ্ট পেয়েছি। আপনি আমাদের ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না।

গুরু কিছু চিন্তিত ভাবে বললেন, কিন্তু দিন কয়েকের জন্য আমাকে যে একবার বাইরে যেতে হবে।

কোথায় গুরুদেব ?

একবার আমার পিতা-মাতাকে দেখে আসতে চাই।

দৈত্যরা বলল, বেশ তো, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।

না না, তার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজনের কথা নয় গুরুদেব, আমরা আপনার সঙ্গে থাকলে পথের কষ্ট আপনার লাঘব হবে। আর আমরাও সেই পুণ্যাত্মাদের দর্শন পেয়ে ধন্য হব।

গুরুদেব বললেন, বেশ, তবে অবিলম্বে আমরা একটা যাত্রার দিন স্থির করব গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে। যথা সময়ে তোমাদের আমি বলব।

বলে দৈত্যদের বিদায় দিয়ে তিনি বিশ্রাম করতে গেলেন।

পরদিন প্রভাতে দৈত্যরা এসে দেখল, তাদের গুরুদেব নেই। কুটিরের ভিতর ও বাহিরে সর্বত্র খুঁজেও তাঁর কোন সন্ধান তারা পেল না। তাঁর দণ্ড কমণ্ডলুও নেই। রাতের অন্ধকারে তিনি আশ্রম ত্যাগ করে গেছেন। দৈত্যরা পরস্পরের মুখের দিকে যেন একই প্রশ্ন করল, এ কি হল ? কেন এমন হল ? তাঁর সঙ্গে যেতে চেয়ে কি অপরাধ করেছি আমরা ?

আশ্রমে মন্ত্রণা সভা বসল দৈত্যদের। যে বয়োজ্যেষ্ঠ, সে-ই বসল সভাপতি হয়ে। যে তাদের দল ছেড়ে গিয়েছিল, সেই দলছুটও এসে উপস্থিত হল। সবার মুখেই এক প্রশ্ন, কেন এমন হল?

কিন্তু সবার আগে নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করল দল-ছুট দৈত্য। সে বলল, প্রথমেই আমাদের বিচার করে দেখতে হবে, তিনি আমাদের গুরুদেব ছিলেন কি না!

আর একজন চিৎকার করে বলে উঠল, এ প্রশ্ন অবান্তর।

কেন?

তিনি যে আমাদের গুরুদেব ছিলেন, তার কোন প্রমাণের দরকার নেই।

একজন বয়োবৃদ্ধ বললেন, তিনি আমাদের শিখিয়েছেন যে অনুমান প্রমাণ কোন প্রমাণ নয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণই প্রমাণ। আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলে অনুমান প্রমাণ আমরা মানব না।

আর একজন বলল, ঠিক বলেছ। তিনি যে আমাদের গুরুদেব ছিলেন, তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে কিনা, সেটাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে সবার আগে।

একজন আশ্চর্য হয়ে বলল, গুরুদের গুরুদেব ছিলেন কিনা, এ কথারও প্রমাণ চাই! তাহলে তো তোমরা বলতে পারো, আমি আমি কিনা তারও প্রমাণ তোমরা চাও।

কেউ বলল, খুব ঠিক কথা।

আবার কেউ বলল, আমরা সবাই তোমাকে চিনি। তাই আর কোন প্রমাণের দরকার নেই।

গুরুদেবকেও আমরা সবাই চিনি।

সভাপতি বাধা দিয়ে বলল, এটাই আমাদের মূল প্রশ্ন। আমরা সবাই কি এ বিষয়ে একমত? কারও মনে কি কোন সন্দেহ নেই? কেউ কি মনে করে যে তিনি আমাদের গুরুদেব নন? কেন তা মনে করে?

দল-ছুট সবার আগে হাত তুলে বলল, আমার মত ভিন্ন। আমি শপথ করে বলতে পারি, । তিনি আমাদের গুরুদেব ছিলেন না।

সভাপতি বলল, শপথ নয়, কোন প্রমাণ থাকে তো বল।

প্রমাণও আছে। আমি যখন খুব ছোট তখন আমার মা মারা গিয়েছিল, তারপর বাবা নিহত হয়েছিল যুদ্ধে। কিন্তু তাদের অভাব আমি কোন দিন

অনুভব করি নি। কাছে গেলেই গুরুদেব আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, প্রিয় নাম ধরে ডাকেন আমাকে। কিন্তু এবারে আমি যখন তাঁর কাছে ছুটে, গেলাম তিনি আমাকে চিনতেই পারলেন না।

বলেই সে কেঁদে ফেলল। আর অন্য সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল তার কথা শুনে। কারও মুখে এ কথার কোন উত্তর জোগাল না।

অনেক কষ্টে কান্না সামলে দল-ছুট বলল, তপস্যা করে মানুষ কি অমানুষ হয়, না অতিমানুষ হয়! গুরুদেব বলতেন, একজনকে ভালবাসো, ভালবাসো গভীর ভাবে। তোমার সেই ভালবাসা ছড়িয়ে যাবে সমস্ত জগতে, তুমি সবাইকে ভালবাসতে শিখবে। যদি তোমার ভালবাসার পাত্র কোন দিন হারিয়ে যায় তবে জগতের সবাই তোমার ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠবে। তপস্যায় তো আমরা এই সাধনা করি, সবাইকে ভালবাসার সাধনা। তপস্যা করে কি আমাদের গুরুদেব অমানুষ হয়ে ফিরেছেন? কোথায় হারিয়ে গেল তাঁর সেই ভালবাসা?

অনেকেই মাথা চুলকে বলল, সত্যিই তো, গুরুদেব আমাকেও খুব ভালবাসতেন!

আমাকেও, আমাকেও।

বলে উঠল আরও অনেকে।

এই কদিন যাঁকে আমরা গুরুদেব বলে মানলাম, তাঁর মধ্যে তো সেই ভালবাসা আর ভালবাসার গভীরতা দেখলাম না!

কিন্তু তাঁর কোলে যে একটি শিশু দেখেছি আমরা?

বোধহয় কোন পরিত্যক্ত শিশুকে কুড়িয়ে পেয়েছেন। কোন অসহায় শিশুকে তো তিনি ফেলে আসতে পারবেন না!

সভাপতি বলল, হ্যাঁ। আমাদের রাজা বিরোচন যখন প্রাণ দিলেন ইন্দ্রের বঞ্চনায়, তখন বলিও শিশু। সেই শিশুকেও তিনি পিতার স্নেহ দিয়ে বড় করেছিলেন, নিজের একটি চোখ দিয়েছেন তাঁকে রক্ষার জন্যে। কোন শিশুকে কুড়িয়ে পেলে তিনি নিশ্চয়ই তাকে বুকে তুলে নেবেন।

সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, ঠিক তাই।

তবে তিনি কোথায় যেতে পারেন?

কোথায়!

আমাদের তো রাজা নেই যে রাজার কাছে যাবেন।

সভাপতি বলল, রাজা বলির পর গুরুদেব আমাদের কাউকে রাজা করতে রাজী হন নি। রাজ্যহীন রাজা সমাজের শত্রু, রাজত্ব লাভের জন্য সে যে কোন কুকর্ম করতে পারে। তাতে সমাজের শান্তি নষ্ট হবে, যুদ্ধ আসন্ন হবে। সমস্ত লোভের মধ্যে রাজত্বের লোভই সবচেয়ে অকল্যাণের। কাজেই আমাদের রাজ্যহীন রাজা হওয়ায় তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল।

তবে কি তিনি পাতালে বলি রাজার কাছেই গেছেন ?

মনে হয় না। তিনি আমাদের পরিত্যাগ করে পাতালে গিয়ে শান্তি পাবেন না।

তবে ?

সভাপতি বলল, বলি রাজার জননী সুরুচি দানব রাজা বৃষপর্বার জ্যেষ্ঠা কন্যা। বৃষপর্বা তাঁকে গুরুদেব বলে বিশেষ সম্মান করেন। তপস্যা করতে যাবার পূর্বে তিনি আমাদের তাঁর আশ্রয়েই রেখে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে-ছিলেন। কিন্তু বৃষপর্বা রাজী হন নি বলে তা সম্ভব হয় নি।

কেন রাজী হন নি ?

ইন্দ্রের সঙ্গে কোন বিরোধ তিনি চান নি। সেই কথা প্রকাশ করায় গুরুদেব পিছিয়ে এসেছিলেন। তাই আমার মনে হয় যে তিনি তাঁরই কাছে গিয়ে থাকবেন।

সবাই স্বীকার করল, তাই সম্ভব। কিন্তু আমাদের এখন কী কর্তব্য ?

একজন প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে যেতেই সভাপতি বলল, নির্ভয়ে বল।

সে বলল, কিন্তু গুরুদেব তো নিজেই বললেন যে এবারের তপস্যায় তিনি নূতন মন্ত্র পেয়েছেন। তাঁর পুরাতন ধ্যান ধারণা যে ভুল, তা তিনি জানতে পেরেছেন এবারের তপস্যায়।

আর একজন বলল, তা বলেছেন। কিন্তু আগে তিনি কখনই আত্মা, পুনর্জন্ম বা পরলোক সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। তিনি শুধু জন্মের কথাই বলতেন। তাঁর মতে এই জগৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, সত্য ও ধ্যান—প্রকৃতির এই দুটি ধর্মই বিশ্বজগৎকে ধারণ করে আছে। সত্য ভ্রষ্ট হওয়া মানেই ধর্মচ্যুত হওয়া। এই ধর্মকেই তিনি জীবনের শেষ কথা বলে মনে করতেন।

সভাপতি বলল, সকলের কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। তাঁর কাছে এই শিক্ষা পেয়েই আমাদের রাজা বিরোচন সত্য রক্ষার জন্য তাঁর সমুকুট শির দিয়েছেন বঞ্চক ইন্দ্রকে। তরুণ

রাজা বলিও সত্য রক্ষার জন্য বিষ্ণুর বঞ্চনায় ভুলেছেন। আমাদের এই সত্যনিষ্ঠ গুরুদেব সহসা ভিন্ন কথা বলবেন বলে আমার মনে হয় না।

তবে কি যিনি পরে এসেছিলেন, তিনিই আমাদের গুরুদেব?

দৈত্যদের মধ্য থেকে এই প্রশ্ন উঠতেই সবাই সবার মুখের দিকে তাকাল। সভাপতি বলল, কে তাঁকে সবচেয়ে কাছে থেকে দেখেছে?

আমি।

এ কথা বলতেই সবাই যেন একবাক্যে প্রশ্ন করে উঠল, কী দেখেছ তুমি? কী বুঝেছ? কী মনে হয়েছে তোমার?

প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে সে বলল, আমি কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না।

কেন?

আমি তাঁকে তাড়াতে গিয়েছিলাম, অন্য কিছু ভেবে যাই নি। মনে কোন সন্দেহ থাকলে আমি তাঁকে ভাল করে দেখতাম।

সহসা একজন এগিয়ে এসে বলল, আমি দেখেছি তাঁকে।

কী দেখেছ বল। কোন দ্বিধা নয়, সঙ্কোচ নয়, নির্ভয়ে বল যা দেখেছ তুমি। কারও মুখ চেয়ে কোন কথা বোলো না।

তাঁকে দেখে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে গিয়েছিল—সেই দেহ, সেই কান্তি, সেই চোখ, সেই দৃষ্টি, সেই স্নেহ, সেই মমতা। তাঁকে আমরা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের অভিশাপ দিতে পারলেন না। আমার মনে হল, বুক-ভরা বেদনা নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন।

তারপর একে একে অনেকেই বলতে লাগল, আমাদের গুরুদেবের দেহ তো অমন স্থুল ছিল না, অমন স্ফীতোদর, বর্ণও ঐ রকম শ্যামল ছিল না। তাঁর বর্ণ ছিল চাঁপাফুলের মতো গৌর, মুখের হাসি ছিল প্রসন্ন, উদার, স্নেহময়। তাঁর কাছে ছেড়ে থাকতে চাইতেন না।

গভীর গলায় সভাপতি বলল, আরও একটা কথা আমার মনে আসছে।

কী কথা?

গত কাল তিনি আমাদের বলেছিলেন, তিনি স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন আমাদের। কিন্তু আমাদের গুরুদেব তো অন্য কথা বলতেন। তিনি কখনও আমাদের স্বর্গরাজ্য জয়ে উৎসাহ দেন নি। বরং বলেছেন যে সবাইকে ভালবেসেই আমরা স্বর্গ গড়তে পারি। তার জন্যে যুদ্ধ করে কোন রাজ্য জয়ের দরকার নেই। তিনি কখনও আমাদের যুদ্ধে প্ররোচনা দেন নি, যুদ্ধে

আত্মরক্ষা করতেই শিখিয়েছেন। কাউকে বধ করতে বলেন নি, কেউ নিহত হলে তাকে বাঁচাবার চেষ্টাই করেছেন।

আর একজন বয়োবৃদ্ধ বলল, তিনি আমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছিলেন তাও তাঁর পুরাতন শিক্ষার পরিপন্থী। ভোগকে তিনি নিজে ঘৃণা করতেন, ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করতে বলতেন। ভোগের উদগ্র বাসনা বুদ্ধিমানের জন্য নয়, এই বাসনা অধ্যাত্ম ভাবনা বিকাশের অন্তরায় বলে তিনি মনে করতেন। তিনি আমাদের বার বার বলেছেন যে ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে।

কিন্তু—

অনেক আলোচনার পরে স্থির হল যে দুই গুরুদেবেরই সন্ধান করতে হবে। যিনি তাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তিনি তাঁর পিতামাতার দর্শনে যাবেন বলেছিলেন। কাজেই দৈত্যদের কয়েকজন মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমের দিকে যাবে। আর দৈত্যরা যাঁকে অপমান করে বিতাড়িত করেছে তাঁর খোঁজে কয়েকজন যাবে রাজা বৃষপর্বার কাছে। মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমে গুরুদেবকে না পাওয়া গেলে তারা বুঝতে পারবে যে তারা প্রতারিত হয়েছিল। তাঁর শিক্ষা যে তাদের ভুল পথে চালনার জন্যে তা বুঝতে পারবে। এখনও তারা নূতন শিক্ষা অনুসারে জীবন যাত্রা নির্বাহ করছে না। ভুলে যাবে তাদের এই সাময়িক দুর্বলতার কথা। তারপর তাদের প্রিয় গুরুদেব ভার্গব শুক্রকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। প্রয়োজন হলে প্রাণপাত করে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে আন্তরিক অনুশোচনা প্রকাশ করে।

দনবরাজ বৃষপর্বার কাছে যে দৈত্যরা এসেছিল, তাদের কাছেই তিনি এই ঘটনা জেনেছিলেন বিস্তারিত ভাবে। দৈত্যরা বলেছিল, গুরুদেব এখন কোথায় আছেন, আপনি জানেন ?

জানি।

পরম বিস্ময়ে তারা বলেছিল, জানেন তিনি কোথায় আছেন ?

হ্যাঁ, জানি বৈকি। কিন্তু এখন বলব না। তোমরা আমার অতিথি। অনেক পথ অতিক্রম করে শ্রান্ত হয়ে এসেছ। আগে স্নানাহার করে বিশ্রাম কর, তারপর বলব।

বলে তাদের সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

সেই সব দিনগুলোর কথা দানবরাজ বৃষপর্বার স্পষ্ট মনে আছে। দৈত্যদের তিনি সরাসরি গুরুদেবের কাছে নিয়ে যান নি। বলেছিলেন, ধৈর্য ধরে দিন কয়েক অপেক্ষা কর। আমি চর পাঠিয়েছি ইলাবৃতবর্ষে, দেবগুরু বৃহস্পতি এখন কোথায় কী করছেন,কী উদ্দেশ্যে তা জেনে আসবার জন্য। তারা ফিরে আসুক।

দৈত্যরা বলল, সে তো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তত দিন কি আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে?

বৃষপর্বা বললেন, না, সময় বেশি লাগবে না। চরেরা অশ্বারোহণে গেছে আমার আদেশে, সীমান্ত পর্যন্ত তারা অশ্বারোহণেই যাবে। দুজন সেখানেই অপেক্ষা করবে, আর সবাই পদব্রজে সুমেরু পর্বতের দিকে অগ্রসর হবে দেবযান পথে। সীমান্তের সংবাদ আমি দু-এক দিনের মধ্যেই পেয়ে যাব। তবে ইন্দ্রের নূতন অভিসন্ধির কথা জানতে কিছু সময় লাগবে।

কিন্তু গুরুদেবের কাছে যেতে বাধা কি আছে?

গুরুদেব নিজেই বাধা। তিনি এখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করবেন না।

কেন?

তা তিনিই জানেন। আমি তাঁর আদেশ মতোই কাজ করছি। তিনি ইন্দ্রের অভিসন্ধি জানতে চান। দেবগুরু বৃহস্পতিকে কেন তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁরই ছদ্মবেশে, তা তাঁর অবিলম্বে জানা দরকার।

কিন্তু আমরাও তো তাঁকে সাহায্য করতে পারি!

কী সাহায্য?

দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের কী শিক্ষা দিয়েছেন এত দিন, তা জানতে পারলে তিনি অনেক কিছুই অনুমান করতে পারবেন। বাকিটা তিনি জানবেন ধ্যানে।

বৃষপর্বা বললেন, ঠিকই বলেছ। কিন্তু তাঁর অনুমতি না নিয়ে আমি তোমাদের সেখানে যেতে দিতে পারি না।

কিন্তু আমাদের যে অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

কেন?

আমরা আমাদের নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছি। তিনি ক্ষমা না করলে

আমরা হৃদয়ে শান্তি পাচ্ছি না।

বৃষপর্বা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ক্ষমা! তোমরা কি মনে কর যে তিনি তোমাদের ক্ষমা করতে পারবেন? যে অপরাধ তোমরা করেছ, তার পর তোমাদের কি ক্ষমা করা সম্ভব?

দৈত্যরা বলল, আপনি কি ভাবছেন তাঁর ক্রোধে আমরা ভস্ম হয়ে যাব? তাহলে তো সেদিনই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ভস্ম করতেন। আমরা তাঁর সন্তান। সন্তানের প্রতি তাঁর অসীম দুর্বলতার কথা আমরা জানি। একবার তাঁর দর্শন পেলে ক্ষমা পেতে আমাদের একটুও বিলম্ব হবে না।

বৃষপর্বা বললেন, আমি নিজের চোখে সেই দৃশ্য দেখতে চাই। তোমরা অপেক্ষা কর, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

দৈত্যদের নিয়ে বৃষপর্বা এলেন দৈত্যগুরু শুক্রের আশ্রমে। পাহাড়ের গায়ে এক গিরিগুহায় তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। অদূরে একটি নির্ঝরিণীর কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে। গুরুদেবের জন্য বৃষপর্বা একটি গৃহ নির্মাণ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শুক্র রাজী হন নি। বলেছিলেন, রাজার লোক এসে আমার গৃহ নির্মাণ করে দিলে ধর্ম নষ্ট হবে। আমি দরিদ্র, স্বাবলম্বী হওয়াই আমার ধর্ম।

বৃষপর্বা বলেছিলেন, আমি আপনার শিষ্য, শিষ্যের সেবা গ্রহণ করলে গুরুর ধর্ম নষ্ট হয় না। আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী শিষ্যের সেবা গ্রহণে দোষ নেই।

দানবরাজের কোন যুক্তির কাছেই দৈত্যগুরু নতি স্বীকার করেন নি। তাই দানবকুলের কয়েকজন বালককে পাঠিয়েছেন আশ্রমে এসে ব্রহ্মচারী হয়ে বাস করতে। তারাই তার আশ্রম নির্মাণ করছে, সেবা করছে। অরণ্যজাত নীবার ধান্য সংগ্রহ করে আনছে, আনছে বনের সুপক্ক ফলমূল, শীতল পানীয় জল, অগ্নিহোত্রের অগ্নি রক্ষা করছে পরম যত্নে। রাজার দান তিনি গ্রহণ করবেন না বলে সেই শিষ্যরা নিজেদের গৃহ থেকেই গাভী এনেছে, তারাই এখন দোহন করছে গাভী।

দৈত্যগুরু শুক্র বসে ছিলেন একটি বৃক্ষের নিচে তাঁর নবীন শিষ্যদের নিয়ে। তিনি তাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তার পাশে আপন মনে ক্রীড়া করছিল একটি শিশুকন্যা। দৈত্যগুরু বলছিলেন, নিজের সুখের জন্য, নিজের ভোগের জন্য এই জীবন নয়। এই জীবন সবার সুখের জন্য, সবার কল্যাণের জন্য। পুষ্প

যেমন সবার আনন্দের জন্য বিকশিত হয়, তেমনি করে নিজের জীবন বিকশিত কর সবার আনন্দ বিধানের জন্য। অনাদরে অবহেলায় ঝরে গেলেও দুঃখ পেও না, তুমি বেঁচে থাকবে তোমার বীজের মধ্যে। বীজও এক দিন অঙ্কুরিত হয়ে পুষ্পিত হবে তোমারই মতন। তুমি অমৃতের সন্তান, তোমার মৃত্যু নেই। তোমার আত্মা বেঁচে থাকবে কর্মই তোমার আত্মা। তুমি তোমার কর্মফল ভোগ করবে তোমার সন্তানের মধ্যে। সন্তানের মধ্যেই তোমার পুনর্জন্ম, তারই মধ্যে তোমার পরকাল। ইহকালের ত্যাগের দ্বারাই তুমি পরকালে ভোগ করবে।

দৈত্যদের নিয়ে বৃষপর্বা এক বৃক্ষের অন্তরালে ছিলেন। এইবারে অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললেন, শুনলে গুরুদেবের কথা?

অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে তারা বলল, শুনলাম।

বৃষপর্বা তাদের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কিন্তু তোমরা এমন বিমর্ষ হয়ে গেলে কেন?

এই গুরুদেবকে আমরা চিনতে পারি নি।

বলে একজন ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের উপরে আছড়ে পড়ল।

বিব্রত বোধ করলেন দৈত্যগুরু শুক্র। বলে উঠলেন, কে, কে তুমি?

ততক্ষণে অন্যেরাও তাঁর নিকটে গিয়ে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। বলল, গুরুদেব, আমরা। আমরা এসেছি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে।

তোমরা! কেন! তোমরা তো নতুন গুরু পেয়েছ! তবে আমার কাছে এসেছ কেন?

দানবরাজ বৃষপর্বা বললেন, ওরা ওদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত গুরুদেব, আপনি ওদের ক্ষমা করুন।

শুক্র বললেন, আজও ওরা শিশুর মতো সরল। যে যা বোঝায়, তাই বোঝে ওরা। তাই আমার ওদের জন্যে এত ভাবনা। কিসে নিজের মঙ্গল হয়, আজও ওরা তা বুঝতে শেখে নি।

দৈত্যরা একে একে উঠে বসল দেখে শুক্র বললেন, তোমরা ক্ষমা চাইতে এসেছ আমার কাছে! আর আমি তোমাদের জন্যেই ভেবে অস্থির হচ্ছি। তোমার চরেরা কি এখনও ফেরে নি?

বলে বৃষপর্বার মুখের দিকে তাকালেন।

বৃষপর্বা বললেন, যারা এদের সংবাদ আনতে গিয়েছিল, তারা ফিরে

এসেছে, তাদের কাছে খবর পেয়েছি যে দেবগুরু পলাতক। তাই তাঁর খোঁজে পাঠিয়েছি অশ্বারোহী চর। দেবগুরু দেবযান পথে স্বর্গে চলেছেন, না এই অঞ্চলেই আত্মগোপন করে আছেন, তা জেনে আসবে। পারলে এও জেনে আসবে যে কোন্ উদ্দেশ্যে তিনি এদের কাছে এসেছিলেন।

শুক্র বললেন, আমি এই রকমই তোমাকে বলেছিলাম।

বৃষপর্বা বললেন, দেবগুরু এদের কী শিক্ষা দিচ্ছিলেন আপনি শুনুন। আমার মনে হয় যে এ কথা শুনলে আপনি তাঁর উদ্দেশ্য অনুমান করতে পারবেন।

শুক্র মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সব কথা। শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, বুঝেছি।

কী বুঝলেন?

ধর্ম পথ থেকে তোমাদের ভ্রষ্ট করতে চেয়েছিল। চরিত্রবল নষ্ট করাই একালে জয়ের সবচেয়ে সহজ উপায়। কোন জাতিকে ভোগী হতে শেখালেই সে আচারভ্রষ্ট হবে, তাকে পেয়ে বসবে কাম ক্রোধ লোভ মোহ ও মাৎসর্য। চরিত্রবল হারিয়ে সে নপুংসকের মতো দুর্বল হবে, হারাবে তার বিবেক। ভোগের অদম্য বাসনা তাদের পশুতে পরিণত করবে। দিগ্বিজয়ের এও এক পন্থা। কোন দেশ জয় করতে চাইলে তুমি সেই দেশে পাষণ্ড পণ্ডিত পাঠাও। তারা ভোগের মাহাত্ম্য প্রচার করবে। যুবকেরা সেই কথায় বিশ্বাস করবে সহজে। তাদের চরিত্রবল নষ্ট হলে তারা দেশ রক্ষার কথা আর ভাবতে পারবে না।

শুক্র বৃষপর্বার মুখের দিকে চেয়ে এই কথা বলছিলেন। বৃষপর্বা বললেন, দেশ জয়ের এ তো এক কৌশল।

একজন দৈত্য ক্রীড়ারত শিশুকন্যাটিকে সস্নেহে বুকে তুলে নিয়েছিল। তাই দৈত্যগুরু বললেন, এ আমারই কন্যা। গন্ধমাদন পর্বতের সানুদেশে গৃহী হয়ে আমি কিছু দিন সংসার করেছিলাম। সেই সময়ে এর জন্ম। দেবযান পথে একে আমি এনেছি। তাই একে তোমরা দেবযানী বলে ডাকতে পারো।

দেবযানীর এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় জেনেছিলেন দানবরাজ বৃষপর্বা। কন্যাকে

তিনি সম্মানের পরিচয় দিয়েছিলেন। দেবযানী তাঁর কুড়িয়ে-পাওয়া কন্যা নয়, তিনি গৃহী হয়ে এই কন্যা লাভ করেছেন। দেবযানী তাঁর নিজের কন্যা।

কিন্তু দেবযানীর জননীকে তিনি সঙ্গে আনেন নি কেন, সে কথা গুরুদেব প্রকাশ করেন নি। বৃষপর্বাও সাহস পান নি সে কথা জিজ্ঞাসা করবার। তাঁর পক্ষে এ ধৃষ্টতার কাজ হত বলে তিনি মনে করেছিলেন। গুরুদেব যতটুকু বলেছেন, ততটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত বলে ভেবেছিলেন।

সেদিন দৈত্যরা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গুরুদেব কিছুতেই রাজী হন নি। তিনি তাঁর সঙ্কল্পে অটল হয়ে ছিলেন। বলেছিলেন, যে আশ্রম ত্যাগ করে এসেছি, সেখানে আর ফিরে যেতে পারি নে। নিজের আশ্রমে ফিরে এসে আমি অনেক দিন তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু তোমরা সেখানে আসো নি, কোন খোঁজ নাও নি আমার। কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে থাকত বলেই আমি সেই আশ্রম ছেড়ে তোমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তোমরা আমাকে চিনেও চিনলে না। অথচ তোমাদের জন্যেই আমি সংসার ত্যাগ করে চলে এসেছি। কিন্তু এই নবীন শিষ্যদেরও আমি ত্যাগ করতে পারব না।

বলে তাঁর দানব শিষ্যদের দেখালেন। বললেন, সংসারে ভোগের লিপ্সা আছে, তাই সংসার ত্যাগ করতে হয় ভোগের লালসা বাড়লে। কিন্তু স্নেহ ত্যাগ করতে শেখায়, তাই এই স্নেহকে জীবনের সঙ্গী বলে মেনে নেওয়া যায়। বিদ্যা ও স্নেহ বিতরণে চরিত্রবলের ক্ষয় নেই, জয় করা যায় জগৎকে।

দৈত্যকুলের আন্তরিকতা দেখে বৃষপর্বাকে সেদিন বলতে হয়েছিল, তোমরা তাহলে গুরুদেবের আশ্রয়ে এখানেই বাস কর।

সবাই জানে যে বৃষপর্বা ইন্দ্রের সঙ্গে নূতন কোন বিরোধে লিপ্ত হতে চান না। তাই কিছু দিন আগেও তিনি তাঁর রাজ্যে দৈত্যদের আশ্রয় দিতে রাজী হন নি। গুরুদেবকে তিনি এ কথা বলতে দ্বিধা করেন নি। তাই দানব-রাজের মুখে এই নতুন কথা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর নিঃশব্দ প্রশ্ন বুঝতে পেরে রাজা বললেন, আপনি যে উভয় সঙ্কটে পড়েছেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। একজনকে পরিত্যাগ করতে হবে আপনাকে। আমার প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে আপনি আপনার পুরাতন শিষ্যদের ত্যাগ করছেন।

দৈত্যগুরু বললেন, হ্যাঁ, ওরা আমাকে আগে ত্যাগ করেছিল। তাই

তাদের জন্যে আমি তোমাদের ত্যাগ করতে চাই নে।

রাজা বললেন, এই ব্যবস্থায় আপনার কাউকে ত্যাগ করতে হবে না।

কিন্তু দেবতাদের সঙ্গে যে বিরোধে তুমি লিপ্ত হতে চাওনি, সেই বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দেবে।

গুরুদেবের জন্য সে দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করতে হবে। আর আমরা তো এ যাবৎ একত্র হয়েই ইন্দ্রকে প্রতিরোধ করেছি। ভবিষ্যতেও তাই করব, তবে নিজেরা তাকে উৎখাত করবার জন্যে অগ্রসর হব না।

দৈত্যগুরু শুক্র বললেন, পররাজ্য আক্রমণের কোন সার্থকতা নেই। কী হবে পররাজ্য অধিকার করে, যদি নিজ রাজ্যের প্রজা সাধারণের সুখশান্তি যুদ্ধের আশঙ্কায় বিঘ্নিত থাকে। রাজা যদি যুদ্ধের আয়োজনেই ব্যস্ত থাকেন, তবে প্রজাদের সমৃদ্ধির পথ করে দেবে কে ?

তারপর তিনি পৃথু রাজার কথা বলেছিলেন দৈত্যদের। সেই অন্ধকার যুগেরও পূর্বের কথা। অরাজক দেশে তখন কোন রাজা ছিল না।

দৈত্যরা জানতে চেয়েছিল, কেন, কী হয়েছিল রাজার ?

শুক্র বলেছিলেন, দেশের রাজা ছিলেন বেণ। ঋষিরা ষড়যন্ত্র করে রাজাকে হত্যা করেছিলেন।

এই কথা শুনে সবাই বিস্ময়াপন্ন হয়েছিল। শুক্র বলেছিলেন, বিস্মিত হবার কিছু নেই। এ সত্য ঘটনা। আর এই ঘটনার পরেই আমাদের দেশে সূত্র ও মাগধ নিযুক্ত হয় ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য।

বৃষপর্বা বললেন, সেই ঘটনার কথা আমাদের বলুন।

দৈত্যগুরু বললেন, বেণের জন্ম হয়েছিল স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে। ধার্মিক রাজা ধ্রুবের পর একাদশ পুরুষে তাঁর জন্ম। এই পবিত্র বংশের রাজা বেণকে ঋষিরা কেন হত্যা করেছিলেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

কেন ?

এও এক বিরোধের পরিণাম। রাজা হবার পর বেণ সেকালের একচ্ছত্র সম্রাট বিষ্ণুর আধিপত্য মানতে রাজী হন নি। মনে হয় এই বিরোধের সূত্রপাত হয় বেণের পিতা অঙ্গের সময়ে। অঙ্গ দুর্বল ছিলেন বলে কাউকে কিছু না বলে রাত্রির অন্ধকারে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে যান। কিছু দিন তাঁকে অন্বেষণের পর হতাশ হয়ে ঋষিরা তাঁর পুত্র বেণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই বেণই ঘোষণা করেন যে তাঁর রাজ্যে তিনিই সর্বেসর্বা। ঋষিদের যজ্ঞে

বাইরের কোন রাজাকে নিমন্ত্রণ করে এনে যজ্ঞের ভাগ দিতে হবে না। যজ্ঞের ভাগ মানে কর! অর্থাৎ বেণ বিষ্ণুর প্রভুত্ব অস্বীকার করলেন, সেই সঙ্গে বিষ্ণুর সামন্ত রাজাদেরও প্রভুত্ব। মনে হয় যে অঙ্গের রাজত্বকালেই বেণ এই প্রথা চলনের চেষ্টা করেছিলেন বলেই অক্ষম অঙ্গ ভয়ে রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন।

বৃষপর্বা বললেন, তাই সম্ভব।

দৈত্যগুরু বললেন, ত্রিভুবনে তখন বিষ্ণুই প্রধান এবং ঋষিরা তাঁকেই মানতেন। তাই বেণের সঙ্গে ঋষিদের বিরোধ দেখা দিল। প্রথমে তাঁরা বেণকে এসে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। একবার দুবার নয়, বহুবার এসে নানা রকমে তাঁকে বোঝালেন। কিন্তু বেণের সেই এক কথা—আমিই আমার রাজ্যে একমাত্র যজ্ঞভাগী, আমার রাজ্যে যজ্ঞ করলে আর কাউকে যজ্ঞের ভাগ দেওয়া চলবে না। শেষ পর্যন্ত ঋষিরাই ষড়যন্ত্র করে রাজাকে বধ করলেন।

দৈত্যরা পরম বিস্ময়ে বলে উঠল, রাজাকে বধ করলেন!

দৈত্যগুরু বললেন, হ্যাঁ, আমরা তাই শুনেছি। সে সময়ে ঋষিরাই দেশের রাজা নির্বাচন করতেন, রাজ্যে অভিষিক্ত করতেন এবং প্রয়োজন হলে রাজাকে বধও করতেন।

দানবরাজ বৃষপর্বা কোন কথা বললেন না। দৈত্যরাও নির্বাক হয়ে পুরাতন ইতিহাস শুনতে লাগল।

দৈত্যগুরু বললেন, তারপর দেশ হল অরাজক. চোরের উপদ্রব দেখা দিল। দেশে অভাব অনটন, জনসাধারণের দুর্দশা। এই সব দেখে ঋষিরা বুঝতে পারলেন যে রাজাকে হত্যা করা ভুল হয়েছে। দেশে একজন রাজা থাকা খুবই প্রয়োজন, এই প্রয়োজন প্রজার মঙ্গলের জন্য। কারণ রাজাই প্রজাদের রক্ষা করেন, সুখ-দুঃখ দেখেন নিজের সন্তানের মতো।

দৈত্যরা বলল, ঠিক কথা।

বৃষপর্বা বললেন, বেণের কি পুত্র ছিল না?

না, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর পত্নীর কথাও জানা যায় না। মনে হয় যে তিনি তরুণ ছিলেন, হয়তো পত্নীও গ্রহণ করেন নি। তাই ঋষিরা মন্ত্রণা করে তাঁর রাজ্য থেকে একজন প্রজাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু দেখা গেল যে প্রজাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে শক্তিশালী, তিনি একজন পোড়া কাঠের মতো হ্রস্বকায় খর্বমুখ আদিবাসী পুরুষ। ঋষিরা তাঁকে পছন্দ করলেন না।

ইনি কি আমাদের স্বজাতি ছিলেন না ?

না, ইনি ছিলেন বিন্ধ্যপর্বতবাসী নিষাদ। তাই ঋষিরা বেণের সেনা-বাহিনীর মধ্য থেকে পৃথু নামে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। এই পৃথুর নামেই এই অঞ্চলের নাম পৃথিবী হয়েছিল। পৃথিবীই মর্ত্যভূমি আর উত্তরের যে ভূখণ্ড বিষ্ণুর অধিকারে, তারই নাম স্বর্গ।

বৃষপর্বা বললেন, আর দক্ষিণের সাগর বেষ্টিত অঞ্চল পাতাল।

দৈত্যরা বলল, আমাদের রাজা বলি যেখানে নির্বাসিত হয়েছেন, সেই অঞ্চল ?

দৈত্যগুরু বললেন, হ্যাঁ। সেও রমণীয় স্থান, কিন্তু যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই বলেই তা সপ্ত পাতালে বিভক্ত হয়ে আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে আমরা পাতালে গিয়ে সুখে বাস করতে পারব।

বৃষপর্বা বললেন, আপনি পৃথু রাজার কথা বলছিলেন।

হ্যাঁ। পৃথু নিঃসন্দেহে একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন।

কেন ?

তাঁর রাজ্য পরিচালনার ব্যবস্থা দেখেই তা অনুমান করা যায়।

বৃষপর্বা বললেন, আপনি আমাদের একটু বুঝিয়ে বলুন।

দৈত্যগুরু বললেন, ঋষিদের সঙ্গে তিনি কোন বিবাদ করলেন না; একবারও বললেন না যে বেণ ঠিকই বিবেচনা করেছিলেন। মতের এই বিরোধের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে তিনি দেশের জনগণের অবস্থার উন্নতির দিকে মনোযোগ দিলেন। কৃষির ব্যবস্থা ছিল না বলে দেশে খাদ্যাভাব ছিল। প্রথমেই তিনি ভূমি সমতল করে কৃষির ব্যবস্থা করেছিলেন, সমতল ভূমিতে প্রজাদের গ্রাম নির্মাণ করে বসতি স্থাপন এবং গোরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাণিজ্যের জন্য বণিক-পথও নির্মাণ করেছিলেন তিনি। রাজ্যের প্রজাদের উন্নতির জন্যই তিনি এই সব ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশের সামগ্রিক উন্নতির প্রয়োজন আগে, তারপর যজ্ঞের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি।

বৃষপর্বা বললেন, পৃথু কত কাল আগে এ দেশে রাজত্ব করেছেন গুরুদেব ?

দৈত্যগুরু বললেন, পৃথু যে সূত ও মাগধ নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর সভায়, তারা পুরুষানুক্রমে এই কালের হিসাব রক্ষা করে গেছে। পৃথু রাজত্ব করে-ছিলেন এক হাজার বছর আগে।

দৈত্যারা সবিস্ময়ে বলল, এক হাজার বছর !

তার চেয়েও কিছু বেশি। পৃথুর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই এক মহাপ্লাবনে ত্রিভুবন জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। কণ্ব মুনির কাহিনী রচনা করে সূত ও মাগধেরা বলে গেছে যে এই মহাপ্লাবনে ত্রিভুবন জলমগ্ন ছিল নয়শো সাতাশি বছর ছ মাস তিনদিন। পৃথুর পুত্র অন্তর্ধান। এই বংশেরই প্রচেতারা জলমগ্ন হয়ে এই দীর্ঘ সময় তপস্যা করেছিলেন বলে জনশ্রুতি। তারপর তারা অরণ্য-বাসী কোন কন্যাকে বিবাহ করে দক্ষের জন্ম দেন। দক্ষ প্রজাপতির দৌহিত্র তুমি। এই সময়ের কথা তোমরা সবাই জানো।

বৃষপর্বা বললেন, আমি সকলের কনিষ্ঠ বলে আমার জন্মের পূর্বেই দেবাসুরের বড় যুদ্ধ বিগ্রহগুলি সংঘটিত হয়েছে।

দৈত্যগুরু বললেন, হ্যাঁ, দেশের জনগণের এখন বড়ই দুর্দশা। সূর্য ও চন্দ্র বংশের রাজারা এখন দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টায় নিযুক্ত। তোমাদেরও এখন দেবতাদের সঙ্গে মৈত্রী করে দেশ গঠনের কাজে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। যুদ্ধে শুধুই অশান্তি, সম্পদের ক্ষয় ও দুর্দশার বৃদ্ধি। সর্বতো ভাবে যুদ্ধ বর্জনই প্রকৃত রাজনীতি। লোভে সুখ নেই, সুখ বৈরাগ্যে।

দৈত্যগুরুর এই উপদেশ বৃষপর্বার মনে পড়ছে। তাই নিদ্রাহীন চোখে তিনি শয্যায় শুয়ে আছেন। ইলাবৃত বর্ষের রাজা ইন্দ্র অনেক দিন চুপ করে আছেন। তিনিও শান্তি চান বলে বৃষপর্বার মনে হয়েছিল। কিন্তু অকস্মাৎ তিনি দেবযানীর সংবাদ নিতে পাঠাচ্ছেন কেন, তা ভেবে পাচ্ছেন না। এর পিছনে কি তাঁর কোন দুরভিসন্ধি আছে ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিন কয়েক পরে এক কিশোর এসে দাঁড়াল দৈত্যগুরু শুক্রের সামনে। তার হাতে দণ্ড কমণ্ডলু, কুশ ও সমিধ। শুক্রকে প্রণাম করে সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। অপরূপ সুন্দর তার রূপ দেবদুর্লভ। দৈত্য ও দানব বালকেরা তার দিকে তাকাল পরম শ্রদ্ধায়।

দৈত্যগুরু বললেন, কে তুমি ? কোথা থেকে এসেছ ?

কিশোর অবনত মুখে মৃদু স্বরে বলল, আমি দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র, কচ, এসেছি ইলাবৃত বর্ষ থেকে।

শুক্র বললেন, তোমার হাতের উপকরণ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি আমার কাছে অধ্যয়নের জন্য এসেছ।

কচ বলল, আমি আপনার শিষ্য হবার জন্য এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি।

কেন, তোমার পিতা কি তোমাকে শিক্ষা দেন নি ?

তাঁর কাছে আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানের তো শেষ নেই। আমি আপনার কাছে শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্য এসেছি।

দৈত্যগুরু ধ্যানস্থ হয়ে চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ, তারপর প্রশ্ন করলেন, কে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে ? তোমার পিতা, না অন্য কেউ ?

কচ বলল, আমার পিতা বলেছেন, অসামান্য জ্ঞান আপনার, নানা বিদ্যায় আপনি পারদর্শী। আপনার ও আপনার পরিবারের সবার সেবা করে, সেবায় সবাইকে পরিতুষ্ট করে আপনার সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ব করতে আমাকে যত্নবান হতে হবে।

গভীর দৃষ্টিতে দৈত্যগুরু চেয়ে ছিলেন কচের মুখের দিকে। তাই দেখে কচ বলল, আমার পিতা বলেছেন, আপনি অপুত্রক, তাই আপনার পুত্রের মতো সযত্নে আমাকে আপনার অধীত বিদ্যা আয়ত্ব করতে হবে ভবিষ্যতের জন্য।

শুক্র বললেন, তিনি এই কথা বলেছেন !

কচ বলল, আমি সত্য বলছি আপনাকে। আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলে আমি কৃতার্থ মনে করব নিজেকে। আমার সেবায় যদি আপনি সন্তুষ্ট হন, তবেই আমাকে বিদ্যা দান করবেন। যতটুকু দেবেন, ততটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। তার বেশি আমি কিছুই চাইব না। আর নিজেকে যোগ্য প্রমাণ না করলে আমি কিছুই আশা করব না। এই প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে দিচ্ছি।

দৈত্যগুরু কচের মুখের দিকে তাকিয়ে তার হৃদয় ভেদ করে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করলেন। কোন মিথ্যা, কোন ছলনা, কোন বঞ্চনার ইঙ্গিত দেখতে পেলেন না এই সুন্দর সরল কিশোরের মুখে। বললেন, পথশ্রমে তুমি শ্রান্ত হয়েছ, স্নান করে এসো নির্ঝরণীর জলে। আহার করে বিশ্রাম

কর আজ। মা, দেবযানী—

বলে ডাকলেন তাঁর কন্যাকে।

পিতার আহ্বানে দেবযানী কুটিরের অভ্যন্তর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। নিকটে এসে বলল, আমাকে ডাকছ বাবা?

দৈত্যগুরু শুক্র তাঁর কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ মা। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ এসেছে আমার শিষ্য হবার জন্যে। তাকে আমি স্নানাহার করে বিশ্রাম করতে বলেছি। বড়ই শ্রান্ত মনে হচ্ছে তাকে। তুমি তার পরিচর্যার ব্যবস্থা কর।

কচের মুখের দিকে তাকাল দেবযানী। পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখল সেই কিশোর কুমারকে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ তার খর রৌদ্রে তপ্ত কাঞ্চনের মতো দেখাচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ। কিছু ভয় কিছু সঙ্কোচে ম্লান মুখ দৈত্যগুরুর প্রসন্ন আশ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। বলল, দেবী, আমি সেবক, সেবা করে বিদ্যার্জন করতে এসেছি।

দেবযানী বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কচের কথা শুনে বলল, এসো, আমি তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বলে তাকে শিষ্যদের জন্য নির্দিষ্ট কুটিরে নিয়ে গেল। বলল, যাও, তোমার জিনিস-পত্র রেখে এসো, আমি তোমাকে নির্ঝরিণীর পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। তুমি স্নান করতে যাও, আমি তোমার আহারের আয়োজন করছি।

গুরুর সামনে কচ মুখ তুলে তাকায় নি। তার দৃষ্টি ছিল ভূমিতে নিবদ্ধ। এইবারে সে মুখ তুলে তাকিয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। তারই সমবয়সী এক কন্যা তার কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করতে চলেছে। তারই মতো দেহের বর্ণ, লাবণ্যময় তার দাঁড়াবার ভঙ্গি। মুগ্ধ চোখে কচ এই সুন্দরী কন্যার দিকে চেয়ে রইল।

লজ্জায় অবনত হল দেবযানীর দৃষ্টি। বলল, কী দেখছ?

আমাকে কচ বলল, তোমাকে।

আমাকে!

হ্যাঁ, দেবযানী, আমি তোমাকেই দেখছি।

দেবযানী বলে উঠল, ছি ছি কচ, অমন করে আমার দিকে তাকিও না।

তোমার কথা আমি শুনেই এসেছি।

কার কাছে?

আমার পিতার কাছে। তিনি বলেছেন, তোমাকে তুষ্ট করতে পারলে আমি গুরুদেবের প্রিয়পাত্র হতে পারব। আর তা হলেই তিনি আমাকে সমস্ত বিদ্যা দান করবেন।

দেবযানী আশ্চর্য হয়ে বলল, আমাকে তুষ্ট করে তুমি আমার পিতার প্রিয়পাত্র হতে চাও ?

কচ বলল, তাঁর কাছে বিদ্যালাভের জন্য আমি যে তাঁরই প্রিয়পাত্র হতে এসেছি।

দেবযানী গম্ভীর হয়ে গেল, পরিবর্তিত হল তার কণ্ঠস্বর। বলল, নির্ঝরণীর পথ ঐ দিকে, তার কলধ্বনি শুনে এগিয়ে যাও। আমি তোমার আহারের আয়োজনে যাচ্ছি।

বলে ধীর পদক্ষেপে সে তাদের কুটিরের দিকে চলে গেল।

কচ দেবযানীর দিকে চেয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে লক্ষ্য করল যে দেবযানী তার কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু কেন সে অসন্তুষ্ট হল! সে তো কোন মিথ্যা বলে নি! সে সত্য কথাই বলেছে। সত্য কথা শুনলে কি কেউ অসন্তুষ্ট হয়!

কচ মর্মাহত হল। ভাবল, যাকে তুষ্ট করে বিদ্যার্জনের আদেশ নিয়ে এসেছে, তাকেই সে অসন্তুষ্ট করল সকলের আগে। তার সমস্ত হিসাবের ভুল হয়ে গেছে। পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের প্রভেদ আছে কোন্‌খানে, আর সেই প্রভেদটা কি তার জানা নেই। পুরুষের বেলায় যে নিয়ম চলে, তার বুঝি ব্যতিক্রম আছে স্ত্রীলোকের বেলায়। স্ত্রীলোককে বুঝি অকপটে কিছু বলা চলে না, নিজের হৃদয়কে অনাবৃত করা যায় না তাদের সামনে।

কিন্তু যা ঘটে গেছে তাকে আর ফেরানো যায় না। এখন থেকে খুবই সতর্ক হতে হবে কচকে। পরিণামের কথা ভেবেই কথা বলতে হবে তাকে। কিন্তু তা কি সম্ভব! কথার পরিণাম কি ভাবা যায় কাজের পরিণামের মতো! কে জানে।

কচ আর হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল না। কুটিরে প্রবেশ করে এক ধারে গুছিয়ে রাখল তার জিনিস পত্র। তারপর বেরিয়ে এল। তর্জনীর সঙ্কেতে যে পথ দেখিয়ে গেছে দেবযানী, সেই পথে সে অগ্রসর হল। পর্বতের সানুদেশে পৌঁছেছে এই অরণ্যময় পথ। দেবযানী ঠিকই বলেছে। নির্ঝরণীর কলধ্বনি শোনা যায় এই পথে খানিকটা এগোলেই। পথ

দেখাবার প্রয়োজন হয় না কাউকে। কচ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

মধ্যাহ্নের সূর্য তখনও মাথার উপরে ওঠে নি। এই অঞ্চলের আবহাওয়া কচের কাছে খুবই উষ্ণ বলে মনে হচ্ছে। ইলাবৃত বর্ষ শীতল, হিম ঋতুতে তুষারে আবৃত হয়ে যায় চারিদিকের পর্বত। অগ্নিহোত্রে যজ্ঞানুষ্ঠান করে দিন যাপনই তখন একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়। ঘরের বাহিরে তখন তুষার-পাতও হয়। কিন্তু গন্ধমাদন পর্বতের দক্ষিণে এই হিমবর্ষের আবহাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। আবহাওয়া শুষ্ক উষ্ণ। পথ চলায় শ্রান্তি আসে, বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে হয়।

কিন্তু এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসতে কচের কোন কষ্ট হয় নি। কেন কষ্ট হয় নি, সেই কথা ভাবতে ভাবতেই কচ এগিয়ে চলল। এক সময়ে পৌঁছে গেল সেই নির্ঝরণীর তীরে। অদূরের পাহাড় থেকে ঝর্ঝর শব্দে নেমেছে একটি অপ্রশস্ত ঝর্ণা। তারপর সমতল ভূমির উপর দিয়ে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পশ্চিমের দিকে কয়েকটি বৃহৎ বৃক্ষ অন্ধকার করে রেখেছে তীরভূমি। কিন্তু পূর্ব দিক উন্মুক্ত আছে প্রভাতের সূর্যকে প্রণাম জানাবার জন্য। বনভূমি অতিক্রম করে এই উন্মুক্ত স্থানে এসে কচ থমকে দাঁড়াল। প্রকৃতির এই রূপ তার কাছে অপরূপ বলে মনে হল। চারিদিকে দৃষ্টি দিয়ে এই দৃশ্য সে উপভোগ করবার চেষ্টা করল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর এক শিলাখণ্ডের উপরে এসে বসল।

পথের অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে হল যে ইলাবৃত বর্ষের অধিবাসীরাও যেন তার আবহাওয়ার মতোই শীতল। দেবতারা সেখানে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত আছেন, কে এল আর কে গেল তা নিয়ে কারও কোন মাথা ব্যথা নেই। পথে কেউ তার কাছে জানতে চায় নি সে কে, কোথায় কার কাছে চলেছে কী জন্যে। অন্যের সম্বন্ধে কোন কৌতূহল নেই কারও। কারও সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় নি, কারও আন্তরিকতার কথা তার এখন মনে পড়ছে না।

এই হিমবর্ষে এসে সে এই জগতের অন্য রূপ দেখছে। এখানকার অধি-বাসীরা যেন অন্য কোন জগৎ থেকে এসেছে। গন্ধমাদন পর্বত সে অতিক্রম করেছিল অনেক কষ্টে, পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে বোধহয় অচেতন হয়ে পড়েছিল। চোখ মেলে দেখেছিল, সে একটি পর্বতের গুহায় উষ্ণ শয্যায় শুয়ে আছে, অগ্নির উত্তাপে তার দেহে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে নূতন করে। তাকে

চোখ মেলতে দেখে আনন্দে উজ্জ্বল হয়েছিল এক অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধের দুই চোখ। সস্নেহে বলেছিল, ভয় নেই, নির্ভয় হও তুমি। তারপর সে দেখেছিল এক বৃদ্ধাকে, হাতে এক পাত্র গরম দুধ নিয়ে তার মুখের উপরে ঝুঁকে পড়েছে। পরম যত্নে তারা ওই দুধ পান করিয়েছিল তাকে। কচ শুধু তার চেতনা নয়, দেহের বলও ফিরে পেয়েছিল। উঠে বসে বলেছিল, আমি কোথায়?

বৃদ্ধ তার মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিল, নিরাপদ আশ্রয়ে।

বৃদ্ধা একখণ্ড শুষ্ক মাংস এনে তার হাতে দিয়ে বলেছিল, খাও।

সেই মাংস খণ্ড হাতে নিয়ে কচ তার চারিধারে চেয়ে দেখেছিল যে গুহায় কয়েকটি মেষ ছাড়া আর কিছু নেই। তাই জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমরা কী খাবে?

তুমি খেলেই আমাদের তৃপ্তি হবে বেশি আমাদের চেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত তুমি।

কিন্তু অপরের জন্যে তোমরা নিজেরা অনাহারে থাকবে!

বৃদ্ধা বলল, জীবন কি নিজের জন্যে! অপরের কাজেই যদি তা না লাগল, তবে এই দেহটা বহন করে লাভ কী বল!

কচ আশ্চর্য হয়ে তাকাল তাদের মুখের দিকে। এই রকমের অদ্ভুত কথা এর আগে সে কখনও শোনে নি। দেবতাদের সে সারাক্ষণ নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত দেখেছে। একজনের সুখে আর একজন হয়েছে ঈর্ষান্বিত। প্রতিষ্ঠাবান দেবতাদের দল আছে, সেই দল নিজেদের প্রভুকেই বড় করে প্রচার করতে সারাক্ষণ ব্যস্ত। এই প্রচার কাজে দলাদলির অন্ত নেই। সমাজে সুখ নেই, শান্তি নেই। দেবতারা শুধু নিজেদের প্রতিষ্ঠা চান। আজ ইলাবৃত বর্ষ ছেড়ে এসে হিমবর্ষের এই পর্বত গুহায় কচ নূতন কথা শুনল—জীবনটা নিজের জন্য নয়, এ জীবন অপরের জন্য। এই দরিদ্র দম্পতি স্বেচ্ছায় নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করছে অপরের সুখের জন্য।

বৃদ্ধ বলল, নির্বাক চোখে চেয়ে আছ কেন! খাও।

বলে কচকে সাহায্য করল আহারে।

আহার সমাপ্ত হলে বৃদ্ধ বলল, এইবারে বলতো বাছা, কে তুমি, কোথা থেকে আসছ, যাচ্ছই বা কোথায়?

কচ বলল, আমি দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ, ইলাবৃত বর্ষ থেকে যাচ্ছি

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকটে বিদ্যালাভের জন্য।

বৃদ্ধ দম্পতি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল পরম বিস্ময় নিয়ে। তাই দেখে কচ বলল, কেন, তোমরা কি দেবগুরু বৃহস্পতির নাম শোন নি ?

বৃদ্ধ অকুণ্ঠিত ভাবে বলল, না।

বৃদ্ধা বললে, ইলাবৃত বর্ষ আবার কোন্ দেশ ?

ইলাবৃত বর্ষের নামও শোন নি ?

না। মেরু পর্বতের কথা ?

বৃদ্ধ বলল, না তো !

কচ বলল, এই পর্বতের নাম যে গন্ধমাদন তা জানো তো !

পাহাড়েরও কি নাম থাকে ! কই, আমাদের তো কোন নাম নেই।

বিস্ময়ে অভিভূত হল কচ। এ কোন্ জগতে এসেছে সে ! মানুষের যে নাম থাকে, পাহাড়ের নাম, দেশের নাম, তাও এই দম্পতি জানে না। জীবন ধারণের জন্য তাদের এ সব জানবার কোন প্রয়োজন হয় নি। প্রয়োজন বোধই বুঝি সবাইকে প্রয়োজনের কথা শেখায়। এই বোধ না থাকলে কি কোন প্রয়োজনই হয় না ! এক নতুন অভিজ্ঞতা হল কচের। সে কোন উত্তর দিতে পারল না।

বৃদ্ধ বলল, কোন কথা বলছ না যে ?

কচ সত্যি কথাই বলল, কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

বৃদ্ধ বলল, এইটুকু বয়সে তুমি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছ কেন ?

কচ বলল, আমার যে বিদ্যার দরকার।

বিদ্যা কী ?

কচ বলল, জগতে জানবার অনেক কিছু আছে। সবাই তো সব কিছু জানে না। তাই যে জানে তার কাছে জেনে নিতে হয়।

কী দরকার সে সব জানবার ? এই যে আমরা আছি, কিছু না জেনেও তো আমরা বেঁচে আছি। কিছু জেনে আমাদের কী হবে ?

কচ বলল, আজ যদি তোমাদের অসুখ করে, তোমরা ভাল হবে কেমন করে ?

অসুখ করলে তো সব সময়ে ভাল হওয়া যায় না !

ভাল হতে হলে ভাল হবার মন্ত্র জানতে হয়।

মন্ত্র !

হ্যাঁ, মন্ত্র। দেবতারা বলেন, দৈত্যগুরু মন্ত্রের বলে মৃত ব্যক্তিকেও বাঁচাতে জানেন।

বৃদ্ধ দম্পতি হেসে উঠল এই কথা শুনে। কেউ মরলে কি বেঁচে ওঠা সম্ভব! তা সম্ভব নয়, কখনই নয়।

কচ অনেক চেষ্টা করল তাদের বোঝাতে যে এই জগতে অনেক কিছু আছে জানবার ও শেখবার। তা জানলে বা শিখলে সকলেরই মঙ্গল হয়। দৈত্যগুরু যে সব মন্ত্র জানেন, তা শিখে এলে দেবতাদের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হবে কচ। এই জন্যেই এত শ্রম স্বীকার করে কচকে যেতে হচ্ছে ইলাবৃত বর্ষ থেকে হিমবর্ষে গন্ধমাদন পর্বত অতিক্রম করে। কিন্তু এই গুহার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সামান্য আলোয় সে এই বৃদ্ধ দম্পতিকে এই কথা বোঝাতে পারল না। কিন্তু আর একটি কথা ভেবে আশ্চর্য হল। ভাষা তাদের ভাব বিনিময়ের অন্তরায় হল না। আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে হল না কিছু। ইলাবৃত বর্ষের দেব ভাষার সঙ্গে হিমবর্ষের এই দরিদ্র দম্পতির ভাষার কোন প্রভেদ নেই। প্রভেদ শুধু ভাবের, তাদের চিন্তাধারার। সকলের চিন্তা বুঝি এক পথ ধরে চলে না। সে যা ভাবছে, দেবতারাও কি তাই ভাবছেন! না অন্য কোন ভাবনা নিয়ে তাঁরা কচকে পাঠিয়েছেন দৈত্যগুরুর নিকটে!

কচ অন্যমনস্ক হয়ে এই সব কথা ভাবছিল। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। দেখল যে একটি দানব বালক এই দিকে ছুটে আসছে। কাছে এসে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তোমার এত দেরি হচ্ছে কেন?

কচ চমকে উঠে বলল, তাই তো, আমি তো স্নান করতে এসে এই পাথরের ওপরেই বসে আছি!

বালকটি বলল, তুমি এখনও স্নান কর নি?

এখুনি করছি।

বলে সে জলে নেমে পড়ল।

বালকটি বলল, দেবযানী ঠিকই বলেছে।

কী বলেছে?

হয় পথ হারিয়েছ, নয় ভুলে গেছে ফেরার কথা।

কচ আশ্চর্য হয়ে ভাবল, তারই পথ চেয়ে বসে আছে দেবযানী! কিন্তু সে তো দেবযানীর কথা ভাবছে না!

দানবরাজ বৃষপর্বার নিকটে সংবাদ পৌঁছল যে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ এসেছে তাঁর রাজ্যে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সে এখন এই রাজ্যে কিছুকাল বসবাস করবে। তিনি অবিলম্বে মন্ত্রণা সভায় প্রবেশ করে তাঁর প্রধান অমাত্যদের ডাকলেন। বললেন, অপদার্থ সবাই।

অমাত্যরা চমকে উঠল এই ভর্ৎসনায়। ভয়ে ভয়ে একজন বলল, আমরা অপদার্থ?

তোমরা নও, অপদার্থ তোমাদের চরেরা।

ঘাম দিয়ে অমাত্যদের জ্বর যেন নেমে গেল। সাহস পেয়ে একজন প্রশ্ন করল, কেন মহারাজ?

বৃষপর্বা বললেন, সীমান্তে যারা নিযুক্ত আছে, এই সংবাদ কি তারা এর আগেই সংগ্রহ করতে পারত না? একটি কিশোর আমার রাজ্যের এতটা পথ পদব্রজে অতিক্রম করে এল, সত্য গোপনের কোন প্রয়াস ছিল না তার, অথচ আমাদের চরেরা যে সংবাদ সংগ্রহ করে আনল, তাতে আমি কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি কত অদ্ভুত চিন্তায়!

মাথা নত করে রইল অমাত্যরা। আর বৃষপর্বা বললেন, কয়েক বছর আগেও এই রকম হয়েছিল। দেবগুরু বৃহস্পতির সংবাদের জন্যেও আমরা চর পাঠিয়েছিলাম চারিদিকে। অশ্বারোহণে সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করে অভিসন্ধি জেনে আসবার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। কিন্তু সে কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল তারা। দেবগুরুর আগমন ও নির্গমন—কোনটাই তারা জানতে পারে নি।

একজন অমাত্য বলল, কিন্তু কেউ যে আসছে, এই সংবাদটা আমরা আগেই পেয়েছিলাম।

বৃষপর্বা বললেন, কী সংবাদ পেয়েছিলে বল।

দেবযানীকে নিয়ে যাবার জন্য কেউ আসছে।

কে আসছে?

কোন দেবতা।

কোথায় নিয়ে যাবার জন্যে?

ইলাবৃত বর্ষ থেকে যখন আসছে, তখন সেখানেই যে তাকে নিয়ে যাবে

তা অনুমান করা যেতে পারে

কেন তাকে নিয়ে যেতে আসছে, তা অনুমান করতে পারো ?

বলে বৃষপর্বা সমস্ত অমাত্যের মুখের দিকেই তাকালেন একে একে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করল যে তা সম্ভব নয়।

বৃষপর্বা বললেন ঃ এখন আমরা কী জানতে পারলাম ?

দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ এসেছেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের শিষ্য হবার জন্যে।

উদ্দেশ্য ?

বিদ্যালাভ !

কোন্ বিদ্যা ?

যে বিদ্যা দেবগুরুর অজ্ঞাত, সেই বিদ্যা।

বৃষপর্বা বললেন, অর্থাৎ তাঁর অসাধারণ বিদ্যা মৃতসঞ্জীবনী এবং নূতন যে বিদ্যার প্রয়োগ এখনও করেন নি সেই অপরাজয়ের মন্ত্র।

অমাত্যরা চমকে উঠলেন, বললেন, সর্বনাশ ! সে সব বিদ্যা নিয়ে গেলে আমাদের দুর্দশার তো আর অন্ত থাকবে না !

বৃষপর্বা বললেন, দূরদর্শিতার অভাব আছে তোমাদের। তাই তোমরা এখনও নিশ্চিন্ত আছ।

তাহলে আমাদের এখন কী কর্তব্য মহারাজ ?

আমরা তৎপর হতেও শিখি নি। শত্রু আমাদের ঘরের দরজায় এসে করাঘাত করবার আগে তার গতিবিধি আমরা জানতে পারি না। শত্রুকে চিনতে পারে না সীমান্ত রক্ষীরা, চরেরা সংবাদ সংগ্রহে অসমর্থ। অথচ রাজার দায়িত্ব রাজ্য রক্ষা, প্রজার শান্তি রক্ষা, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি বিধান। রাজা কি নিজের চোখে সব দেখবেন ? নিজের দু হাত দিয়ে রাজ্য রক্ষা করবেন ? অমাত্যরা কী করবেন ? নৃত্যসভায় বসে নাচ দেখবেন অপ্সরাদের ?

লজ্জায় মাথা নিচু করল সকলে। কিন্তু বৃষপর্বা থামলেন না, বললেন, দেবতারাও ইন্দ্রের সভায় বসে অপ্সরাদের নৃত্য দেখেন, গান শোনেন গন্ধর্বদের। কিন্তু তার একটা সময় আছে। অন্য সময় তারা সম্পূর্ণ সজাগ, দৈত্য ও দানবদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ তারা সারাক্ষণ লক্ষ্য করছে। একমুহূর্তের জন্যেও তারা অসতর্ক হচ্ছে না। আমরা তাদের চেয়ে কোন অংশে দুর্বল নই,

অথচ ছলে বলে কৌশলে তারা আমাদের দাবিয়ে রেখেছে। আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছি না, যুদ্ধে জয়লাভ করেও আমরা রাজত্ব ভোগ করতে পারছি না। তার কারণ কি তোমরা ভেবে দেখেছ?

কোন অমাত্য এ কথার উত্তর দিল না। উত্তর বৃষপর্বা নিজেই দিলেন, বললেন, তোমরা ধর্মকে দায়ী করবে, বলবে যে আমরা ধর্মকে আঁকড়ে আছি বলেই বার বার আমাদের পরাজয় হচ্ছে অধর্মের কাছে। কিন্তু ধর্মই তো এই জগৎকে ধারণ করে আছে। ধর্ম আছে বলেই সূর্যের উদয় হয়, জগৎ জাগে, প্রাণীরা প্রাণ পায়, বেঁচে থাকে। ধর্ম লোপ পেলে এই সৃষ্টি অন্ধকার হয়ে যাবে, প্রলয় হবে। কিন্তু তা তো হচ্ছে না, ধর্ম আছে এবং থাকবেও। আমাদের দুর্দশার জন্য ধর্মকে দায়ী করলে চলবে না। তবে আমরা কাকে দায়ী করব? ইন্দ্রকে? না, তাঁকেও দায়ী করলে চলবে না। দায়ী আমরা নিজেরাই, দায়ী আমাদের তজ্ঞতা। আমাদের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিচ্ছে কূটনীতিজ্ঞ দেবতারা।

একজন অমাত্য জিজ্ঞাসা করলেন, এখন আমাদের কী কর্তব্য মহারাজ?

গুরুদেবের সঙ্গে আমি সে পরামর্শ করব। কিন্তু তার আগে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিতে চাই যে এই রকম অন্ধের মতো রাজ্য পরিচালনা করলে আমাদের স্বাধীনতা অচিরেই বিঘ্নিত হবে। দেশের জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যই আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতা করি নি, বরং শত্রুতা যাতে অঙ্কুরিত না হয় তার জন্য সযত্নে সমস্ত বিরোধ এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু ইন্দ্রের অভিসন্ধি আমরা জানি না, আমাদের চরেরা অক্ষম। ইন্দ্র কোন সুযোগের অপেক্ষায় আছেন কিনা তা আমাদের জানা দরকার।

অবশ্যই জানা দরকার।

অথচ ইন্দ্র যদি জানতে পারেন যে আমরা তাঁর রাজ্যে গুপ্তচর নিয়োগ করেছি, তাহলে বিপদ আমাদর বাড়বে।

তবে আমরা কী উপায় অবলম্বন করব?

এই কথাই আমাদের এখন গভীর ভাবে ভাবতে হবে। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র এসেছে দৈত্যগুরুর কাছে। আমরা তাঁর অধীন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতে পারি না, তাঁর কাজেও আমরা বাধা দিতে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি আমাদের কল্যাণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যখন

নিয়েছেন, তখন এমন কিছু করবেন না যাতে আমাদের অকল্যাণ হয়। তবু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, দেবগুরুর পুত্রের দিকে সদা সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে তার কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে কিনা, তাও বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। আর—

বৃষপর্বা ক্ষান্ত হতেই একজন অমাত্য বলল, বলুন, মহারাজ।

বৃষপর্বা বললেন, কাল এই সময়ে আমরা পুনরায় মিলিত হব। আমি গুরুদেবের নিকটে গিয়ে অনুরোধ করব তাঁকে এই সভায় উপস্থিত থাকতে। আমাদের প্রতিবেশী রাজারা এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকারী। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কী রকম সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে, গুরুদেবের নিকটে আমরা সেই উপদেশ চাইব। এই বিষয়ে তোমরা বিলক্ষণ চিন্তা করে আসবে।

বলে বৃষপর্বা সভাত্যাগ করলেন।

দানবরাজ বৃষপর্বা মন্ত্রণা সভা থেকে সোজা অন্তঃপুরে চলে এলেন। মহারানীর পরিচর্যা করছিল পরিচারিকারা এবং তিনি দাসীদের একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। অসময়ে মহারাজাকে আসতে দেখে সকলেই এক সঙ্গে সরে গেল। মহারানী অলস ভাবে শুয়ে ছিলেন, উঠে বসে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, কোন দুঃসংবাদ নেই তো!

মহারাজা বললেন, না, তা নেই। তবে গুরুদেবের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে যাব, তাই রাজবেশ ত্যাগ করতে হবে বলে অন্তঃপুরে চলে এলাম।

মহারানী বিস্মিত হয়ে বললেন, হঠাৎ গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন হল কেন? কোন চিন্তার বিষয় পেয়েছ নাকি?

বৃষপর্বা সহাস্যে বললেন, মহারানীর যোগ্য কথাই বলেছ।

তবে কি দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেখতে যাচ্ছ?

মহারানীর এই কথা শুনে বৃষপর্বা যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, বললেন, তুমি এ সংবাদ পেলে কোথায়?

মহারানী সহাস্যে বললেন, এ সব সংবাদ বোধহয় অন্তঃপুরেই আগে পৌঁছয়। তারপর মহারাজার কানে যায়।

তাই তো দেখছি।

তবে একটু বসে বিশ্রাম করে যাও।

বিশ্রামের দরকার আমার নেই।

আমার কিছু জানবার আছে, তাই বসতে বলছি।

বৃষপর্বা একটি আসনে উপবেশন করে বললেন, বল।

মহারানী তার মুখোমুখি বসে বললেন, শুনলাম যে একজন অতি সুপুরুষ কিশোর এসেছে গুরুদেবের কাছে। দেবযানীর রূপও তার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। অথচ আমরা শুনেছি যে এই কিশোরের পিতা দেবগুরু বৃহস্পতি মোটেই সুপুরুষ নন। পুত্র তো পিতারই অনুরূপ হয়!

মহারাজা বললেন, তোমার এই শোনায় ও জানায় কিছু অসঙ্গতি আছে।

কী রকম?

আদি গুরু বৃহস্পতি সত্যিই কুৎসিত ছিলেন, কিন্তু বর্তমান গুরু বৃহস্পতি সুপুরুষ না হলেও তত কুৎসিত নন। তবে এঁর মাতৃকুলে ছিলেন বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। তারার নাম শুনেছ? আদি বৃহস্পতির পত্নী তারা?

চন্দ্র তাকে হরণ করেছিলেন বলে শুনেছি।

অনেকে তাই বলেন, কিন্তু শৈশবে আমরা শুনেছি যে এ কথা সত্য নয়। চন্দ্রের রূপ গুণের কথা শুনে তারা নিজেই চন্দ্রের গৃহে গিয়েছিলেন তাকে দেখতে। আর চন্দ্র তারার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে ফিরে যেতে দেন নি।

একটু থেমে বৃষপর্বা বললেন, শুনে আশ্চর্য হবে যে তারাও আর ফিরে যেতে চান নি।

সত্যি?

আমরা তো এই ইতিহাসই জেনেছিলাম। লোকে যে বলে চন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করেছিলেন, তা দেবতারাই প্রচার করেছেন গুরুপত্নীর দোষ ঢাকবার জন্যে। তারার সম্মতি না থাকলে চন্দ্রের এ রকম সাহস হত না।

মহারানী বললেন, ঘটনাটা আমি ঠিক জানি না, তুমি আমাকে বল।

বৃষপর্বা বললেন, দেবতাদের চরিত্রহীনতার কাহিনী নাই বা শুনলে।

মহারানী হেসে বললেন, তুমি কি ভাবছ, আমিও তারার মতো কিছু করে বসব।

তা নিশ্চয়ই ভাবছি না। আমাদের মধ্যে এ রকমের কেলেঙ্কারি কখনও শুনবে না।

সেইজন্যেই তো জানতে চাইছি।

বৃষপর্বা বললেন, এ কথা সত্য যে দেবগুরুর সুন্দরী স্ত্রী তারা তার পতির যজমান চন্দ্রের গৃহে নিজে থেকেই গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন, কোনও প্রয়োজন ছিল কিনা, দেবগুরু কোনও কাজের জন্যে পাঠিয়েছিলেন কিংবা চন্দ্র তাঁকে ডেকেছিলেন—এ সব গোপন কথা আমাদের জানা নেই। শৈশবে যখন আমরা এ সব কথা লুকিয়ে শুনেছি, তখন তা জানবার ইচ্ছা থাকলেও সে সুযোগ পাই নি। তবে এ কথা জেনেছিলাম যে দুজনে দুজনকে দেখে রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এক সঙ্গে বাস করছিলেন।

তারপর ?

দেবগুরু ব্যাপারটা জানতেন, না পরে জানতে পেরেছিলেন, তা আমরা জানতে পারি নি। কিন্তু দিন কয়েক অপেক্ষা করবার পর পত্নীকে স্বগৃহে আসবার জন্য এক শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন।

তারা ফিরে এলেন তো ?

না।

কেন ?

তিনি চন্দ্রের এমন বশীভূত হয়েছিলেন যে সেই শিষ্যের সঙ্গে পতি গৃহে ফিরলেন না।

সে কি !

বৃষপর্বা সহাস্যে বললেন, তারার বয়স নিশ্চয়ই খুব কম ছিল এবং দেখতে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। তাই দেবগুরু তারাকে ফিরে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠলেন।

কী করলেন তিনি ?

চন্দ্রের নিকটে বার বার শিষ্যদের পাঠাতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত লজ্জা সরম ত্যাগ করে নিজেই গিয়ে উপস্থিত হলেন। চন্দ্রকে ডেকে বললেন, আমার স্ত্রীকে তুমি নিজের গৃহে এত দিন আটকে রেখেছ কেন ? আমি তোমার গুরু, কী বলে তুমি তোমার গুরুপত্নীকে উপভোগ করছ ?

মহারানী বললেন, ছি ছি, এই রকম কথা তিনি বলতে পারলেন ! চন্দ্র কী উত্তর দিলেন তাঁকে ?

চন্দ্র বললেন, দিন কয়েক তিনি এখানে আছেন, তাতে কী ক্ষতি হয়েছে ! তাঁর ইচ্ছে হলেই তিনি আপনার গৃহে ফিরে যাবেন। আর উপভোগের

কথা বলছেন! আপনার শাস্ত্রমতে তো ব্যভিচারদুষ্ট স্ত্রী রজঃসঞ্চারেই পরপুরুষ সংসর্গের দুষ্কৃতি থেকে মুক্তি লাভ করে। এসবের জন্যে আপনি ভাবছেন কেন!

চন্দ্র এই রকমের উত্তর দিতে পারলেন!

আর এই উত্তর শুনে দেবগুরু সুড়সুড় করে সেখানে থেকে কেটে পড়লেন।

কেন?

উপায় নেই তো। তাঁর কেলেঙ্কারির কথাও তো জানাজানি হয়ে গেছে। তাই এ সব চোরের কিল।

তারপর?

দেবগুরু আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করলেন, তারপর বিরহে কাতর হয়ে আবার গেলেন চন্দ্রের কাছে। কিন্তু দ্বারপাল তাঁকে চন্দ্রের বাড়ি ঢুকতে দিল্ না, আর চন্দ্রও গুরু এসেছেন জেনেও অন্তঃপুর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বৃহস্পতি ডাকাডাকি শুরু করলেন এবং শেষে বললেন, আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে না দিলে আমি তোমাকে শাপ দেব। বটে! বলে চন্দ্র বেরিয়ে এসে বললেন, এ সব কী অপলাপ করছেন! আপনি তো জানেন যে তারার মতো সুন্দরী আপনার মতো কদাকার লোকের স্ত্রী হবার যোগ্য নন। আর তিনি এই রূপ নিয়ে আপনার মতো এক ভিক্ষুকের গৃহে থাকবেনই বা কেন! তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরে যান, আর নিজের মতো কোন কুরূপা কন্যাকে নিয়ে ঘর করুন। আর আমাকে শাপের ভয় দেখাচ্ছেন কী! আপনি এখন কাম ও ক্রোধের বশ, আপনার অভিশাপে আমার কোন ক্ষতি হবে না।

মহারানী সবিস্ময়ে বললেন: চন্দ্র গুরুকে এই রকম কথা বলতে পারলেন!

বৃষপর্বা বললেন, বলেছেন বলেই তো জানি। দেবগুরুও বোধহয় ভাবতে পারেন নি যে চন্দ্র এই রকমের কথা বলতে পারে। তাই কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে থেকে বললেন, আমার স্ত্রীকে তুমি তাহলে ফিরিয়ে দেবে না?

চন্দ্র অম্লান বদনে বললেন, না। আপনার যা ইচ্ছে, আপনি তাই করতে পারেন। বৃহস্পতি রেগে মেগে বললেন, বেশ, তোমাকে আমি শিক্ষা দিচ্ছি। বলে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন।

বলতে লজ্জা করল না ?

না বলেই বা উপায় কী !

কী করলেন ইন্দ্র ?

ইন্দ্র তার পূজা করে বললেন, গুরুদেব, আপনি আর ভাববেন না। আমাকে যখন বলেছেন, তখন আমি এর প্রতিবিধান করব। বৃহস্পতি বললেন, কী করবে তুমি ? ইন্দ্র বললেন, আমি এখুনি তার কাছে দূত পাঠাচ্ছি। সে আপনার স্ত্রীকে ফিরিয়ে না দিলে দেব সৈন্য নিয়ে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করব। বৃহস্পতি খুশি হয়ে বললেন, তাহলেই তার শিক্ষা হবে।

তারপর ?

কথা মতো ইন্দ্র একজন দূত পাঠালেন চন্দ্রের কাছে। দূত এসে চন্দ্রকে বলল, আমার ওপর আপনি রুষ্ট হবেন না, আমার প্রভু ইন্দ্র আমাকে যা বলতে পাঠিয়েছেন আমি সেই কথাই আপনাকে বলছি। তিনি বলেছেন, আপনি ব্রহ্মর্ষি অত্রির পুত্র, ধর্মজ্ঞ। কোন নিন্দিত কাজ করা আপনার উচিত নয়। নিজের স্ত্রী থাকতে আপনি কেন গুরুপত্নী সম্ভোগ করতে চান ? পরকীয়া সম্ভোগের বাসনা থাকলে আপনি অপ্সরাদের উপভোগ করুন। তাই তিনি বলেছেন যে দেবতাদের মধ্যে যাতে বিরোধ না হয়, তার জন্যে আপনি গুরুপত্নীকে পরিত্যাগ করুন।

কী উত্তর দিলেন চন্দ্র ?

দূতের মুখে এই কথা শুনে চন্দ্র বেজায় রেগে গেলেন, বললেন, ইন্দ্র দেবতাদের রাজা, তিনি আমাকে উপদেশ দেবেন বৈকি। তবে তাঁকে আমি একটি প্রশ্ন করি। নিজের কথা তিনি ভুলে যাচ্ছেন কেমন করে ? তিনি কি গৌতমের স্ত্রীর সঙ্গে এই কাজ করেন নি ? না দেবগুরু নিজে তাঁর ভাইএর স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে কিছু করেন নি ? কী করে তিনি আশা করেন যে তাঁর নিজের স্ত্রী, এ সব কথা জেনেও তাঁর অনুরাগী থাকবেন ! দেবরাজকে তুমি বোলো যে সংসারে সবই প্রবলের ভোগ্য, দুর্বলের নয়। নির্বোধেরাই ভাবে যে এটি আমার আর এটি অন্যের। আর দেবগুরুকে জানিয়ো যে তাঁর শাস্ত্রের কথা আমরা জানি। তিনিই বলেছেন যে সকামা স্ত্রী উপভোগে কোন দোষ নেই। কাজেই তাঁর স্ত্রী স্বেচ্ছায় না গেলে আমি তাকে ফিরিয়ে দেব না।

মহারানী আশ্চর্য হয়ে বললেন, এই রকমের কথা চন্দ্র বলতে পারলেন !

নিশ্চয়ই বলেছিলেন, তা না হলে ঐ রকমের একটা ঘোরতর যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা হয়েছিল কেন!

যুদ্ধ!

হ্যা যুদ্ধই তো! আর আমরাও সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছিলাম।

মহারানী বললেন, এ ঘটনা আমার জানা নেই।

বৃষপর্বা বললেন, আমি বলছি তোমাকে।

দানবরাজ বৃষপর্বা তাঁর মহিষীকে তারা হরণের উপসংহার বলছিলেন। তিনি বললেন: দূতের মুখে চন্দ্রের উত্তর শুনে দেবরাজ ইন্দ্র রাগে জ্বলে উঠে বললেন, এত অহঙ্কার হয়েছে চন্দ্রের! গুরুদেবের স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিতে বললাম, আর সে দিয়েছে এই রকমের উত্তর! এর সমুচিত শিক্ষা তাকে দিতে হবে। বলে তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার আদেশ দিলেন সেনাপতিকে।

মহারানী বললেন, চন্দ্রেরও কি সৈন্য-সামন্ত আছে নাকি?

বোধহয় নেই। তাই আমার বিশ্বাস যে ভয় পেয়ে চন্দ্র বোধহয় আমাদের আদিগুরুর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। দুই গুরুর মধ্যে বিদ্বেষ তো ছিলই। তাই আমাদের গুরু চন্দ্রকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমার ভয় নেই, আমি তোমাকে সাহায্য করব। বলে তিনি দৈত্য ও দানবদের বললেন যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে, চন্দ্রের পক্ষ নিয়ে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। ব্যস, আর কথা নেই। দু দলের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

মহারানী বললেন, এ তো দেবতাদের নিজেদের বিরোধ! এই বিবাদের মধ্যে আদিগুরু আমাদের জড়ালেন কেন?

মহারাজা বললেন, আমার অনুমান, এর মধ্যে একটা কূটনীতি ছিল।

কী রকম?

চন্দ্রের সাহস দেখে মনে হয় যে তার শক্তির অভাব ছিল না, অর্থাৎ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শক্তি ছিল বলে তিনি মনে করতেন। এর মানে যে দেবতাদের অনেকেই ছিলেন তাঁর পক্ষে এবং তিনি দৈত্য-দানবদের সাহায্য পাবেন বলে আশা করতেন।

কেন?

ইন্দ্র আমাদের সঙ্গে চিরকালই শত্রুতা করেছে। কাজেই ইন্দ্রের বিপক্ষে যোগ দিতে আমাদের কোন আপত্তি না হবারই কথা। এই তো রাজনীতি। ইন্দ্র পরাজিত হলে চন্দ্র হবেন দেবরাজ, আর আমাদের সঙ্গে মিত্রতা হবে

তার। তাই ভবিষ্যতে দেব দানবের যুদ্ধ আর হবে না, এই আশাতেই আদি-গুরু বোধহয় চন্দ্রের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

যুদ্ধের ফলাফল কী হল ?

বৃষপর্বা বললেন, আগে যুদ্ধের উদ্যোগটা শোন, তারপর ফলাফলের কথা শুনবে।

বল।

আমরা চন্দ্রের পক্ষ নিচ্ছি শুনে ইন্দ্র ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর দূত ছুটল কৈলাসে মহাদেবের কাছে। বিষ্ণুর আগে তাঁকে হাত করা দরকার। তাঁর আবার নিজের মতামত আছে। অসুররা তাঁকে হাত করতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না।

মহারানী সভয়ে বললেন, কী করলেন তিনি ?

বৃষপর্বা বললেন, চন্দ্র গুরুপত্নী হরণ করেছেন শুনে তিনি ইন্দ্রের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, যে অন্যায় করেছে তার পক্ষ তিনি সমর্থন করবেন না।

ন্যায্য কথা

এদিকে পিতামহ ব্রহ্মার কাছেও ইন্দ্রের দূত গিয়েছিল, বিষ্ণুকে বুঝিয়ে বলার জন্যে। তাঁকে এও বলা হয়েছিল যে অসুররা চন্দ্রের পক্ষ নিয়েছে। ব্যাপারটা মারাত্মক হবে বলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে না গিয়ে একাই ছুটে এলেন। এসে দেখলেন যে দু পক্ষই যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহাদেবও আসছেন তার সেনাবাহিনী নিয়ে।

সর্বনাশ !

তারকের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কথা শুনেছ তো ! তিনি যুদ্ধে নামলে আর কারও রক্ষা নেই। এই অবস্থায় পিতামহ এসে উপস্থিত হলেন, বললেন, দাঁড়াও, এক পা-ও কেউ এগোবে না। তারপর চন্দ্রকে ডেকে বললেন, যদি নিজের মঙ্গল চাও তো গুরুপত্নীকে ফিরিয়ে দাও এখুনি। মহাদেব আসছেন, আর বিষ্ণুর কাছেও আমি খবর পাঠিয়েছি।

তারপর ?

আমাদের আদিগুরুই চন্দ্রের ভরসা, তাই চন্দ্র তাঁর দিকে চাইতেই ব্যাপারটা পিতামহ আন্দাজ করতে পারলেন। আদিগুরুকে কাছে ডেকে বললেন, তোমার এই কাজ। তুমি না ভৃগুর পুত্র। দৈত্যদের গুরু হয়েছ তুমি।

তোমার এই অধর্মে মতি কেন। কোন্ সঙ্গদোষে তুমি এদের ওস্কাচ্ছ। পিতামহর ভর্ৎসনা শুনে আদিগুরু লজ্জায় মাথা নিচু করে চন্দ্রকে বললেন, মহর্ষি অত্রি তোমার পিতা, তিনিও তোমার এই কাজ সমর্থন করবেন না। কাজেই যুদ্ধ না করে পিতামহর কথা মতো গুরুপত্নীকে ফিরিয়ে দাও।

ফিরিয়ে দিলেন ?

চন্দ্র বুঝলেন যে ফিরিয়ে না দিয়ে আর উপায় নেই। তাই তারাকে এনে বৃহস্পতিকে দিলেন ফিরিয়ে। যুদ্ধ আর হল না, যে যার ঘরে ফিরে গেল।

মহারানী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাঁচা গেল।

কিন্তু বৃষপর্বা হেসে বললেন, অত সহজে বাঁচা যায় না।

কেন ?

দেখছ না আমাদের প্রায় একশো বছর হতে চলল, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না। কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছি না আমরা!

কিন্তু তারাকে নিয়ে তো আর যুদ্ধের সম্ভাবনা রইল না!

মজা তো সেইখানেই। তারাকে নিয়েই আবার যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠেছিল।

আবার তারা হরণ!

বৃষপর্বা সহাস্যে বললেন, না, তারা হরণ নয়, তারা হরণের ফল। যথা-সময়ে তারা একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন এবং দেবগুরু বৃহস্পতি তার জাতকর্ম সম্পন্ন করেছিলেন প্রসন্ন মনে। কিন্তু চন্দ্র এই সংবাদ পেয়ে বৃহস্পতির কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, এই পুত্র আমার। বৃহস্পতি বললেন, পুত্র যখন দেখতে আমারই মতো, তখন সে আমারই পুত্র। চন্দ্রের দূতকে তিনি ফিরিয়ে দিলেন।

মহারানী আশ্চর্য হয়ে বললেন, কার সন্তান তা ঠিক করবার জন্যেও যুদ্ধ!

বৃষপর্বা বললেন, আগে শোন সমস্ত ব্যাপারটা।

বল।

দেবতা ও দৈত্যরা আবার এল যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ করবার আগে তারা মন্ত্রণা করতে বসল।

মহারানী বললেন, মন্ত্রণা করে কি এ সব ব্যাপারের মীমাংসা হয় ?

যুদ্ধ করবার ইচ্ছা থাকলে মীমাংসার দরকার কী! একটা গোলমাল বাধিয়ে যুদ্ধ বাধালেই হল। একটা যুদ্ধের জন্যে ছটফট করছিল সবাই।

ভাবল, আগের সুয়োগটা তো নষ্ট হয়েছে, এবারে কেউ এসে পড়বার আগেই যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া যাক।

যুদ্ধ হল?

না, তার আগেই পিতামহ ব্রহ্মা খবর পেয়ে ছুটে এলেন। বললেন, থামো তোমরা, আমি এর বিহিত করছি। বলে তারাকে ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে সত্যি কথা বলতো, ছেলেটি কার? তারা লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলেন। পিতামহ বললেন, আমার কাছে লজ্জা কোরো না, সত্যি কথা বল। তারা কোন রকমে বললেন, চন্দ্রের। ব্যস, ফয়সালা হয়ে গেল। ব্রহ্মা এই কথা দু-পক্ষকে জানাতেই চন্দ্র পেয়ে গেলেন সেই ছেলে। তার নাম দিলেন বুধ। এই বুধেরও গল্প আছে—কী করে চন্দ্র বংশের আরম্ভ হল, সেই গল্প।

সে গল্প শোনাবে না?

আজ থাক, আজ আমাকে গুরুদেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে দাও। হ্যাঁ, কোন্ প্রসঙ্গে যেন আমি এই গল্প বলছিলাম?

মহারানী বললেন, মনে পড়েছে। বৃহস্পতির পুত্র কচ এমন সুপুরুষ হলেন কী করে।

বৃষপর্বা বললেন, বয়স হয়েছে বলে আজকাল ভুলে যাই অনেক কথা। কচের রূপের কথায় তারার কথা এসেছিল। মনে হয়, মাতৃকুল থেকেই সে এই রূপ পেয়েছে। তাকে দেখে এসে বলব তোমাকে।

বলে বৃষপর্বা তাঁর রাজবেশ ত্যাগ করবার জন্য উঠে গেলেন।

তিনি তাঁর রাজবেশ ত্যাগ করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করলেন, গলায় নিলেন উত্তরীয়। রথে আরোহণ করে সারথিকে বললেন দৈত্যগুরু শুক্রের আশ্রমের দিকে অগ্রসর হতে। পিছনে শকটে আরোহণ করে চলল কিছু মিত্র, পদব্রজে অগ্রসর হল সেনাবাহিনীর কয়েকজন। কিন্তু রাজা আশ্রম থেকে অনেকটা দূরে রথ থামিয়ে অবতরণ করলেন। বাকি পথ তিনি পদব্রজে যাবেন। রাজার দম্ভ নিয়ে তিনি গুরুর আশ্রমে আসতে চান না, তাই কেউ তাঁর আগমন বার্তা ঘোষণা করল না।

দৈত্যগুরু শুক্র তখন নির্জনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। বৃষপর্বা সেখানে গিয়ে

তাঁর ধ্যানভঙ্গ করতে চাইলেন না। তিনি ধীর পদক্ষেপে আশ্রমের কুটিরের দিকে এগিয়ে যেতেই দেবযানী বেরিয়ে এল। স্মিত হাস্যে অভিনন্দন জানাল তাঁকে, সখী শর্মিষ্ঠার কথা জানতে চাইল। তাকে না আনার জন্য অনুযোগ জানাল। বৃষপর্বা বললেন, তাকে দেখতে পেলে নিশ্চয়ই সঙ্গে আনতাম। সে বোধহয় প্রমোদ উদ্যানে খেলা করছে তার সঙ্গীদের সঙ্গে।

তারপর প্রশ্ন করলেন, তুমি আজ গেলে না কেন?

দেবযানী বলল, পিতার নতুন শিষ্য এসেছে ইলাবৃত বর্ষ থেকে। তারই সৎকারের জন্য আমার যাওয়া হল না।

কোথায় সে?

আহারান্তে বিশ্রাম করছে আর সকলের সঙ্গে। তাকে ডাকব?

না থাক।

তবে কি পিতাকে সংবাদ দেব?

রাজা বললেন, হ্যাঁ, তার কাছেই আমি এসেছি।

আপনি বসুন।

বলে রাজাকে একটি আসন এনে দিল উপবেশনের জন্য। পাদ্য অর্ঘ দিল। তারপর পিতাকে ডাকতে গেল।

রাজা এসেছেন!

বলে দৈত্যগুরু অবিলম্বে চলে এলেন। রাজা উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করলেন তাঁকে। দৈত্যগুরু তাঁকে আশীর্বাদ করে তাঁর সামনে মুখোমুখি হয়ে বসলেন। বললেন, আমার সঙ্গে কি কোন প্রয়োজনীয় কথা আছে? তাহলে আমাকে ডেকে পাঠালেই চলত।

বৃষপর্বা বললেন, প্রয়োজন আমার গুরুদেব। তার জন্য আপনাকে আমি কষ্ট দেব কেন?

দৈত্যগুরু বললেন, কষ্টের জীবনেই তো আমরা অভ্যস্ত। সুখে অভ্যস্ত হতে চাই নে।

রাজা বললেন, কষ্টের অভ্যাস আমাদেরও থাকা দরকার। আর একে কষ্ট ভাবছেন কেন। কাজকে কষ্ট ভাবলেই তা কষ্ট, তা না হলে কোন কাজই কষ্টের নয়। বরং সব কাজে আনন্দ আছে, এই কথাই আমাদের সব সময়ে মনে রাখা দরকার।

দৈত্যগুরু বললেন, তুমি প্রবীণ হয়েছ, তাই এই সত্য জেনেছ অভিজ্ঞতায়।

এ যুগের ছেলেমেয়েকে কি এই কথা শেখাতে বা বোঝাতে পারবে। তারা শ্রম স্বীকার করে কিছু শিখতে বা জানতে চায় না, যা অনায়াস লভ্য তাই নিয়েই তারা সন্তুষ্ট।

রাজা বললেন, এটা বয়সের ধর্ম, বয়স হলে তারাও বুঝবে।

দৈত্যগুরু বললেন, এইবারে তোমার কথা বল।

রাজা বললেন, আমার অমাত্যরা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন নয়, পর রাজ্যের সঙ্গে কী ভাবে মৈত্রী রক্ষা করে চলতে হয়, সেই নীতি এদের অজ্ঞাত।

আরএকটু খুলে বল।

সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের রাজ্যের চারি দিক ঘিরে ছোট বড় আকারের অনেক রাজ্যের উদ্ভব হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্র বংশের রাজারা তাঁদের রাজ্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছেন বলেই এই রকম হচ্ছে। এতে রাজ্যগুলিও দুর্বল হচ্ছে, পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করে চলাও কঠিন হচ্ছে। পূর্বে ইন্দ্রকেই আমরা একমাত্র শত্রু বলে ভাবতাম, এখন আমরা চারিদিকেই শত্রু বেষ্টিত। সব দিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। অথচ আমার অমাত্যরা তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয়।

আজ হঠাৎ এই কথা তোমার কেন মনে এসেছে?

বৃষপর্বা বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন গুরুদেব, আজ হঠাৎ এই কথা ভাববার একটু হেতু আছে। আমি জেনেছি যে ইলাবৃত বর্ষ থেকে আজ আপনার কাছে এসে পৌঁচেছে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেই সে এসেছে। সে এসে পৌঁছবার আগে চরদের মুখে আমরা জেনেছিলাম যে দেবযানীকে নিয়ে যাবার জন্য কেউ আসছে। অথচ এখন জানা যাচ্ছে যে দেবযানীকে নিয়ে যাবার জন্য নয়, সে এসেছে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আপনার সমস্ত বিদ্যা নিয়ে ফিরে যাবার জন্য।

রাজা থামতেই দৈত্যগুরু বললেন, বলে যাও।

আমরা ভুল সংবাদ পেয়েছিলাম। আর তার গতিবিধির উপরে আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এতে ক্ষতি না হলেও আমার মনে হচ্ছে যে পররাজ্যের চররাও এই ভাবে আমাদের রাজ্যে যদৃচ্ছ বিচরণ করে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে। কোন শত্রু এই রাজ্য আক্রমণের ইচ্ছা করলেও যথাসময়ে আমরা তা জানতে পারব না। আমার অমাত্যরা অনভিজ্ঞ বলেই এই রকম সম্ভব হতে পারে।

দৈত্যগুরু এক মুহূর্ত নীরবে থেকে বললেন, তুমি কী চাও ?

আগামী কাল আমি আমার অমাত্যদের একত্র হতে বলেছি। আপনার যদি অসুবিধা না থাকে, তবে আপনি তাদের রাজনীতি বিষয়ে কিছু উপদেশ দিন।

রাজনীতি রাজার নীতি। রাজ্য রক্ষার জন্য তিনি যা করতে চান, তাই হল রাজার নীতি বা রাজনীতি। এই নীতি কী রকম হলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই মঙ্গল হয়, তা চিন্তা সাপেক্ষ, বিচার সাপেক্ষও। কোন বিশেষ ব্যাপারে রাজা কোন্ নীতি গ্রহণ করবেন, তা নির্ধারণের জন্য তিনি অমাত্যদের সঙ্গে মন্ত্রণা করবেন, কিন্তু নীতি নির্ধারণ করবেন একান্তভাবে নিজে। সেই নীতির কথা কাকপক্ষীতেও জানতে পারবে না, এই রকমের গোপনীয়তার দরকার। এত দিন তুমি কিছু জানতে চাও নি বলেই আমি কিছু বলি নি। অযাচিতভাবে কাউকে উপদেশ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু তুমি যখন জানতে চাইছ তখন নিশ্চয়ই বলব। তবে এই রাজনীতির প্রথম ধাপটিই তোমার অমাত্যদের প্রয়োজন হবে, দ্বিতীয় ধাপ তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেটা তাদের জানা উচিত নয়।

বৃষপর্বা বললেন, তাই হবে গুরুদেব। কাল প্রাতঃকালে আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। অমাত্যদের উপদেশ দেবার পরে আপনি নিভৃতে আমাকে উপদেশ দেবেন।

এই বলে রাজা উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দৈত্যগুরু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে।

বলুন, গুরুদেব।

তুমি জানো যে দেবগুরুর পুত্র কচ দুর্গম পথ অতিক্রম করে আমার কাছে এসেছে বিদ্যালাভের জন্য। আমি বিশ্বাস করি যে তার কোন দুরভিসন্ধি নেই; কিন্তু যারা তাকে এখানে পাঠিয়েছে, তাদের থাকতে পারে। কচের পিতা যাদের গুরু, তারা তোমাদের চির শত্রু। অকারণে তারা তোমাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করেছে। কখন কী উদ্দেশ্যে তারা কী করছে বা করতে চাইছে, তা আমরা সব সময়ে বুঝতেও পারি না। এই ক্ষেত্রে কচকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করব কিনা তাই আমি ভাবছিলাম। তোমার মনে কোন দ্বিধা আছে ?

বৃষপর্বা বললেন, আপনার ওপরে আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা আছে।

আপনি যা ভাল মনে করবেন, তাই করবেন।

দৈত্যগুরু বললেন, তোমাদের মঙ্গলের জন্য তাকে আমার শিষ্য রূপে গ্রহণ করাই উচিত।

আমাদের মঙ্গলের জন্য!

হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাকে গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দেওয়া মানেই ইন্দ্রকে অপমান করা। দেবগুরুর অপমান তারই অপমান। অবিলম্বে সে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসবে।

কিন্তু শিষ্য রূপে গ্রহণ করলে?

সমস্ত বিদ্যা তাকে দান করতে হবে, এমন কোন দায় আমার নেই।

আপনি ঠিকই বলেছেন গুরুদেব।

দৈত্যগুরু বললেন, আর বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান না করলে আমার অধর্ম হবে, বিশেষ করে যে বিদ্যার্থী সরল অন্তঃকরণে এই দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে এসেছে বিদ্যালাভের জন্যে।

রাজা বললেন, তাকে আমি একবার দেখতে পাব গুরুদেব?

নিশ্চয়ই।

বলে তিনি দেবযানীকে ডেকে কচকে ডাকতে বললেন।

কচ এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল তাদের সামনে। দুটি হাত অঞ্জলিবদ্ধ তার বুকের কাছে, চোখ ভূমিতে নিবদ্ধ।

দৈত্যগুরু বললেন, দানবরাজ বৃষপর্বাকে অভিবাদন কর কচ, তুমি এঁরই রাজ্যে এসেছ বিদ্যালাভের জন্য।

কচ রাজাকে অভিবাদন করলে তিনি বললেন, কল্যাণ হোক তোমার।

বলে দৈত্যগুরুর নিকটে বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালেই কয়েকজন পাত্র মিত্র রথ ও শকট নিয়ে এলেন দৈত্যগুরু শুক্রকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য। দৈত্যগুরু তখন শিষ্যদের নিয়ে একটি বৃক্ষ মূলে বসে ছিলেন। রাজার অনুচরদের আসতে দেখে তিনি বললেন, আজ তোমরা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা কর, আমাকে রাজার নিকটে যেতে হবে।

একজন শিষ্য বলল, কী আলোচনা করব?

দৈত্যগুরু এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, কচ ইলাবৃত বর্ষ থেকে অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছে। তার অভিজ্ঞতার কথা শোন। দেবযানী কোথায় ?

সে বোধহয় এখনও গৃহকর্ম নিয়ে ব্যস্ত আছে।

তাকেও ডেকে নিও। সেও শুনুক কচের অভিজ্ঞতার কথা।

বলে তিনি উঠে পড়লেন। রাজার অনুচরেরা তাঁর কাছে এসে প্রণাম করেছিল। তিনি বললেন, আমারই ভুল হয়েছে। রথ ও শকট যে আমি চাই নে, সে কথা মহারাজকে কাল বলা হয় নি। এ সব যান আমার জন্য নয়, তোমরা ফিরে যাও। আমি পদব্রজে যাব।

অনুচরেরা বলল, আমরা আপনার সঙ্গেই যাব।

বেশ।

বলে দৈত্যগুরু আগে আগে চললেন। তারা তাঁর পিছনে চলল।

শিষ্যরা তাঁদের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপরে একজন কুটিরের দিকে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, দেবযানী!

দেবযানী বেরিয়ে এসে বলল, কেন ডাকছ ?

গুরুদেব তোমাকে আমাদের কাছে এসে বসতে বলেছেন, কচ আজ তার অভিজ্ঞতার কথা আমাদের বলবে।

দেবযানী বলল, আমার যে এখনও গৃহকর্ম বাকি আছে!

আমরা তোমাকে সাহায্য করব।

বেশ, তাহলে আমি অগ্নিহোত্রে কাঠ দিয়ে আসছি।

বলে ভিতরে গিয়েই বেরিয়ে এল অল্পক্ষণ পরে। তারপর শিষ্যদের সঙ্গে এসে বসল কচের কথা শোনবার জন্যে। সবাই বলল, বল এই বারে।

কচ বলল, এখানে আমার খুব ভাল লাগছে।

কেন ?

এই উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আমি আন্তরিকতার স্পর্শ পাচ্ছি।

একজন বলল, এই আবহাওয়াকে তুমি উষ্ণ বলছ ?

হ্যাঁ। গ্রীষ্মেও আমাদের আবহাওয়া এর চেয়ে শীতল।

তবে হিম ঋতুতে কেমন ?

অত্যন্ত কষ্টের। ঘরের বাইরে আমরা বেরোতে পারি নে, তুষারে মগ্ন হয়ে যায় চারি দিক। তবে এই তুষারপাত বেশি দিন হয় না বলেই রক্ষে।

প্রতি বছরও হয় না। আমরা একটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অন্বেষণ করছি।

আশ্চর্য হয়ে একজন বলল, নিজেদের দেশ ছেড়ে তোমরা চলে আসবে!

উপায় কি বল। বাঁচবার জন্যে অনেক কষ্টই তো স্বীকার করতে হয়। দেশ ছাড়তে পারব না কেন!

দেবযানী বলল, তুমি কি আবার তোমার দেশে ফিরে যাবে?

কচ হেসে বলল, চিরকাল থাকবার জন্যে তো আসি নি।

সবাই মেনে নিল এই কথা, বলল, সত্যিই তো। তোমার আত্মীয় পরিজন ছেড়ে তুমি এখানে চিরকাল থাকবে কেন!

একজন বলল, এবারে তোমার পথের কথা বল।

বাধা দিয়ে দেবযানী বলল, না, তার আগে তোমার দেশের কথা বল। তোমাদের দেশ কি এই রকম নয়? এ রকম গাছপালা নদী নির্ঝরণী নেই? শুধু শীত আর বরফ?

কচ বলল আমরা যেখানে বাস করি, তার নাম মেরু পর্বত। সূর্যের উদয় দেখি, অস্তও দেখি সেখান থেকে। দেবরাজ ইন্দ্র যেখানে বাস করেন, সে জায়গার নাম অমরাবতী, তার চারিদিক ঘিরে আছেন লোকপালরা। শীতের দিনে যজ্ঞ হয় নানা রকম—পশুমেধ যজ্ঞ, সোমযজ্ঞ।

সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কচ বলল, সোম জানো?

না।

এক রকমের লতা, কিন্তু ভারি মিষ্টি তার রস। পাহাড়ের গায়ে আমরা এই লতা পাই। কিন্তু তা চিবিয়ে খেতে নেই। এই লতা খুব পবিত্র তো, তাই এই লতা পিসে রস করবার অনেক নিয়ম কানুন আছে। পাথরে পিষে মেষলোমের ছাঁকনিতে ছেঁকে চামড়ার কলসীর মধ্যে জমিয়ে রাখতে হয়। সোম যজ্ঞের সময়ে এই সোমরস পানের নিয়ম। সেদিন দেবরাজ ইন্দ্র আসবেন, বড় বড় দেবতারা আসবেন। তারা সেই সোমরস পান করবেন।

তোমরা?

না।

কেন?

সোমরস পান করার অধিকার সবার নেই। দেবরাজ ইন্দ্র যাদের এই অধিকার দিয়েছেন, তারাই শুধু সোমরস পান করবেন। অশ্বিনীকুমারদের নাম শুনেছ?

না।

তারা হলেন দেবতাদের বৈদ্য। খুব নাম ডাক তাদের। অন্ধকে দৃষ্টি দিতে পারেন, খঞ্জকে চলার ক্ষমতা। বৃদ্ধকে যুবাও করতে পারেন। কিন্তু তবু দেবরাজ ইন্দ্র তাদের সোমরস পানের অধিকার দেন নি।

শিষ্যদের একজন বলল, এ তো অন্যায়।

কেন?

আমাদের গুরুদেব বলেন, অপরকে বঞ্চিত করে নিজে কিছু ভোগ করবে না। ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে। তবে এ কাজটা কঠিন। সবই যদি ত্যাগ করলাম, তবে আর ভোগ করব কী!

কচ বলল, সবই ত্যাগ করবে কেন! সবাইকে দিয়ে থুয়ে ভোগ করবে, তিনি বোধহয় এই কথাই বলেন।

অন্যেরা বলল, এইটেই ঠিক।

দেবযানী বলল, কিন্তু আমার এ কথা ভাল লাগে না।

কেন?

ভোগের জিনিস অন্যকেই যদি দিয়ে দিলাম, তবে নিজের কী রইল? নিজে যদি ভোগ করতে না পারলাম, তবে অপরের ভোগ দেখে আনন্দ কোথায়!

কচ বলল, অপরের ভোগ দেখেও যে আনন্দ লাভ হয়, এইটেই আমাদের শিখতে হবে।

একটি দানব বালক বলল, ঠিক বলেছ। গুরুদেব আমাদের এই কথাই বলেন। তিনি বলেন যে নিজে ভোগ করে যে আনন্দ তা ক্ষণকালের, আর অপরের ভোগ দেখে চিরকালের আনন্দ লাভ হয়। তাই পরের জন্যই নিজের স্বার্থ ত্যাগ করবে। নিজে ভোগ করবে ত্যাগ দিয়ে।

দেবযানী বলল, এ একটা কথার কথা, কাজের কথা নয়।

কচ বলল, আমার তা মনে হয় না।

কেন?

বলে দেবযানী তার মুখের দিকে তাকাল।

কচ বলল, পথের একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে।

সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, বল সেই কথা।

এখানে আসবার পথে আমি মরে যাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম, মরেই গেছি।

কেন, কী হয়েছিল তোমার ?

ইলাবৃত বর্ষ থেকে একটি সরু গিরিপথের মধ্য দিয়ে তোমাদের এই হিমবর্ষে আসতে হয়। পিতা আমাকে এই পথের বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দুর্গম পথটুকু অতিক্রম করতে হবে। এ পথে জনমানবের বাস নেই, কোন আশ্রয় স্থল নেই, নেই কোন আহার্য দ্রব্য। তাঁর নির্দেশ মতো অতি দ্রুত বেগে এই পথটুকু আমি অতিক্রম করেছিলাম। কিন্তু—

বলে কচ থামতেই দেবযানী বলল, কোন দুর্ঘটনা ঘটল পথে ?

না।

তবে ?

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়েছিলাম আমি। ক্ষুধার চেয়েও তৃষ্ণা পেয়েছিল বেশি। পাহাড়ে জল খুঁজতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তারপর ?

তারপর! জল নেই, আহার নেই, আশ্রয় নেই। শুধু পাহাড় আর শীতার্ত বাতাস। এই সময়ে আকাশের মেঘ গর্জে উঠল, আর বৃষ্টির সঙ্গে বরফের কুচি ছেয়ে ফেলল আমাকে।

তারপর ?

কচ বলল, তার পরের কথা আমার আর মনে পড়ছে না। আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ছিলাম। কোথায় কী ভাবে কতক্ষণ পড়ে ছিলাম তা জানি না।

দেবযানী বলে উঠল, কে রক্ষা করল তোমাকে ?

কচের দু চোখের দৃষ্টি কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হল। বলল, জ্ঞান হবার পর আমি চোখ মেলে দেখলাম, কোন উষ্ণ শয্যায় আমি শুয়ে আছি।

একটি দানব বালক সবিস্ময়ে বলল, পাহাড়ে উষ্ণ শয্যা!

পাহাড়ে নয়, একটি গুহার ভিতরে এই শয্যা। সেই গুহায় আগুন জ্বলছিল, তারই উত্তাপ আমি পাচ্ছিলাম। আর চোখ মেলতেই এক বৃদ্ধ দম্পতি আমাকে গরম দুধ ও শুকনো মাংস খেতে দিয়েছিল। তাই খাবার পর আমি দেহে বল পেয়েছিলাম, বুঝতে পেরেছিলাম যে এ যাত্রায় আমি বেঁচে গেলাম। কিন্তু সেদিন রাতে তারা নিজেরা কী খেয়েছিল জানো ?

না।

কিছু না। একেবারে অনাহারে ছিল তারা।

কেন ?

তা ছাড়া কোন উপায় ছিল না তাদের। আমি না এলে তারা সেই খাদ্য দুজনে ভাগ করে খেত। দুজনের আহার আমি একা খেয়েছিলাম। তা জেনে শুনেই খেয়েছিলাম। না খেয়ে উপায় ছিল না। আমি জানতাম যে সেই খাদ্য না পেলে আমার জীবন সংশয় হত, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই আমি উপবাসী রেখেছিলাম তাদের। কিন্তু—

দেবযানী বলল, না না, থেমো না, বলে যাও তুমি।

কচ বলল, ক্ষুধার্ত জন্তুর মতো সেই খাদ্য আমাকে একা খেতে দেখে তাদের দৃষ্টিতে আমি কী দেখেছিলাম জানো ?

লজ্জা ? ঘৃণা ? বিদ্বেষ ?

না না, সে সব কিছু নয়। আমি তাদের দু চোখের দৃষ্টিতে দেখেছিলাম পরম পরিতৃপ্তি। কী অশেষ স্নেহ ও করুণা ঝরে পড়েছিল সেই দৃষ্টিতে। কত আনন্দ তারা পেয়েছিল তা আমি তোমাদের বোঝাতে পারব না।

তারপর ?

তোমাদের কথা শুনে আমার কী মনে হচ্ছে জানো ?

কী ?

একেই বোধহয় বলে ত্যাগ দিয়ে ভোগ। তাদের নিজের আহার আমার মুখে তুলে দিয়ে তারা বেশি আনন্দ পেয়েছিল। আমাকে বঞ্চিত করে নিজেরা খেয়ে তারা এই আনন্দের আস্বাদ পেত না।

তারপর বল।

প্রাতে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে আমি যাত্রা করেছিলাম। জেনেছিলাম যে তাদের একটি মেষ হারিয়ে গিয়েছিল বলেই সেই দুর্যোগে তারা ঘরের বাইরে বেরিয়েছিল। আর আমাকে দেখেছিল অচেতন অবস্থায়। বৃদ্ধ একা আমাকে বয়ে আনতে পারে নি। সে তার বৃদ্ধা স্ত্রীকে ডেকে এনেছিল। সেও সুস্থ ছিল না। দুজনে কোন রকমে ধরাধরি করে আমাকে গুহায় এনেছিল। আগুন জেলে উত্তাপ দিয়েছিল আমাকে, তারপর নিজেদের জন্য রক্ষিত সেই আহার্য দ্রব্য। আমাকে বিদায় দেবার পরও তারা কী খাবে জানে না। যে মেষটি দুধ দেয়, তাকেই তারা খুঁজে পায় নি। কোন ফল মূলের বৃক্ষ নেই, কোন কন্দ বা শষ্যকণা নেই। নিকটে কোন প্রতিবেশীও নেই যেখানে তারা কোন আহার্য প্রার্থনা করতে পারে।

দিনের আলোয় তাদের মেষ খুঁজে পেলে খানিকটা দুধ পাবে, আর শীতে প্রাণহীন কোন পশু দেখতে পেলে সেই মাংস সঞ্চয় করে খাবে কয়েক দিন ধরে।

কচের দু চোখ জলে ভরে গেল। বলল, এই অভাব, এই দারিদ্র্য আমরা ভাবতে পারি না। এই ভাবে এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে যে কেউ বেঁচে থাকতে পারে, তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না। আবার নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে এই কাহিনী বললে কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে না।

কেন?

নিজের মুখের গ্রাস কেউ পরকে তুলে দিতে পারে, এ আমাদের দেশে অবিশ্বাস্য। যাদের অনেক আছে, তারাও আমাকে এমন করে দেয় নি। প্রত্যাখ্যানও করেছে অনেকে। হিমবর্ষের প্রথম আতিথেয়তার কথা আমি কোন দিন ভুলতে পারব না।

একটি দানব বালক ইতস্তত করে বলল, তোমার বাবা মা তোমাকে এখানে আসতে দিলেন? এত দূর দেশে, এত কষ্ট করে?

কচ বলল, আমার বাবাই তো আমাকে পাঠালেন, বললেন, ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকলে কূপমণ্ডুক হবে ছেলে। সে গুরুগৃহে যাক, ব্রহ্মচর্য পালন করে গুরু ও তাঁর পরিবারের সেবা করুক, যত দিন বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ না হয় তত দিন সে গুরুগৃহে থাক। তারপর সমাবর্তন করবে। তখন সে গৃহী হবে কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করে।

দেবযানী বলল, তিনি তো দেবগুরু, তিনি তোমাকে আমার পিতার কাছে পাঠালেন কেন?

ইনি অনেক তপস্যা করেছেন, অনেক মন্ত্র জানেন ইনি। দেবতারাও এঁকে সম্মান করেন গুরুর মতো।

একজন বালক বলল, তাহলে তুমি একা এলে কেন? কেন তোমার সঙ্গে আর কেউ এল না?

কচ বলল, খুব ভাল হত তাহলে। আমার পথের কষ্ট কম হত। দীর্ঘ পথে সঙ্গীর বড় দরকার। সঙ্গীর অভাব আমি পদে পদে অনুভব করছিলাম।

এই সময়ে বৃক্ষের আড়ালে দেখা গেল কয়েকজন দৈত্যকে। দূর থেকে তারা লক্ষ্য করছিল কচকে। তাদের দৃষ্টিতে সন্দেহ ও সংশয়, আকস্মিক

তাদের এই আশ্রমের বনে আবির্ভাব। দেবযানী চমকে উঠেছিল তাদের দেখে। কিন্তু তারা এগিয়ে না এসে বনান্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর কোন বালক বোধহয় তাদের দেখতে পায় নি, দেবযানীও কাউকে কিছু বলল না। তবে একটা শঙ্কা তার মনে জাগল। তার পিতার অনুপস্থিতিতে কোন দৈত্য তো এই ভাবে তাদের আশ্রমে আসত না। আজ তারা কেন এসেছে! তার জন্য, না কচের জন্য! কী প্রয়োজন তাদের! এ ভাবে আত্মগোপন করল কেন! চিন্তায় অন্যমনস্ক হল দেবযানী।

দৈত্যগুরু শুক্রের অপেক্ষায় দানবরাজ বৃষপর্বা প্রাসাদের বাহিরেই পদচারণা করছিলেন। তাঁকে আসতে দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন এবং নিকটবর্তী হয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে। কিন্তু রাজার সঙ্গে তিনি রাজসভায় প্রবেশ করলেন না। বললেন, কোন নির্জন স্থানে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব, তারপর তোমার সভায় আসব।

রাজা বললেন, আপনি অন্তঃপুরে আসুন।

না, সেখানেও নয়।

তবে আসুন আমার সঙ্গে।

বলে একটি নিভৃত কক্ষে দৈত্যগুরুকে নিয়ে এলেন। শুক্র চারি দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে কাউকে দেখতে না পেয়ে বললেন, কয়েকটি কথা তোমাকে একান্তে বলবার জন্যেই এই নিভৃত স্থানে এসেছি। আশা করি, আমাদের আলাপ কারও শ্রুতিগোচর হবে না।

না, গুরুদেব, আমার আদেশ না পেলে এখানে কেউ আসবে না।

দৈত্যগুরু বললেন, মন্ত্রণার জন্যে এই রকমের একটি নির্জন স্থান নির্বাচন করবে। কালের পরিবর্তন হচ্ছে দ্রুত। এখন সকল অমাত্যকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে পুরুষানুক্রমে তোমাদের সেবক শাস্ত্রবিদ সৎকুলোদ্ভব ও পরীক্ষিত সাত-আটজন মন্ত্রী নিয়োগ করবে।

রাজা বললেন, তাই করেছি।

একান্ত গোপনীয় না হলে এই রকম মন্ত্রীদের সঙ্গে একেবারে নির্জন স্থানে সন্ধি ও বিগ্রহের মন্ত্রণা করবে। মন্ত্রণার স্থানে যেন মন্ত্রী ছাড়া আর

কেউ না থাকে। এমন কি জড় মূক অন্ধ বধির রুগ্ন বিকলাঙ্গ স্ত্রীলোক ম্লেচ্ছ এমন কি শুক সারিকাও অপসারিত করবে। এরা বিশেষত স্ত্রীলোক অপমানিত হলে মন্ত্রণা ভেদ করে থাকে। পররাজ্যে যেমন গুপ্ত ভাবে দূত প্রেরণ করতে হয়, তেমনি সখী দ্বারা অন্তঃপুরবাসিনীদেরও গতিবিধির উপরে নজর রাখা উচিত। নিজের নিয়োজিত গুপ্তচরের উপরেও নজর রাখতে হয়, বিশেষ ভাবে যাদের পররাজ্যে পাঠানো হয়েছে তাদের ওপর। অষ্টবিধ রাজকার্যের প্রতি, পঞ্চবিধ চরবর্গের প্রতি, পরিষদবর্গের অনুরাগ ও বিরাগের প্রতি এবং প্রজাদের মনোভাবের প্রতিও রাজা মনোযোগ দেবেন।

রাজা বললেন, অষ্টবিধ রাজকার্যের কথা আপনি বলেছিলেন, কিন্তু পঞ্চবিধ চরবর্গের কথা মনে পড়ছে না।

দৈত্যগুরু বললেন, কপটিক অর্থাৎ ছাত্রবেশে যে পরের মর্মকথা জানতে পারে, উদাস্থিত অর্থাৎ সন্ন্যাস থেকে পতিত, গৃহপতি-ব্যঞ্জন অর্থাৎ ক্ষীণবৃত্তি কৃষক, বৈদেশিক-ব্যঞ্জন অর্থাৎ ক্ষীণবৃত্তি বণিক এবং তাপস-ব্যঞ্জন অর্থাৎ যে মুণ্ডিত মস্তকে বা জটাধারী হয়ে বেড়ায়—এই পাঁচ রকম চরের দ্বারা বিভিন্ন রাজার ও অমাত্যের মনোভাব জানতে হবে। রাজা নিজে এই চর নিয়োগ করবেন এবং নিতান্ত গোপনে চরের মুখে সংবাদ সংগ্রহ করবেন। মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণার পূর্বে তাদের মতামত আলাদা আলাদা ভাবে জেনে নেবেন।

রাজা বললেন, আপনার এই উপদেশ আমার মনে আছে। এই ভাবে আমি দেখেছি যে একক ভাবে তারা যে মন্ত্রণা দেয়, তা সমবেত মন্ত্রণার অনুরূপ সব সময়ে হয় না। তারাও পরস্পরকে বিশ্বাস করে না বলেই সন্দেহ হয়।

দৈত্যগুরু বললেন, এই ভাবে মন্ত্রণায় তাদের বিশ্বস্ততার সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মে। উদাস্থিত অর্থাৎ সন্ন্যাস থেকে পতিত ও তাপস-ব্যঞ্জনকে চর নিযুক্ত করলে রাজার একটা সুবিধা এই যে তারা রাজার নিকটে নিয়মিত যাতায়াত করলেও সন্দেহের কারণ হয় না এইজন্য যে অনেকেই মনে করে যে এই প্রকার ব্যক্তির প্রতি রাজার কিছু অনুরাগ বা ভক্তি আছে। এরা মন্ত্রীদের সম্বন্ধেও সংবাদ সংগ্রহে সক্ষম হবে।

বলে দৈত্যগুরু গাত্রোত্থান করলেন।

বৃষপর্বা বুঝতে পারলেন যে তিনি এবার প্রকাশ্য মন্ত্রণা সভায় যাবেন। তাই তিনি অগ্রবর্তী হয়ে চললেন। রাজার মন্ত্রীবর্গ ও কয়েকজন প্রধান অমাত্য মন্ত্রণা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে দৈত্যগুরু শুক্রকে সম্বর্ধনা করলেন। শুক্র তাঁদের আসন গ্রহণ করতে বলে বললেন, কোন বিশেষ ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে কি ?

রাজা বললেন, না, তেমন কিছু নয়। আমরা মনে করছি যে আত্মরক্ষার ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট যত্নবান নই। এই বিষয়ে আমরা আপনার উপদেশপ্রার্থী।

শুক্র বললেন, প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট আচরণ-বিধি আছে। এই আচরণবিধি সর্ব প্রযত্নে মেনে চললে বিপদের আশঙ্কা কম থাকে।

আপনার কাছে আমরা পুনরায় তা শুনতে চাই।

প্রতিবেশী রাজাদের আচরণ অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় এবং তাদের প্রত্যেকের আচরণ লক্ষ্য করা দরকার। যেমন বিজিগীষু অর্থাৎ বিজয়ে ইচ্ছুক রাজার কার্যকলাপ, মধ্যম রাজার আচরণ, উদাসীন রাজার গতিবিধি এবং শত্রু রাজার আচরণের প্রতি সযত্নে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এরা মণ্ডলের মূল। এ ছাড়া মিত্র অরিমিত্র মিত্রমিত্র অরি মিত্র-মিত্র পার্ষ্ণিগ্রাহ আক্রন্দ পার্ষ্ণিগ্রাহসার ও আক্রন্দসার—এই আটকে প্রকৃতি বলা হয়। সব মিলিয়ে বারো।

বৃষপর্বা বললেন, এই সব নাম যদি বুঝিয়ে বলেন, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

তাই বলছি। বিজিগীষু রাজার রাজ্য-সংলগ্ন সম্মুখস্থ রাজা অরি, তার সংলগ্ন রাজ্য বিজিগীষুর মিত্র, তার সংলগ্ন রাজ্য অরিমিত্র, তার সংলগ্ন মিত্রমিত্র, তারপরেই অরি মিত্রমিত্র। বিজিগীষু রাজার পিছনে সংলগ্ন রাজ্যের রাজা পার্ষ্ণিগ্রাহ, তার সংলগ্ন রাজা আক্রন্দ অর্থাৎ বিজিগীষুর মিত্র, তার পিছনের রাজা পার্ষ্ণিগ্রাহসার অর্থাৎ অরিমিত্র এবং তার পিছনের রাজা আক্রন্দসার অর্থাৎ মিত্রমিত্র। এই বারোটি প্রকৃতির প্রত্যেকের অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, অর্থ ও দণ্ড এই পাঁচ দ্রব্য প্রকৃতি আছে। সব মিলিয়ে প্রকৃতি বাহাত্তরটি।

মন্ত্রীরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এই কথা শুনছিলেন এবং বোঝবার চেষ্টা

করছিলেন। কিন্তু অমাত্যদের মধ্যে দু একজনের চঞ্চলতা দেখে মনে হল যে তাঁরা এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারছেন না। বৃষপর্বা বললেন, এই সব রাজাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, তাই এবারে বলুন।

শুক্র বললেন, বিজিগীষু রাজার পরবর্তী রাজাকে ও অরিসেবী রাজাকে শত্রু বলে জানতে হবে। সহজ শত্রু রাজার অনন্তরবর্তী রাজাকে মিত্র এবং দুই প্রকৃতির বাহিরে অবস্থিত রাজাদের উদাসীন বুঝতে হবে। এই সব রাজাকে সাম দান ভেদ ও দণ্ডের যে কোন উপায়ে কিংবা পুরুষকারে বশীভূত করতে হবে। সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ ও আশ্রম—এই ষড়্গুণের যা দিয়ে শত্রুর অপকার ও নিজের সুবিধা হয়, সে বিষয়ে রাজার সতত চিন্তা করা উচিত। যাতে নিজের সমৃদ্ধি বাড়ে এবং অন্যে বঞ্চিত হয় বা তার অনিষ্ট হতে পারে তা বিবেচনা করে সন্ধি করে আসন, বিগ্রহ করে যান দ্বৈধীভাব বা সংগ্রাম—এই সব গুণের প্রয়োগ করার নামই রাজনীতি।

বৃষপর্বা বললেন, কিন্তু এই রাজনীতি কি আপনি সমর্থন করেন?

দৈত্যগুরু শুক্র বললেন, এই রাজনীতিই প্রচলিত এবং দেবরাজ ইন্দ্র এই নীতিই এতকাল অনুসরণ করে এসেছেন। কিন্তু আমার মতে এই নীতির ফল ক্ষণস্থায়ী এবং রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পরিপন্থী। পররাষ্ট্র নিয়েই সদাসর্বদা সতর্ক থাকতে হলে নিজের রাজ্যের উন্নতি বিধানে যত্নবান হওয়া সম্ভব হয় না। প্রথম দিকে কিছুটা ঝুঁকি নিতে হলেও নিজের দেশ গড়ার কাজেই মনোনিবেশ করা ভাল। দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টাই রাজার প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত। এর জন্য দেশাত্মবোধ জাগানোই সকলের প্রথম কাজ। দেশের সমস্ত প্রজা ভাববে, এ আমার দেশ, এ দেশের সমস্ত কল্যাণের দায়িত্ব আমার।

বৃষপর্বা বিস্মিত হয়ে বললেন, এ কি সম্ভব?

নিশ্চয়ই সম্ভব। এ ভাবনার মূলে কোন রাজনীতি নয়, অর্থনীতি। ধনী দরিদ্রের সামাজিক ব্যবধান না থাকলেই জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগবে। যার বেশি আছে, সে দান করবে যার নেই তাকে। কেউ কাউকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে না। সবাই সমান সুযোগ পাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার। কাউকে আমরা ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখব না। ভালবেসে কাছে টেনে নেব সবাইকে। রাজা তাঁর মন্ত্রী ও অমাত্যদের সাহায্যে এই পরিবেশ গড়ে তুলবেন নিজের রাজ্যে। এর জন্য প্রথম পাঠ

হল ত্যাগ, নিজের স্বার্থ ত্যাগ ; ত্যাগ দিয়েই ভোগের আদর্শকে গ্রহণ। এই আদর্শ গ্রহণ করলে কোন রাজনীতির প্রয়োজন হবে না। সবাই ফিরে পাবে তার পুরনো বিশ্বাস। অবিশ্বাসের যে জ্বালায় আমরা এখন জ্বলে মরছি, তা নিজেই জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

বৃষপর্বা বললেন, এ একটা মহৎ আদর্শের কথা, কিন্তু এই আদর্শকে রূপ দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।

শুক্র বললেন, একটা আদর্শ মেনে চলাই বড় কথা।

সভা ভঙ্গ হবার পর দানবরাজ বৃষপর্বা আহার করে যাবার জন্য দৈত্যগুরু শুক্রকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু শুক্র রাজী হন নি। বলেছিলেন, আমি দরিদ্র, কিন্তু লোভী নই। আমি রাজগৃহে আহার করে এসেছি শুনলে আমার শিষ্যরা লোভী হতে পারে।

বৃষপর্বা প্রসন্ন মনে বলেছিলেন, আমি সবার জন্যই আহারের ব্যবস্থা করেছি। তারা আপনার সঙ্গে আসে নি বলে তাদের জন্য আহার্য দ্রব্য পাঠানো হবে। তারা এ সংবাদ জানে।

শুক্র বললেন, তবে আমরা একসঙ্গে বসে আহার করব।

রাজা বললেন, তাতেই কৃতার্থ হব আমি।

তোমার কল্যাণ হোক।

বলে দৈত্যগুরু বিদায় নিলেন।

মন্ত্রী ও অমাত্যদের জন্যও আহারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু রাজা বললেন, আমি অন্তঃপুরে বিশ্রামের জন্য যাচ্ছি। তোমরা আহারান্তে এখানেই বিশ্রাম কোরো।

বলে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

মহারানী অপেক্ষা করছিলেন। পরম যত্নে রাজাকে অভ্যর্থনা করে তাঁকে সামনে বসিয়ে খাওয়ালেন। এই সময়ে রাজার মনে পড়ে যায় তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরুচির কথা। বিধবা হবার পর সে তার শিশুপুত্র বলিকে নিয়ে চলে এসেছিল কিছুদিনের জন্য। দৈত্য রাজ্যে বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। দৈত্যকুলের সমস্ত বীরেরা ইন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে চেয়েছিল তাঁর সেই হীন ছলনার জন্য। প্রার্থীর বেশে এসে দানব্রতী বিরোচনের সমুকুট মস্তক

চেয়ে নিয়েছিলেন তিনি। এর চেয়ে জঘন্য ছলনা আর কী হতে পারে! কিন্তু দৈত্যগুরু শুক্র সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। দৈত্যকুলে সেনাপতি হয়ে সেনা পরিচালনার অভিজ্ঞতা কারও ছিল না, বলে তাঁর ধারনা ছিল। তিনি বলেছিলেন, অপেক্ষা কর। যুদ্ধের উপযুক্ত কাল এ নয়, সময় হলে আমি তোমাদের বলব। কিন্তু দৈত্যরা বলেছিল, আমাদের নিরস্ত করবেন না গুরুদেব, এই ভাবে আমাদের রাজার প্রাণ হরণ করবে, আর আমরা নীরবে দর্শক হয়ে তাই দেখব! এ অসম্ভব গুরুদেব। আপনি আমাদের বাধা দেবেন না। তারা সাজ সাজ রব তুলেছিল। স্বর্গ রাজ্য অধিকারের জন্য অভিযান করবে তারা। তাই দৈত্যগুরু তাদের নিরস্ত করতে না পেরেই সুরুচিকে পিতৃগৃহে পাঠিয়েছিলেন বলিকে রক্ষার জন্য। আর বলেছিলেন দানবরাজ বৃষপর্বার সহায়তা লাভের জন্য। কিন্তু কন্যা সুরুচির সব কথা শুনেও তিনি দৈত্যগুরুর মতোই যুদ্ধে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পিতার মনোভাব বুঝতে পেরে সুরুচি তাঁর শিশুপুত্র বলিকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিল।

তারপরেই দৈত্যগুরু রাজ্যের হাল ধরেছিলেন। দৈত্যদের বুঝিয়ে বলে-ছিলেন যে দানবরাজ বৃষপর্বাও যখন যুদ্ধে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন না, তখন হঠকারীর মতো কোন কাজ করা উচিত নয়। বলি যত দিন বড় না হচ্ছেন, তত দিন এই ভাবেই চলুক। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। দৈত্যদের এখন সতর্ক থাকতে হবে।

সমুদ্র মন্থনের সময়ে বলিকেও বঞ্চনা করেছিলেন ইন্দ্র। সমুদ্রের তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অনুসন্ধান চালাবার সময়ে দৈত্যদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন ক্ষীরোদ-সাগরবাসী বিষ্ণু। দৈত্যরা সমান ভাগের আশায় দলে দলে এসে যোগ দিয়েছিল, কঠোর পরিশ্রম করেছিল তারা। সমস্ত দুর্গম স্থান তন্ন তন্ন করে খুঁজে তারা নানা দ্রব্যাদি আহরণ করেছিল। কিন্তু প্রতি-শ্রুতি রাখেন নি দেবরাজ ইন্দ্র। বিষ্ণু দু দলের মধ্যে সমান বণ্টনের নামে পক্ষপাত করেছিলেন। অমৃতের ছিঁটে ফোটাও তারা পায় নি এই বণ্টনের সময়ে। গুরু শুক্রাচার্য উপস্থিত ছিলেন না। দৈত্যরা বঞ্চিত হয়ে ক্ষেপে গিয়ে-ছিল এবং দেবতাদের পশ্চাদ্ধাবন করে যুদ্ধ করেছিল তাদের সঙ্গে। যুদ্ধের সংবাদ পেয়ে দৈত্যগুরু ছুটে এসে দেখেছিলেন যে দেবতারা পালিয়ে গেছে। বলি স্বর্গরাজ্য জয় করে ত্রিভুবনের রাজা হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল

রাজত্ব করতে পারেন নি। বলি তাঁর যজ্ঞের পর দানের সময়েই বিষ্ণু তাঁকে ছলনা করে বন্ধন করেছিলেন। তারপর তাঁকে নির্বাসিত করেছেন পাতালে। বলির পত্নী বিন্ধ্যাবলী তাঁর সঙ্গে বাস করছে। সুরুচি পুত্রের সঙ্গে পাতালে যায় নি। পিতার কাছে এসে বলেছিল, আমার প্রয়োজন তো আগেই ফুরিয়ে গিয়েছিল, তবু আমি পুত্রের কাছেই ছিলাম।

বৃষপর্বা যখন এই ভাবে বসে আহার করতেন, তখন সুরুচি তাঁর সামনে বসে তালপত্রে ব্যজন করত। বৃষপর্বা বলেছিলেন, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলে ভাবছ কেন ?

সুরুচি বলেছিল, বলি শিশু ছিল বলেই তাকে বড় করে তোলবার দায়িত্ব ছিল আমার। গুরুদেবের কৃপায় সে দায়িত্ব আমি ভাল ভাবেই পালন করেছি। গুরুদেব সর্বদা সতর্ক থাকতেন, ইন্দ্র হয়তো আবার ছলনা করতে আসবে। তিনি চারিদিকে বিশ্বস্ত চর নিয়োগ করেছিলেন, স্বর্গে তাঁর চর ছিল। তারা নিয়মিত সংবাদ সরবরাহ করত। তিনি বৃহস্পতির মন্ত্রণা ভেদ করতেন। জানতেন যে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলতেন, শত্রুর শেষ রাখতে নেই অগ্নির মতো। তাই ইন্দ্র যখন সমুদ্রমন্থনের প্রস্তাব নিয়ে বলির নিকটে এসেছিলেন, তখন তিনি সেই প্রলোভনে বিশ্বাস করেন নি।

বৃষপর্বা জানতে চেয়েছিলেন, কী প্রস্তাব এনেছিলেন ?

সুরুচি বলেছিলেন, ইন্দ্র বলেছিলেন, প্রস্তাব আমার নয়, বিষ্ণুই এই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। বিগত মহাপ্লাবনে চরাচর ডুবে যাবার পরে সমুদ্রতল থেকে ভূমি জাগছে, সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে নানা সম্পদের। এই অরণ্য-সঙ্কুল দুর্গম সমুদ্রতীরে ক্ষীরোদ সাগর থেকে মন্দর পর্বত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অনুসন্ধান চালালে নানা সম্পদ পাওয়া যাবে। দেবতারা একা এই কাজ পারবে না, দৈত্যদের সাহায্যও দরকার। দুই জাতির সমবেত চেষ্টায় এই দুরূহ কাজ করলে উভয় জাতিই লাভবান হবে। সম্পদ সমান ভাবে বন্টনের ভার নেবেন বিষ্ণু।

গুরুদেব এ কথা বিশ্বাস করেছিলেন ?

বৃষপর্বার প্রশ্নের উত্তরে সুরুচি বলেছিল, না, বিষ্ণুকে গুরুদেব বিশ্বাস করেন না, তিনি পক্ষপাতদুষ্ট বলে সন্দেহ করেন তাঁকে।

তবে এঁরা সমুদ্র মন্থনে সম্মত হলেন কেন ?

বলির জন্য। বলি ভেবেছিল, মন্থনে যোগ না দিলে কিছুই পাওয়া

যাবে না, আর যোগ দিলে নূতন সম্পদের অধিকারী হওয়া যাবে। বণ্টনের সময় পক্ষপাত হলে চোখের সামনেই তা হবে এবং প্রতিবাদের সুযোগ পাওয়া যাবে।

গুরুদেব কি মেনে নিয়েছিলেন বলির কথা?

না মেনে তাঁর উপায় ছিল না। বলি বলেছিল, সম্পদ বৃদ্ধি করতে না পারলে প্রজাদের সুখ নেই। সম্পদেই সুখ। দেশের যা অবস্থা, তাতে ভূমির উপরের সম্পদ নয়, ভূমির ও সমুদ্রের নিচের সম্পদও আমাদের উদ্ধার করতে হবে জনসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য। জগতে শুধু দেবতা ও দৈত্য নয়, আরও অনেক জাতি আছে। তারা রাজার জাত নয় বলেই কি অনাদরে জীবন যাপন করবে! মানুষ প্রজা কি সুখ ভোগের অধিকারী নয়?

বৃষপর্বা সবিস্ময়ে বলেছিলেন, বলি এই কথা বলত!

সুরুচি, বললেন, তাইতেই তো গুরুদেব সমুদ্র মন্থনে সম্মত হলেন। বললেন, জনসাধারণের জন্য যার এই রকমের দরদ, তাকে আমি সম্পদ উদ্ধারে বাধা দেব না। বলি তাঁকে প্রণাম করে দৈত্যদের নিয়ে সমুদ্র মন্থনে গিয়েছিল, আর অমৃতের ভাগ না পেয়ে যুদ্ধ করেছিল দেবতাদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত সে-ই জয়ী হয়েছিল। বিষ্ণু মোহিনী মূর্তিতে হরণ করেছিলেন অমৃত কুম্ভ, কিন্তু যুদ্ধের সময় দেবতাদের সহায় হন নি। তিনি যে অকারণে পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন, তা বুঝতে পেরেই নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কারণ তিনি নিজেও সম্পদের ভাগ নিয়েছিলেন—লক্ষ্মীকে নিয়েছিলেন, নিয়েছিলেন কৌস্তুভ মণি।

তারপর?

বলি স্বর্গ জয় করে ফিরে এসে প্রণাম করেছিল গুরুদেবকে। তিনি বলেছিলেন, আরও সতর্ক হতে হবে। বিষ্ণু যখন যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসেন নি, তখন তিনি বুঝেছেন যে দৈত্যরা এখন দেবতাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং যুদ্ধে এখন তাদের জয় করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি কোনরূপ ছলনার আশ্রয় নিয়ে ইন্দ্রের জন্য স্বর্গরাজ্য অধিকার করবেন। কিন্তু বলি ঠিক তার পিতার মতো হয়েছে। সত্য রক্ষাই তার সব চেয়ে বড় ধর্ম, আর দান। সম্পদ একা ভোগ করবে না, বণ্টন করবে সম্পদ। সবাই মিলে ভোগ করবে। প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করবে তার পিতার মতো

নির্দ্বিধায়।

সুরুচি একটু থেমে বলেছিল, গুরুদেব তাকে বলেছিলেন, তুমি সৎ, সত্যবাদী, ধার্মিক। কিন্তু এই সব গুণের জন্য তোমার মনে অহঙ্কারের সঞ্চার হয়েছে। তাকে প্রশ্রয় দিও না। অহঙ্কার অধর্ম এবং পতনের কারণ হয়। কাম ক্রোধের মতো অহঙ্কারকেও জয় করতে হয়।

কী উত্তর দিয়েছিল বলি?

বলি বলেছিল, অহঙ্কার নয়, প্রভু, প্রজা সাধারণের কল্যাণ চাই আমি। যা সবার ভোগে আসে তাই সম্পদ, যা সঞ্চয় করা হয় নিজের ভোগের জন্য তা বিপদের কারণ। আমি প্রার্থীকে দান করি সমাজে সমতা আনয়নের জন্য, অহঙ্কারের জন্য নয়।

তারপর?

তারপরের সব ঘটনাই তো তোমার জানা। বলি এখন নির্বাসনে। সেখানেই জীবন কাটাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিষ্ণুকে। কথার খেলাপ সে করবে না। আদর করে বিন্ধ্যাবলীর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছিলাম। পতিব্রতা মেয়ে তারই সঙ্গে পাতালে গেছে। আমিও তার সঙ্গে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম যে তার কোন প্রয়োজন নেই। তার প্রতি কর্তব্য আমার অনেক দিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। তোমাদের আর কোন সন্তান নেই বলেই তোমাদের কাছে এসেছি।

খেতে খেতে সুরুচির কথা মনে পড়ছিল বৃষপর্বার। আজ যেমন করে তার মা তার সামনে বসে ব্যজন করছেন, সুরুচিও এই ভাবেই বসে তাঁকে ব্যজন করত। দৈত্যগুরু যখন তপস্যার জন্য হিমালয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বোধ হয় সে চেয়েছিল যে বৃষপর্বা দৈত্যদের আশ্রয় দেবেন। কিন্তু তিনি রাজি হন নি। ইন্দ্রের সঙ্গে নূতন বিরোধে তাঁর আপত্তি ছিল। সুরুচি বোধ হয় মর্মাহত হয়েছিল, কিন্তু কোন দিন কোন অভিযোগ করে নি। অভিযোগ করা তার স্বভাব নয়। কিন্তু শর্মিষ্ঠার জন্মের পর সে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তাঁকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। বলেছিল, এবারে আমাকে বিদায় দাও, বাবা।

বৃষপর্বা আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন কোথায় যাবে তুমি? পাতালে?

না।

রে?

বনবাসে।

কী করবে বনবাসে গিয়ে ?

সুরুচি নিরুত্তাপ স্বরে বলেছিল, বনে গিয়েই সে কথা ভাবব।

শিশুকন্যা দেবযানীকে কোলে নিয়ে ফিরে আসবার পর দৈত্যগুরু শুক্রও বৃষপর্বাকে সুরুচির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলেছিলেন, সে কি পাতালে তার পুত্রের কাছে যায় নি ?

বৃষপর্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিয়েছিলেন, না।

তুমি কি খবর নিয়েছিলে তার ?

বৃষপর্বা বললেন, নিয়েছিলাম, গুরুদেব। সে আমাকে ত্যাগ করে যেতে একটুও দ্বিধা করে নি, কিন্তু আমি তাকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করলেই আমার একটা অপরাধ বোধ জেগে ওঠে। মনে হয় আমি ভীরু, দুর্বল, রাজা হবার অযোগ্য। তাই তাকে হারিয়েছি আমি।

দৈত্যগুরু আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, সে কি এ রকম ভাববার তো কোন কারণ নেই।

আছে গুরুদেব। তখন আমি এ কথা বুঝতে পারি নি। তখন বুঝলে আজ আমাকে অনুতাপ করতে হত না। বিরোচনের মৃত্যুর পর সে আমার কাছে এসেছিল, বোধহয় ভেবেছিল যে এই ছলনার সংবাদ পেলে আমি সেই হত্যার প্রতিশোধ নেব। তারপর তার একমাত্র পুত্র বলির বন্ধনের পরেও সে আমার কাছেই এসেছিল। এবারেও বোধহয় সে চেয়েছিল যে আমি প্রতিবাদ করব এই বঞ্চনার।

কিন্তু সে কি এ রকমের ইচ্ছা কখনও প্রকাশ করেছে ? না, তার কোন ইচ্ছাই সে কখনও প্রকাশ করেনি। বড় চাপা স্বভাবের মেয়ে ছিল সে, বড় ধীর, স্থির, বুদ্ধিমতী। নিজের হৃদয়ের কোন বাসনা সে কখনও কারো কাছে অনাবৃত করে নি।

দৈত্যগুরু জানতে চেয়েছিলেন, সে চলে গেল কেন ?

বৃষপর্বা বলেছিলেন, বোধহয় ভেবেছিল যে এ জীবনে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। স্বামীকে হারিয়েছে, পুত্র থেকেও সে নেই। আর—

কিছু বলতে গিয়েও বৃষপর্বা থেমে গিয়েছিলেন। কিন্তু দৈত্যগুরু বলে-

ছিলেন, আর কি ?

শর্মিষ্ঠার জন্ম হয়েছিল।

তাতে কি কোন ক্ষতি হয়েছিল তার ?

এই জন্যই বোধহয় সে ভেবেছিল যে জীবনে তার আর প্রয়োজন নেই। সন্তানের প্রয়োজন ছিল বৃদ্ধ পিতা-মাতার, তাই সে আমাদের সেই অভাব কোন দিন বুঝতে দেয় নি। রাজবধূ হয়ে এসেছে, এসেছে রাজমাতা হয়েও। তার পর হয়তো ভেবেছে, বিধবা কন্যা পিতামাতাকে দুঃখ দেয় সুখের চেয়ে বেশি। মনে মনে এই কথা যেদিন বিশ্বাস করেছে, সেদিনই সে গৃহত্যাগের সংকল্প করেছে।

দৈত্যগুরু বলেছিলেন, তুমি কি তাকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা কর নি ?

না। নিজের ইচ্ছাতেই সে এসেছিল, চলেও গেছে নিজের ইচ্ছায়। তার স্বাধীনতায় আমি কোন দিন হস্তক্ষেপ করি নি।

দৈত্যগুরু শুক্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। কিন্তু দানবরাজ বৃষপর্বা এই দীর্ঘশ্বাসের কারণ অনুমান করতে সক্ষম হন নি। তিনি ভেবেছিলেন যে তাঁর কন্যা পিতার নিকট যথোচিত স্নেহ লাভ করে নি বলেই বোধহয় তাঁর গুরুদেব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। এটা ভাবাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু দৈত্য-গুরুর মনে পড়েছিল দেবযানীর মাতা জয়ন্তীর কথা। বয়সে সুরুচির চেয়ে অনেক কম। অনেক কোমল স্বভাবের মেয়ে জয়ন্তী। সুরুচির মতো সে তার যৌবনের মধ্যাহ্নে পৌঁছয় নি। সে সবে পদার্পণ করেছিল যৌবনে, প্রকৃতির নিয়মে ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল সুরুচির মতোই। সুরুচির জীবন শুকিয়ে গেছে তার স্বামী বিরোচনের হঠকারিতায়, ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে যে তার জীবন দান করেছিল শত্রুকে। কিন্তু জয়ন্তীর জীবন নষ্ট করার জন্য দায়ী কে ? তিনিও কি একই রকম ভাবে সেই মেয়েটির জীবন নষ্ট করে আসেন নি ?

দৈত্যগুরুর মনে এসেছিল নূতন ভাবনা। জয়ন্তীকে ত্যাগ করে চলে আসার সময় ভেবেছিলেন যে শত্রুর কন্যাকে গৃহে স্থান দেবার জন্য তিনি ধিকৃত হবেন দৈত্য-দানবদের নিকটে। সেই ভয়েই তিনি জয়ন্তীকে নিয়ে ফেরেন নি। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র তো এ ভয় পান নি, তিনি পুলোমা দানবের কন্যাকে হরণ করে বিবাহ করেছেন এবং এর জন্য নিন্দিত হন নি কোন দেবতার কাছে। এই ইন্দ্র তো তাঁর শত্রু নয়, শত্রু ছিলেন তাঁর শিষ্যদের।

তাই বলে তাঁর কন্যা তো কোন অপরাধ করে নি কারও নিকটে। দানবকন্যা শচী যদি দেবরাজের পত্নী হয়ে সম্মান পেতে পারেন, তবে জয়ন্তী কেন ইন্দ্রের কন্যা বলে তাঁর শিষ্যদের নিকট নিন্দিত হবেন!

দৈত্যগুরু কি ভুল করেছেন? আত্মসম্মানের জন্য একজনের জীবন নষ্ট করে এসেছেন! সেদিন বড় যন্ত্রণা বোধ করেছিলেন দৈত্যগুরু। সারা দিন এই কথাই ভেবেছিলেন। তারপর সেই নূতন ভাবনা এসেছিল তাঁর মনে। ইন্দ্রের কন্যা বলে বোধ হয় নয়, তিনি ভয় পেয়েছিলেন সুরুচিকে। তপস্যা করতে যাবার সময়ে তিনি সুরুচিকে তার পিতৃগৃহে দেখেছিলেন। সুরুচি ইন্দ্রকে যে কোন দিনই ক্ষমা করতে পারবে না, দৈত্যগুরু তা জানেন। এক দিন, দুই দিন নয়, দীর্ঘ সময় তিনি সুরুচিকে দেখেছেন খুব নিকটে। বলিকে বড় করে তোলার ব্যাপারে সুরুচি দৈত্যগুরুকেই শ্রদ্ধা করেছে তার পিতার চেয়ে বেশী। তার সমস্ত চিত্ত ঘিরে ছিল একমাত্র সন্তান বলি। মহা আড়ম্বরে বিন্ধ্যাবলীর সঙ্গে বলির বিবাহ দিয়েছিল। তারপরেই বলিকেও হারাতে হল। এই সমস্তই ইন্দ্রের জন্য। দৈত্যগুরু জানেন, ইন্দ্রের কন্যাকে সুরুচি কোন দিন প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারবে না। যে গুরুদেবকে সে পরম সমাদরে পূজা করেছে চিরকাল, তাঁর গৃহে ইন্দ্রের কন্যাকে দেখলে সে মর্মাহত হবে। জীবনের সমস্ত বিশ্বাস তার শেষ হয়ে যাবে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলে। দৈত্যগুরু নিজের সুখের জন্য সুরুচিকে এই বেদনা দিতে পারবেন না। এত দিন পরে দৈত্যগুরুর মনে হল যে এই ভাবনাই বুঝি তাঁর হৃদয়ের গোপনে সুপ্ত হয়ে ছিল এত দিন। আজ দানবরাজ বৃষপর্বার গৃহে সুরুচিকে দেখতে না পেয়ে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। তাঁর অপরাধ কি ক্ষালন করা যায় না?

নিজের এই অপরাধের কথা দৈত্যগুরু ভেবেছেন দিনের পর দিন। অনেক দিন তাঁর ইচ্ছা হয়েছে গন্ধমাদন পর্বতের সেই ফেলে আসা আশ্রমে ফিরে যেতে। কিন্তু প্রবল ভয়ে সেই বাসনাকে তিনি চেপে রেখেছেন। ভয় নিজের জন্য নয়। ভয় একটা দারুণ দুঃসংবাদের। তাঁর ভয় হয়েছে যে জয়ন্তী আর বেঁচে নেই। তাঁর বেঁচে থাকবার বাসনা থাকলে সে দেবযানীকে তাঁর হাতে তুলে দিত না। একদা সে তাঁর সামনে অগ্নিকুণ্ডে

প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিল। অনুমতি পেলে সে হাসতে হাসতেই আগুনে প্রবেশ করতে পারত বলে তাঁর মনে হয়েছিল। তাই তিনি তাকে গ্রহণ করেছিলেন। মরতে ভয় পায় না মেয়েরা। যাকে ভালবাসে তার জন্য তারা মরতে পারে হাসি মুখে। বনবাসী স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায় বলে তিনি শুনেছেন। স্ত্রীলোকের এই মর্মান্তিক মৃত্যু কেউ চায় না। কিন্তু যারা এই ভাবে মৃত্যু বরণ করে, তারা স্বেচ্ছায় তাই করে। কারও মুখ চেয়ে নয়, ধর্মের কাজ বলে নয়। স্বামীকে হারিয়ে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না ভেবেই এই কাজ করে। এরই নাম দেহাতীত প্রেম। এই প্রেম নারীর। পুরুষ এই ভাবে আত্মোৎসর্গ করতে পারে না। তাই দৈত্যগুরু শুক্র ভেবেছিলেন যে জয়ন্তী আর বেঁচে নেই। সে হয়তো সবার সামনে আত্মোৎসর্গ করেছে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে। সাক্ষী রেখে গেছে আশেপাশের আশ্রমবাসীকে। জয়ন্তীর খোঁজে সেখানে গেলে সবাই তাঁকে ধিক্কার দেবে।

একবার ইচ্ছা হয়েছিল যে তিনি দানবরাজ বৃষপর্বার নিকটে নিজের সব অপরাধ স্বীকার করে জয়ন্তীর সন্ধানে দূত পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। সে বেঁচে থাকলে দূত যে তাকে স্বামীর নূতন আশ্রমে আহ্বান করে আনবে, তাতে একই ভয় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর অপরাধের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে সবার কাছে। তার চেয়ে এই ভাল। এই ভাবে কৃতকর্মের জন্য হৃদয়ে দগ্ধ হতে থাকলেই তাঁর অপরাধ পুড়ে ছাই হবে অনুশোচনার আগুনে। অনুতাপেই হবে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

এই সব ভেবে তিনি পরম যত্নে পালন করেছেন দেবযানীকে। তাঁর মায়ের কথা গোপন করেছেন সন্তর্পণে। ভয় পেয়েছেন সত্য কথা প্রকাশে।

বৃষপর্বাও বুদ্ধিমান। তিনিও লক্ষ্য করেছেন তাঁর গুরুদেবের এই সত্য প্রকাশে অনীহা। তাই কোন দিন তিনি এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করে কিছু জানতে চান নি। সুরুচি গৃহত্যাগ করেছে শুনেই দৈত্যগুরু বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি ভাবতে পারেন নি যে সুরুচি গৃহত্যাগ করবে। তা জানলে বা সে কথা জেনে তপস্যায় গেলে তিনি কী জয়ন্তীকে বিসর্জন দিয়ে আসতেন! এ কথাও ভেবেছিলেন দৈত্যগুরু, কিন্তু উত্তর খুঁজে পান নি। সুরুচির সম্বন্ধে তিনি নীরব থাকতে পারেন নি, বৃষপর্বাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সুরুচিকে তুমি কেন যেতে দিলে? কেন তাকে জোর করে ধরে রাখলে না? তুমি তার পিতা, তার জন্মদাতা, তার ওপর তোমার যে চিরকালের

অধিকার ?

বৃষপর্বা শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, এক দিন তাই ভাবতাম, প্রভু, কিন্তু বিরোচনের হাতে তাকে সম্প্রদান করবার পর ভেবেছিলাম যে আমার অধিকার আর রইল না, কন্যার উপরে সমস্ত অধিকার ত্যাগ করে আমি আমার সমস্ত অধিকার তুলে দিলাম তার স্বামীর হাতে। স্বামীর অবর্তমানে সেই অধিকার বর্তাবে তার সন্তানের ওপর। প্রকৃতির এই বুঝি নিয়ম। এই নিয়ম আমি নীরবে মেনে নিয়েছিলাম।

দানবরাজ বৃষপর্বা নীরবে আহার করলেন। সুরুচি আজ নেই, তাল-পত্রে ব্যজন করতে বসেছেন মহারানী। শর্মিষ্ঠা বড় হচ্ছে। কিন্তু সুরুচির মতো কর্তব্যনিষ্ঠা নেই তার। সে এখন খেলা করছে তার সখীদের সঙ্গে। এই খেলাতেই তার আনন্দ বেশি। দিনকাল বদলাচ্ছে, পরিবর্তন আসছে। সেই পরিবর্তনকে প্রসন্ন মনেই মেনে নিতে হবে। বৃষপর্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা শর্মিষ্ঠার কথা ভেবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আহারের পর দানবরাজ বৃষপর্বা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। দিবানিদ্রার অভ্যাস তাঁর নেই। এতে আলস্য জন্মে, মেদ বাড়ে দেহে এবং নিদ্রার পর কর্মের উদ্যম যায় ফুরিয়ে। এই জন্য বৃষপর্বা একটি শয্যায় দেহ এলিয়ে দিয়ে মহারানীর জন্য অপেক্ষা করেন। মহারানী নিজে আহার করে আসবার পর নানা বিষয়ে আলোচনা করেন তাঁর সঙ্গে। রাজকার্যের আলোচনাও বাদ যায় না। আজও মুখে তাম্বুল নিয়ে বৃষপর্বা মহারানীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু মহারানী এলেন বিষণ্ণ মুখে। বৃষপর্বা বিস্মিত হয়ে বললেন, তোমাকে আজ বিষণ্ণ দেখছি কেন ?

মহারানী বুঝি চমকে উঠলেন, বললেন, আমি তো তোমার জন্যেই চিন্তিত হয়েছি!

কেন ?

আজ তোমাকে বড়ই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন মনে হয়েছিল। খেতে বসে তুমি

একটিও কথা বল নি!

এই জন্যে!

বলে বৃষপর্বা হেসে উঠলেন। বললেন, চিন্তার জন্যে নয়, মন চলে গিয়েছিল অতীতে। তাই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

কী মনে পড়েছিল তোমার?

রাজা বললেন, বড় মেয়ে সুরুচির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল যে আমাদের অবহেলার জন্যই সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

মহারানী বললেন, আমাদের অবহেলার জন্য নয়, সে গেছে স্বেচ্ছায়। শর্মিষ্ঠার জন্মের পর সে ভাবত যে পিতা মাতার কাছে থাকবার আর প্রয়োজন নেই। আর বোধহয় ভাবত যে তার বৈধব্য দেখে আমরা বেদনা বোধ করি।

রাজা বললেন, এ ভাবনা তো মিথ্যা নয়।

মহারানী প্রতিবাদ করে বললেন, সত্য হতে পারে, কিন্তু আমরা তো তা প্রকাশ করি নি কোন দিন। বরং তাঁকে নিয়ে আমরা যে সুখে আছি, এই কথাই সারাক্ষণ স্মরণ করিয়ে দিতাম।

রাজা বললেন, সে অবুঝ ছিল না, শর্মিষ্ঠার মতো চঞ্চল স্বভাবেরও নয়। আমাদের মনোভাব তার কাছে গোপন ছিল না।

মহারানী বললেন, আজকের সভার কথা বল। তার আগে বল দেবগুরুর পুত্র কচের কথা। গুরুদেবের আশ্রমে গিয়ে তাকে তো তুমি গতকাল দেখে এসেছিলে!

রাজা বললেন, তাকে দেখবার জন্যে গুরুদেবের আশ্রমে যাই নি, গিয়েছিলাম গুরুদেবকে সভায় আমন্ত্রণ করতে। তাঁর উপদেশের প্রয়োজন ছিল।

কচের আগমন বার্তা পেয়েই কি তোমার এই প্রয়োজনের কথা মনে হয়েছে?

না।

তবে?

কিছু দিন থেকেই আমি লক্ষ্য করছি যে মানব রাজারা আমাদের চতুর্দিকে ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। তাদের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই সত্য, কিন্তু বিবাদ নেই বলেই আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। ইলাবৃত বর্ষের রাজা ইন্দ্রের ভয় আমি পাই নে। সেও আমাকে শত্রু ভাবে না বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু কচকে আমাদের গুরুদেবের নিকটে

পাঠিয়েছে জেনে আমার এক নূতন ভাবনার উদয় হয়েছে।

মহারানী কোন প্রশ্ন না করে পতির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বৃষপর্বা বলে চললেন, আমাদের গুরুদেব যে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাতে কোন সংশয় নেই। দেবগুরু নিজের পুত্রকে তাঁর নিকটে জ্ঞানার্জনের জন্যই পাঠিয়েছেন, এ কথা বিশ্বাস করতে আমার দ্বিধা নেই। কিন্তু তাঁর চরিত্র আমাদের অজ্ঞাত নয়। আমাদের গুরুদেবের মতো সহজ সরল পথে চলার অভ্যাস তাঁর নেই। কাজেই তাঁর কোন কাজই সংশয় মুক্ত নয়।

মহারানী বললেন, এইতো গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে তিনি নিজে ছদ্মবেশে এসেছিলেন দৈত্যদের বিপথে চালনা করতে! তার কি কোন প্রয়োজন ছিল?

রাজা বললেন, হ্যাঁ, সেবারে দেবগুরু বৃহস্পতির সমস্ত ক্রিয়াকলাপের কথা আমি চরের মুখে শুনেছি। দৈত্যগুরু সিদ্ধিলাভ করে আসছেন জেনে দেবরাজ ইন্দ্র শঙ্কিত হয়ে তাঁকে ভয় থেকে ত্রাণ করতে বলেছিলেন। তারই জন্য দেবগুরু এক অদ্ভুত পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি ভ্রষ্টাচার শেখাতে চেয়েছিলেন সকলকে, তাতেই সবাই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। চার্বাক নামে এক শিষ্যকে তিনি এই ভ্রষ্টাচার প্রচারের কাজ দিয়েছেন। শুনতে পাচ্ছি যে সে মানব সমাজে এই ভ্রষ্টাচার শেখাচ্ছে। দেবগুরু নিজে এসেছিলেন দৈত্য সমাজে শিক্ষা দিতে, কিন্তু নিজ রূপে না এসে দৈত্যগুরুর ছদ্মবেশে এসেছিলেন।

একটু থেমে বললেন, এবারে নিজের পুত্রকে পাঠিয়েছেন। আর পাঠিয়েছেন দৈত্যগুরুর নিকটেই। তাঁর উদ্দেশ্য আমি জানি না, জানা সম্ভব নয়। তবে আমাদের গুরুদেব সতর্ক আছেন বলে আমার শঙ্কার তেমন কারণ নেই।

মহারানী বললেন, ইন্দ্র কি মানব রাজাদেরও ভয় পাচ্ছেন?

শুধু ভয় পাওয়া নয়, শুনতে পাচ্ছি যে তিনি স্বর্গে যাতায়াতের বর্তমান পথ বন্ধ করে দেবার জন্যে পরিকল্পনা করছেন।

কেন?

দৈত্যদের ভয় তিনি বোধহয় আর পান না। তার কারণ দৈত্যকুলে আর কেউ প্রবল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। আমার সঙ্গে বিরোধ তিনি সব সময়েই এড়িয়ে চলছেন। তিনি এখন ভয় পাচ্ছেন মানব রাজাদের। সূর্য ও চন্দ্র বংশের রাজারা এখন হিমবর্ষে ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে।

মহারানী বললেন, তুমি এক দিন চন্দ্র বংশের কথা বলবে বলেছিলে।

রাজা বললেন, হ্যাঁ, চন্দ্রের পুত্র বুধ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আর শুনে আশ্চর্য হবে যে সূর্যবংশের কন্যা ইলা এই চন্দ্রবংশের আদি জননী।

তাই নাকি !

বলে মহারানী বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

রাজা বললেন, গন্ধর্বরাজ বিবস্বান ছিলেন আদিত্য অর্থাৎ অদিতির এক পুত্র, ইন্দ্রের সহোদর ভ্রাতা। অন্তরীক্ষ প্রদেশে তিনি সপ্তাশ্ব রথে বিচরণ করতেন বলে প্রজারা তাঁকে আকাশের সূর্যের মতো জ্যোতিষ্মান ভাবতেন। মনু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং তাঁর নামেই মানব জাতি হয়েছে। আসলে বিবস্বান গন্ধর্ব জাতির অন্তর্গত ছিলেন না, তিনি আদিত্য হয়েও গন্ধর্বদের উপরে আধিপত্য করেছেন। মনুই মানব জাতির আদিপুরুষ। তাঁর বংশধরেরাই মানুষ নামে অভিহিত হয়েছে। ইক্ষাকু ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, কিন্তু প্রথম সন্তান ইলা ছিলেন কন্যা।

মহারানী বললেন, বুঝেছি।

কী বুঝেছ ?

এই ইলার বিবাহ হয়েছিল চন্দ্রের পুত্র বুধের সঙ্গে।

না।

তবে ?

রাজা বললেন, আমরা শুনেছি যে বিবাহের পূর্বেই ইলা এক দিন বনে বেড়াতে এসে তপস্যারত বুধের সাক্ষাৎ পান এবং তাঁরই সঙ্গে বাস করতে আরম্ভ করেন। মনুর গুরু বশিষ্ঠ এই সংবাদ পেয়ে ইলাকে উদ্ধার করতে আসেন। ইলা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন এবং যথাসময়ে পুরূরবা নামে এক পুত্রের জন্ম দেন।

তারপর ?

এই কথা গোপন রাখা হয় এবং যথাসময়ে সুদ্যুম্ন নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ইলার বিবাহ দেওয়া হয়। কিন্তু অনেকেই এই ঘটনার কথা জানতেন বলে ইলার সম্বন্ধে নানা রকম কাহিনী প্রচার করা হয়েছে।

মহারানী সাগ্রহে বললেন, কী রকম ?

রাজা বললেন, অনেকে বলেন যে ইলা কন্যা রূপে জন্মেছিলেন ঠিকই, কিন্তু মিত্রাবরুণের বরে পুরুষে পরিণত হন। ইনিই মৃগয়ায় গিয়ে পুনরায় কন্যায় পরিবর্তিত হন।

কেমন করে ?

সে অনেক কথা।

মহারানী বললেন, বল না শুনি।

বনের যে অংশে এই ঘটনা ঘটেছিল, তা অভিশপ্ত ছিল। একদা সনকাদি ঋষি সেখানে এসে পার্বতীকে শিবের সঙ্গে ক্রীড়ারত দেখেছিলেন। এতে পার্বতী লজ্জিত হওয়ায় শিব বলেছিলেন যে পুনরায় সেখানে কোন পুরুষ এলে সে রমণীতে রূপান্তরিত হবে। পুরুষ ইলাও এইখানে এসে রমণী রূপ প্রাপ্ত হন এবং বুধের সংস্পর্শে এসে পুরূরবার জন্ম দেন।

মহারাণী হেসে বললেন, এ ঘটনা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

হয় তো! তারপর বলা হয়েছে যে শিবের বরে ইলা পুনরায় তাঁর পুরুষ রূপ ফিরে পান। পরবর্তী কালে ইনিই রাজা সুদ্যুম্ন নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর সন্তানাদিও হয়েছিল। কিন্তু তিনি কন্যা রূপে জন্মেছিলেন বলে মনুর রাজ্যভাগ পান নি। বশিষ্ঠের কথায় তাঁকে প্রতিষ্ঠান নামে যে নগরটি দেওয়া হয়েছিল, সেখানেই রাজত্ব করেন। তাঁর কন্যাবস্থার পুত্র পুরূরবা। আমরা জেনেছিলাম যে এ সবই তৈরি গল্প। আসলে পুরূরবা ছিলেন ইলার কুমারী অবস্থার পুত্র। বুধ তাঁর জনক বলে পুরূরবার বংশই চন্দ্রবংশ নামে বিখ্যাত হয়েছে।

মহারানী বললেন, আমাদের প্রভার বিবাহ তো এই বংশেই হয়েছে ?

রাজা বললেন, ঠিকই বলেছ। স্বর্ভানু আমার বড় ভাই, কিন্তু বয়সে অনেক বড়। প্রভা তাঁর কন্যা। সেও আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিল, তার বিবাহ হয়েছিল পুরূরবার পুত্র আয়ুর সঙ্গে। তাদের পুত্র নহুষ স্বর্গ রাজ্যের ইন্দ্র রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কেন ?

সে অনেক কথা। এইটুকু জেনে রাখ যে ইন্দ্র পাপের দায়ে যখন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তখনই অরাজক স্বর্গ রাজ্যের জন্য দেবতারা এসে ধার্মিক নহুষকে নিয়ে যান। পুরূরবা ছিলেন আদি ইন্দ্রের মিত্র। তাই তাঁরা তাঁর পৌত্র নহুসকে নির্বাচন করেছিলেন ইন্দ্রত্ব করবার জন্য। কিন্তু দেবতাদের চক্রান্তেই তিনি ইন্দ্রপদ হারিয়েছিলেন।

কী হয়েছিল বলবে না ?

সে এক দীর্ঘ কাহিনী।

৯

তা হোক, তুমি বল।

বলে মহারানী সেই কাহিনী শোনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

বৃষপর্বা জিজ্ঞাসা করলেন, রচনার নাম শুনেছ ?

মহারানী বললেন, রচনা কে ?

দৈত্যকুলের কন্যা, প্রহ্লাদের ভগিনী। তাঁর বিবাহ হয়েছিল ইন্দ্রের মাতা ত্বষ্টার সঙ্গে। তাঁদের দুই পুত্রের নাম বিশ্বরূপ ও বৃত্র। বিশ্বরূপই ত্রিশিরা নামে পরিচিত ছিলেন।

কেন ?

বোধহয় আগেই বলেছি যে বিশ্বরূপ অধ্যয়ন করতেন, সুরাপানও করতেন এবং আশ্চর্যের বিষয় যে চারি দিকে তিনি দৃষ্টি দিতে পারতেন। এইজন্য লোকে বলত যে তিনি এক মুখে অধ্যয়ন করেন, সুরাপান করেন আর এক মুখে এবং তৃতীয় মুখে চারিদিকে দৃষ্টি রাখেন। তাই এক দিন তিনি ত্রিশিরা নামেই পরিচিত হয়ে গেলেন।

মহারানী বললেন, সম্পর্কে তিনি তো তাহলে ইন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র হলেন।

ঠিকই বলেছ। ত্রিশিরার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৃত্রও ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। এঁদের মাতা দৈত্য কুলের কন্যা হলেও পিতা ছিলেন অদিতির পুত্র আদিত্যের একজন। জাতিতে দেবতা।

তবে এঁদের বিরোধ হল কেন ?

সেটাই খুব আশ্চর্যের কথা।

নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে ?

রাজা বললেন, কারণটা খুবই তুচ্ছ। তবে ইন্দ্রের কাছে তা তুচ্ছ মনে হয় নি।

কেন ?

ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্র পদের জন্যে সারাক্ষণ সতর্ক। কে কখন এই পদ ছিনিয়ে নেয়, সেই দুশ্চিন্তাতেই তিনি দিন কাটান। রাতেও বোধহয় তাঁর সুনিদ্রা হয় না। কেউ শরীর চর্চা করে শক্তিশালী হয়েছে, ইন্দ্র ভয়ে কাতর—এই বুঝি তাঁর সিংহাসন যায়। কেউ দশজনের কল্যাণের পাত্র হয়েছে, ইন্দ্র তাঁর ভয়েও অস্থির। কেউ তপস্যা করছে অরণ্যে বা পাহাড়ে গিয়ে, তা সে শক্তির জন্যই হোক বা অধ্যাত্ম জ্ঞানের জন্যই হোক, ইন্দ্রের চোখে ঘুম নেই। তাঁর কাছে সিংহাসনটাই বড়। তিনি স্বর্গের রাজা, দেবতাদের রাজা

—এই অহংকারে তাঁর মাটিতে পা পড়ে না। তখন তার এই অহঙ্কারের সঙ্গে মিলেছে তাঁর যৌবনের গর্ব। শচীকে পাশে নিয়ে অপ্সরাদের নাচ দেখার গল্প বোধ হয় বলেছি। তাঁর গুরু এসেছেন দেখেও নড়ে বসলেন না। তাঁকে মত্ত অবস্থায় দেখে গুরু মাথা নিচু করে ফিরে গেলেন।

তার পর ?

সোমরসের ঘোর আর কতক্ষণ থাকবে। সকাল বেলা নেশা ছুটে যেতেই বুঝতে পারলেন যে রাতে তিনি কী কেলেঙ্কারি করেছিলেন। প্রথমেই ছুটে গেলেন গুরুর আশ্রমের দিকে। কিন্তু গুরু নেই, অপমানিত গুরু সেই রাতের অন্ধকারেই কোথায় চলে গেছেন কেউ জানে না। ইন্দ্র ব্যাকুল হয়ে চারিদিকে লোক পাঠালেন গুরুর খোঁজে, কিন্তু তাঁকে কোথাও পাওয়া গেল না। সমস্ত যাগযজ্ঞ বন্ধ হয়ে গেল।

মহারানী বললেন, এই বেহায়াপনার গল্প শুনেছি তোমার কাছে। কিন্তু বিরোধটা বাধল কেমন করে ?

বলছি। গুরুকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে ইন্দ্র মন্ত্রণা করতে বসলেন অন্য দেবতাদের সঙ্গে। তারা বলল, তোমার ভাই ত্বষ্টার বড় ছেলে বিশ্বরূপ যাগ-যজ্ঞ করতে শিখেছে, তাকেই গুরুর পদে বরণ করা যাক।

কী বললেন ইন্দ্র ?

ইন্দ্র বললেন, ছোঃ, ওকে আমি গুরু বলে প্রণাম করব! এর চেয়ে যাগ-যজ্ঞ বন্ধ থাক, সেও ভাল। কিন্তু দেবতারা বলল, গুরু বলে প্রণাম করতে না চাও, যজ্ঞের পুরোহিত বলে বরণ কর। যাগ-যজ্ঞ বন্ধ হবে কেন! শেষ পর্যন্ত সবার কথায় তাই ঠিক হল। গুরু বৃহস্পতি না ফেরা পর্যন্ত বিশ্বরূপকেই পুরোহিত রূপে বরণ করা হবে। কিন্তু বিশ্বরূপ এ কাজে রাজী হতে চায় নি। সে বলেছিল, এ আমার কাজ নয়, তোমরা আর কারও কাছে যাও। কিন্তু অনুরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে তো, বিশ্বরূপ এই ঢেঁকি গিলেই মারা পড়ল।

কী রকম ?

এরই পরিণামে তাকে মরতে হল।

মহারানী বুঝি চমকে উঠলেন। তাই দেখে বৃষপর্বা বললেন, না না। যজ্ঞ করবার সময় তাকে মরতে হয় নি, ইন্দ্র তাকে পরে হত্যা করেছিলেন।

মহারানী বললেন, এমন সংক্ষেপে বোলো না।

রাজা বললেন, বিশ্বরূপের দোষ, সে দৈত্যদেরও যজ্ঞের ভাগ দিয়েছিল।

বলেছিল, আমি যজ্ঞ করছি, হতে পারে দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞ। কিন্তু এই যজ্ঞের ভাগ পাবে সকলে। বলে মাতৃকুলের দৈত্যদেরও সে সমান ভাগ দিয়েছিল।

ঠিক কাজই তো করেছিল।

তুমি ঠিক কাজ ভাবছ, কিন্তু ইন্দ্র তা ভাবেন নি। তিনি ভেবেছিলেন যে বিশ্বরূপ অন্যায় করছে। দৈত্যরা যখন তার শত্রু, তখন তাদের যজ্ঞ ভাগ দেওয়া চলবে না।

মহারানী জিজ্ঞাসা করলেন, এই নিয়ে কি কোন গোলমাল হয়েছিল?

রাজা বললেন, না, কোন গোলমাল হয়েছিল বলে আমরা শুনি নি। বরং অনেকে মনে করে যে বিশ্বরূপ ইন্দ্রের অভিপ্রায় জেনে দৈত্যদের কোন যজ্ঞ-ভাগ দেয় নি, আর ইন্দ্র সবাইকে বলেছিলেন যে বিশ্বরূপ লুকিয়ে লুকিয়ে যজ্ঞের ভাগ দিত দৈত্যদের।

সত্যি নাকি!

আমি এটা সত্য বলে মনে করি না। বিশ্বরূপ সৎ ও সত্যবাদী ছিল। ভীরু কাপুরুষ ছিল না। সে লুকিয়ে কোন কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। হয় সে আদৌ কিছু দেয় নি, তা না হলে প্রকাশ্য ভাবে দৈত্যদের সে যজ্ঞের ভাগ দিত। তার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল বলে আমি মনে করি না।

তবে কি ইন্দ্র মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলেন বিশ্বরূপের বিরুদ্ধে?

রাজা বললেন, তার অভিযোগ বোধহয় পুরোপুরি মিথ্যা নয়, মিথ্যা গোপনে যজ্ঞের ভাগ দেবার কথাটা। আসলে দৈত্যদের যজ্ঞ ভাগ দেবার ব্যাপারটাই পছন্দ করেন নি।

কী করেছিলেন তিনি?

সে সময়ে কিছুই করতে পারেন নি। কারণ সে সবারই প্রিয় ছিল। শুধু দেবতা নয়, দৈত্যরাও তাকে খুব ভালবাসত। সে যখন নির্জনে তপস্যা করছিল, তখন ইন্দ্র তাকে হত্যা করেন।

মহারানী বললেন, কী ভাবে?

প্রথমে তিনি তাঁর চিরাচরিত প্রথায় অপ্সরা পাঠিয়েছিলেন এক দল। তারা তাকে প্রলুব্ধ করতে না পেরে ফিরে গিয়েছিল। তখন ইন্দ্র নিজে এসে তাকে হত্যা করেন। তিনি ভেবেছিলেন কেউ এ কথা জানতে পারবে না।

কিন্তু কেউ দেখে ফেলেছিল। তাই ব্যাপারটা গোপন করবার জন্যে এক কাঠুরেকে বলেছিলেন বিশ্বরূপের দেহটা দুখণ্ড করতে। কিন্তু সে প্রথমে রাজী হয় নি, বলেছিল, মরার ওপর কুড়ুলের আঘাত সে করতে পারবে না। কিন্তু লোভে পড়ে শেষ পর্যন্ত সে তাই করেছিল। আর ইন্দ্র বলেছিলেন, না, বিশ্বরূপকে তিনি হত্যা করেন নি, তাকে দেখতে এসেছিলেন সেখানে।

তারপর ?

কিন্তু বিশ্বরূপের বাবা ত্বষ্টা ঠিকই বুঝেছিলেন যে এই হত্যা ইন্দ্রেরই কাজ। তাই তিনি তাঁর ছোট ছেলে বৃত্রকে বলেছিলেন এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে। অদ্বিতীয় বীর ছিলেন বৃত্র। তিনি ইন্দ্রকে জয় করতে যাচ্ছেন শুনে দৈত্য ও দানবরা গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ইন্দ্র একবার নয়, বারে বারে শত্রুতা করেছেন তাদের সঙ্গে। এই বারে বৃত্রকে অগ্রবর্তী করে তারা সেই কুকীর্তির প্রতিশোধ তুলবে।

যুদ্ধ হল ?

না, ইন্দ্র ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন। দেবতারা এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু বিপদ দেখে তারাও রণে ভঙ্গ দিয়েছিল।

তারপর ?

স্বর্গ ছেড়ে দেবতারা পালিয়ে বেড়াতে লাগল। ইন্দ্রের খবর নেই। বৃত্র ত্রিভুবনের অধীশ্বর হয়ে বসল সিংহাসনে। হঠাৎ এক দিন কয়েক জন ঋষি এসে উপস্থিত হলেন বৃত্রের কাছে। ব্যাপার কী ? বৃত্র জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে তাঁরা ইন্দ্রের দূত হয়ে এসেছেন।

কী জন্যে ?

ইন্দ্র সন্ধি করতে চায় বৃত্রের সঙ্গে। সন্ধি যে কোনও শর্তে। বৃত্র বলল, তাকে আমার বিশ্বাস নেই। সে যে কোন কুকর্ম করতে পারে। ঋষিরা বললেন, আমরা তার জামিন আছি। আমরাই দেখব যে সে সন্ধি মেনে চলছে। বৃত্র জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের কী স্বার্থ ? তাঁরা বললেন, দেশে শান্তি স্থাপিত হলে সকলের সুখ হবে, এই আমাদের স্বার্থ।

মহারানী বললেন, সন্ধি হল ?

রাজা বললেন, হ্যাঁ, বৃত্র সরল ভাবে বিশ্বাস করল এই কথা, বলল, সন্ধির শর্ত একটাই। তা হল ইন্দ্র গুপ্ত ঘাতকের মতো লুকিয়ে আমাকে আক্রমণ করবে না। ঋষিরা বললেন, ঠিক আছে, এই শর্তেই সন্ধি হবে। বলে

ত্বষ্টা তাঁর দুজনকে ডেকে অগ্নি সাক্ষী করে এই শপথ করালেন ইন্দ্রকে।

তারপর?

তারপরের ঘটনা তো জানো। এক দিন সন্ধ্যেবেলায় বৃত্র যখন সমুদ্রের ধারে একাকী বেড়াচ্ছিল, তখন ইন্দ্র বিষ্ণুকে নিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করলেন। বিষ্ণুর পরামর্শে তিনি বজ্র নামে নতুন অস্ত্র তৈরি করিয়েছিলেন কোন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর অস্থি দিয়ে। তার ভেতর ভদ্রাশ্ব বর্ষের বারুদ ভরে দূর থেকে বজ্র নিক্ষেপ করেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে সবাই এসে দেখেছিল যে সেই আঘাতে বৃত্রের মৃত্যু হয়েছে।

সবাই মেনে নিয়েছিল এই হত্যা?

রাজা বললেন, কেউ না। ত্বষ্টা তো বৃত্রকে প্রথমেই বলেছিলেন, ইন্দ্রকে কখনও বিশ্বাস করবে না। তার সঙ্গে সন্ধি করার কোন অর্থ হয় না। সে কপট, লম্পট, মিথ্যাবাদী। তাকে বিশ্বাস করলে তোমার পতন নিশ্চিত। বৃত্র বলেছিল, ঋষিরা মধ্যস্থ হয়েছেন। তাঁদের সম্মানেই আমি সন্ধি করতে রাজী হয়েছি। কিন্তু ত্বষ্টা বলেছিলেন, ইন্দ্রকে তাঁরা চেনেন না বলেই মধ্যস্থ হয়েছেন। পরে তাঁরাও নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন।

তারপর?

ত্রিভুবনের সকলেই ইন্দ্রকে এই হত্যার জন্য ছি ছি করেছিল। স্বর্গের সিংহাসনে বসেও সে পথে বেরোতে পারত না, নিরীহ পথচারীও প্রকাশ্যে ধিক্কার দিত তাঁকে। যে দেবতাদের নিয়ে তাঁর রাজত্ব, তারাও তাকে ক্ষমা করতে পারে নি। গন্ধর্ব ও অপ্সরারাও তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিত। অন্য কেউ হলে এই ধিক্কার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করত। কিন্তু তিনি তা পারেন নি।

কী করেছিলেন?

পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। দেবতারা অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির করেছিল যে স্বর্গের সিংহাসন আর শূন্য রাখা চলে না, একজনকে এনে বসাতেই হবে। অনেক ভেবে চিন্তে অনেক মন্ত্রণার পর তারা পুরূরবার পৌত্র নহুষকে নির্বাচন করে।

দানবরাজের মুখে নহুষের নাম শুনেই মহারানী বললেন, চন্দ্রবংশের রাজা নহুষের সঙ্গে তো আমাদের খুব নিকট সম্পর্ক!

বৃষপর্বা বললেন, বলেছি তো, আমার বড় ভাই স্বর্ভানু তাঁর কন্যা প্রভার

বিবাহ দিয়েছিলেন পুরূরবার পুত্র আয়ুর সঙ্গে, নহুষ তাঁদের পুত্র।

মহারানী এ কথা শুনে খুবই বিস্মিত হলেন। কিন্তু বৃষপর্বা বললেন, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কেন?

ভাইদের সঙ্গে বয়সের পার্থক্য আমার অনেক, আমি আমার মায়ের প্রায় বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, আর আমার সব ভাই জন্মেছিলেন তাঁর প্রথম যৌবনে। আমাদের পিতা কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির কয়েকটি কন্যাকে এক সঙ্গে বিবাহ করেছিলেন এবং প্রায় একই সঙ্গে তাঁদের সন্তানাদি হয়েছিল। দেবাসুরের এই যে সংগ্রাম, এ আমাদের পারিবারিক ব্যাপার, ভাইএ ভাইএ যুদ্ধ। লোকে দেখে, আর হাসে। বৃহস্পতিরাই কূট চক্রী, বিবাদে তাঁরাই ইন্ধন জোগান। কথায় কথায় বিষ্ণুকে ডেকে আনেন তাঁর রাজ্য থেকে। আমাদের গুরুদেবরা মহাদেবের আশ্রিত, কিন্তু তাঁরা এ সবে প্রশ্রয় দিতে চান না।

কিন্তু এই বিবাদ শেষ হচ্ছে না কেন?

নিজেদের স্বার্থেই লোকে এই বিবাদ জিইয়ে রাখতে চায়। তা না হলে ইন্দ্রের সহোদর ভাইরা তো সবাই একে একে তাকে ত্যাগ করেছে।

কী রকম?

বিবস্বানকে দেখ, গন্ধর্বদের নিয়ে তিনি অন্তরীক্ষে রাজত্ব করেছেন, কোন যুদ্ধে তিনি যোগ দেন নি।

বরুণ বিভাবরী পুরীতে গিয়ে বাস করেছেন, তিনি এ সবের মধ্যে নেই। ত্বষ্টার কথা তো এই মাত্র বললাম, তিনি নিজের ভাইকে ছেড়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। অর্যমা, পুষা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, মিত্র—এঁরাও সব সময়ে ইন্দ্রকে সাহায্য করেন নি।

তবু যুদ্ধ হয়েছে।

তা হয়েছে এবং তার ফলও যা হবার তা হয়েছে। দিন দিন আমরা হীনবল হয়েছি, আর সম্পদ বেড়েছে আর সকলের। আমার জন্ম হয়েছে আমাদের পরিবারের সমস্ত বীরদের মৃত্যুর পরে, বয়সে আমি আমার অনেক ভাই বোনের পুত্র পৌত্রদেরও ছোট। শৈশবে আমি যে হানাহানি যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখেছি তাতে বুঝেছি যে নিরপেক্ষ না থাকলে শান্তি নেই, আর শান্তি না থাকলে সমাজের বা রাজ্যের কল্যাণ নেই। লোকে আমাকে ভীরু বলে, কাপুরুষ বলে, আরও হয়তো অনেক কিছু বলে। কিন্তু আমি এ সব কথায়

কান দিই না। আমি বিশ্বাস করি যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলেই প্রজার শ্রীসম্পদ বাড়বে, সুখী হবে তারা।

মহারানী মনে করিয়ে দিলেন, তুমি নহুষের কথা বলছিলে।

বৃষপর্বা বললেন, মনে আছে। দেবতারা নহুষকে কেন পছন্দ করেছিলেন তা বলতে পারব না। কারণ আমি তার কোন বিশেষ গুণের কথা শুনি নি। শুধু এইটুকুই জানি যে তার পিতামহ পুরূরবা দেবতাদের খুব অনুগত ছিলেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহে দেবতাদেরই সহায় হতেন। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে উর্বশী ছিলেন পুরূরবার স্ত্রী। আয়ু উর্বশীরই পুত্র।

মহারানী আশ্চর্য হয়ে বললেন, পুরূরবা স্বর্গের একজন অপ্সরাকে বিবাহ করেছিলেন!

শুধু বিবাহ নয়, তাঁদের প্রেম কাহিনী লোকের মুখে মুখে চলে আসছে। সে কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে আজ শেষ হবে না।

তাহলে নহুষের গল্পটাই বল।

নহুষের ব্যাপারটা আমাদের কাছে কিছু রহস্যময় হয়ে আছে।

কেন?

রাজা বললেন, যে কাহিনীটা আমরা জেনেছি, তা দেবতারা রটনা করেছিল। সেই কাহিনীর কতটা সত্য আর কতটা বানানো, তা বলতে পারব না।

মহারানী ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে রাজার মুখের দিকে প্রশ্নের দৃষ্টি তুলে ধরলেন। তাই দেখে বৃষপর্বা বললেন, নহুষ খুব বেশি দিন স্বর্গে রাজত্ব করতে পারে নি। কিন্তু স্বর্গ থেকে ফিরেও আর রাজত্ব করে নি। আমাদের বলা হয়েছিল যে ঋষিরা তাকে শাপ দিয়েছেন। কিন্তু শাপ দিলেই তো হবে না, কী হয়েছিল তার? তার পুত্ররা তখন শিশু, তাই সমস্ত ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে গিয়েছিল। তা না হলে এই নিয়ে আর একটা যুদ্ধ বাধত।

মহারানী বললেন, নহুষের কাহিনীটা তুমি খুলে বল না।

বৃষপর্বা বললেন, আমরা শুনেছিলাম যে নহুষ খুবই ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু দেবতারা বলেন যে স্বর্গে ইন্দ্র পদ লাভ করে সে বিষয়াসক্ত হয়ে ওঠে। অমরাবতীর নন্দন কাননে অপ্সরাদের সঙ্গে রঙ্গ করবার সময়ে সে ইন্দ্রাণী-শচীর রূপ গুণের কথা শুনে ভাবল যে সে যখন ইন্দ্র হয়েছে, তখন শচীরও তার নিকটে আসা উচিত। এ কথা মনে হতেই সে ঋষিদের ডেকে বলল,

দেবতাদের সঙ্গে আপনারা আমাকে ইন্দ্র পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু ইন্দ্রাণী আমার নিকটে আসছেন না কেন? আমার সেবার জন্য শচীকে আপনারা আমার নিকটে পাঠান।

মহারানী সবিস্ময়ে বললেন, এ কথা সত্যি?

রাজা বললেন, সত্যি কিনা জানি না, তবে আমাদের এই কথা বলা হয়েছিল।

কী হয়েছিল তার পর?

তার এই কথা শুনে দেবতা ও ঋষিরা চিন্তিত হয়ে শচীকে গিয়ে বলল, নহুষ, আপনাকে পেতে চাইছেন। এখন তো আমরা তাঁরই অধীন, কী করব বলুন।

কী উত্তর দিল শচী?

শচী গিয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির শরণ নিল। বলল, আমি আপনার শরণাগত, নহুষের হাত থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। বৃহস্পতি বললেন, তোমার ভয় নেই, আমি তোমাকে সনাতন ধর্ম ত্যাগ করতে বলব না।

তারপর?

খবরটা নহুষের কাছে পোঁছে গেল। সে জানতে পারল যে বৃহস্পতি শচীকে আশ্রয় দিয়েছেন। তাই রেগে গিয়ে দেবতাদের ডেকে বলল, আমি সব শুনেছি। বৃহস্পতি ইন্দ্রাণীকে রক্ষা করছে। তাকেই আমি হত্যা করব। দেবতারা তাকে শান্ত করবার জন্য বলল, আপনি রাগ করবেন না। আপনি ধার্মিক, আপনি তো জানেন যে ধর্মশাস্ত্রে পরস্ত্রীগমন নিন্দিত। আর পতিব্রতা শচী পতি জীবিত থাকতে তো আপনাকে বরণ করতে পারেন না। তবে শচীর মতো সুদর্শনা রমণী স্বর্গে অনেক আছে। সুন্দরী অপ্সরা থাকতে পরস্ত্রীর কামনা আপনি ত্যাগ করুন। আপনি যা চাইছেন, তা পাপ। পাপের ফলে সম্পদের বিনাশ হয়।

নহুষ কী করল?

সে বলল, ইন্দ্র যখন গৌতমের পত্নীকে উপভোগ করল এবং চন্দ্র বৃহস্পতির পত্নীকে, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? আর যে বৃহস্পতি তার ভাইএর স্ত্রীকেও ছাড়ে নি সে-ই বা আজ সনাতন ধর্মের কথা বলে কোন্ মুখে? অন্যকে উপদেশ দিতে দেখছি সবাই সমান পটু। আপনারা এ কাজ ছাড়ুন। বিনয়ে হোক বা সবলে হোক, শচীকে আমার কাছে আনুন। তাতেই আপনাদের

মঙ্গল হবে। ভয় পেয়ে দেবতারা বলল, ঠিক আছে, ইন্দ্রাণীকে বুঝিয়ে তাঁকে আমরা আপনার কাছে আনব।

তারপর ?

তারপর আর কী! দেবতারা ভাবল যে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তাই তারা বৃহস্পতির কাছে গিয়ে বলল, আপনি যে ইন্দ্রাণীকে আশ্রয় দিয়েছেন তা আমরা জানি। কিন্তু নহুষকে যখন ইন্দ্রপদ দেওয়া হয়েছে, তখন ইন্দ্রাণীকেও তার হাতে অর্পণ করতে হবে। কিন্তু বৃহস্পতি বললেন, শচীকে আমি ত্যাগ করব না। দেবতারা ভয় পেয়ে বলল, তাহলে উপায় ? দুদিক কী ভাবে সামলানো যায়!

সত্যিই তো!

বলে মহারানী তাকালেন রাজার মুখের দিকে। বৃষপর্বা বললেন, কাজেই চক্রান্ত শুরু হল। লোকে বিষ্ণুকে চক্রী বলে, কিন্তু সে বোধহয় তার সুদর্শন চক্রের জন্য। আসলে চক্রী অর্থাৎ চক্রান্তকারী হলেন দেবগুরু নিজে, ইন্দ্রকে তিনিই সব চক্রান্তের বুদ্ধি দেন। শচীর জন্যেও তিনি তাই করলেন। বললেন, ঠিক আছে, শচী রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে নিবিড় ভাবে প্রলুব্ধ করে বলবেন, আমার স্বামী জীবিত আছেন কিনা তা জেনে আপনাকে ভজনা করব। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি শপথ করে বলবেন, আমার স্বামীকে অন্বেষণের ব্যবস্থা করুন, আমিও তাঁর খোঁজে যেতে চাই।

তার পর ?

সবাই এক সঙ্গে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে নহুষের কাছে গেল। ইন্দ্রাণী এসেছে দেখে নহুষ তো ভারি খুশি। বলল, এখন আমি ইন্দ্র হয়েছি, তুমি আমাকে ভজনা কর। শচী সলজ্জে বলল, তার আগে আমাকে একটি বর দিন। ইন্দ্র জীবিত আছেন বা কোথায় আছেন, তা আমার জানা নেই। এ কথা না জানা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। আমি কথা দিচ্ছি এর পর আমি আপনার সেবা করব।

নহুষ রাজী হয়ে গেল ?

হবে না কেন! সে বেশ হৃষ্ট চিত্তেই ইন্দ্রাণীকে বিদায় দিল। আর গোপনে বৃহস্পতির চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল। নহুষ নিহত হলেন।

নিহত!

বলে চমকে উঠলেন মহারানী।

বৃষপর্বা বললেন, নিহত ছাড়া আর কী। আমরা সংবাদ পেলাম যে নহুষ আর নেই, ঋষিদের শাপে সে অজগর হয়ে স্বর্গচ্যুত হয়েছে। মানুষ কখনও অজগর সর্প হতে পারে, না স্বর্গচ্যুত হলেই তার আর খোঁজ পাওয়া যায় না? এ তো খুব পুরনো ঘটনা নয়, আমরা তখন বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম এই সংবাদ পেয়ে। নহুষের জ্যেষ্ঠ পুত্র যতি নিতান্ত ভালমানুষ না হলে একটা সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী ছিল।

মহারানী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কী শুনেছিলে?

আমরা শুনেছিলাম যে ইন্দ্র মানস সরোবর অঞ্চলে আত্মগোপন করে বাস করছিলেন এবং শচী বৃহস্পতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সেই খানে। ইন্দ্র নাকি শচীকে বলেছিলেন যে নহুষকে বল ঋষি-বাহিত যানে তার কাছে আসতে। নহুষ তাই করেছিল এবং তার পা ঋষি অগস্ত্যের মাথায় লেগেছিল বলেই অগস্ত্যের শাপে তার পতন হয়েছে।

তোমরা এ কথা বিশ্বাস করলে না কেন?

অসম্ভব কথা বলে। এই সব ছলনার তো কোন দরকার ছিল না।

কী মনে হয় তোমার?

এই ঘটনার পিছনেও ইন্দ্রের একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। মানে দৈত্য কুলের সমস্ত বীরকে নানা ভাবে বধ করবার পর তিনি দেখেছিলেন যে নহুষ নামে চন্দ্রবংশের এক রাজা প্রবল হয়ে উঠছে। তাই তাকে বধ করবার জন্যই এই চক্রান্ত করেছিলেন। নহুষের পিতামহ পুরূরবা তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু নৈমিষারণ্যে যজ্ঞস্থলে ঋষিরা তাঁকেও হত্যা করেন।

মহারানী চমকে উঠে বললেন, কেন?

বৃষপর্বা বললেন, ঋষিরা বলেছিলেন যে তিনি যজ্ঞের সুবর্ণ পাত্রাদি নিতে চেয়েছিলেন।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য কিছুই নয়। এর পিছনেও কোন রাজনীতি আছে কিনা আমার জানা নেই। আমার বয়স তখন কম এবং কোন রাজ্যের অধিপতি ছিলাম না। তাই আমার কথা ইন্দ্র তখন ভাবেন নি। এখন আমাদের শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি হচ্ছে। তাঁর সমস্ত কাজ আমাকে সন্দেহের চোখে

দেখতে হয়। এই যে বৃহস্পতির পুত্র কচ এসেছে গুরুদেবের কাছে জ্ঞানার্জনে, এর পিছনেও কোন চক্রান্ত আছে কিনা কে জানে! তবে ছেলেটিকে আমি দেখে এসেছি। তাকে সরল ও সত্যবাদী বলেই মনে হল। বৃহস্পতি বা ইন্দ্রের কোন দুরভিসন্ধি থাকলেও সে বোধহয় তা জানে না।

রাজার মুখের তাম্বুল অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মহারানী আর একটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন। রাজা সেটি মুখে পুরে বললেন, আর নয়, এবারে বিদায় দাও।

বলে রাজসভায় যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

দানব রাজ নন্দিনী শর্মিষ্ঠা তার সহচরীদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাচ্ছিল। দিন বড় দীর্ঘ সময় বলে তার মনে হয়। এই সময় কাটাবার উপযুক্ত কোন কাজের কথা সে জানে না। তাই অন্তঃপুরে তার সময় কাটে না। মধ্যাহ্নের খর সূর্য পশ্চিমের আকাশে না গেলে প্রমোদ উদ্যানে নামা যায় না। তাই সখীদের সাহচর্যই তার দ্বিপ্রহরের একমাত্র কাজ।

একজন সখী প্রস্তাব করল, চল, এক দিন আমরা গুরুদেবের আশ্রমে যাই।

শর্মিষ্ঠা বলল, কতবার তো গেছি। সেখানে নতুন কী দেখবার আছে!

কেন, দেবযানী!

দেবযানীও তো এখানে আসে!

সখী বলল, দুদিন সে আসছে না কেন জানো?

না তো!

নতুন বন্ধু এসেছে তার। তাকে নিয়েই সে এখন ব্যস্ত।

শর্মিষ্ঠা বলল, তোমরা কি—

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমরা কচের কথাই বলছি। শুনেছি খুব রূপবান সে, আর—

আর কী?

আশ্চর্য কথা বলতে পারে।

অন্যজন বলল, গুরুদেবের শিষ্যরা সবাই মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনছে।

সখীদের মুখের দিকে তাকাল রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা। তার দৃষ্টিতে বিস্ময়। জিজ্ঞাসা করল, দেবযানী বুঝি এরই জন্যে আসছে না?

তা নয় তো কী! কচকে ফেলে সে আসবে কী করে!

কেন, আমাকে কি তার আর ভাল লাগে না? আমাদের সবার সঙ্গে তার বন্ধুতা কি হঠাৎ ফুরিয়ে গেল?

সখীরা হাসল শর্মিষ্ঠার কথা শুনে। আর শর্মিষ্ঠা রেগে বলল, তোমরা হাসছ যে?

একজন সখী তার কানের কাছে মুখ এনে স্মিত হাস্যে বলল, কচ তো আমাদের মতো মেয়ে নয়, সে পুরুষ।

আর একজন সকৌতুকে বলল, শুনেছি সে আর কিশোর নয়, যৌবনে পদার্পণ করেছে সে।

যৌবন!

সে কি! যৌবন জানো না? কিছু দিন পরে তোমারও যে যৌবন আসবে।

শর্মিষ্ঠা বুঝি শিউরে উঠল। আতঙ্কে না আনন্দে, তা সে নিজেই জানে না। কিন্তু তার সখীরা হাসল।

একজন বলল, কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে যে তখন আমাদের হারাতে হবে!

কেন?

ও-তো চিরকাল এখানে থাকবে না। বিয়ে হবে, স্বামীর ঘর করতে যাবে শর্মিষ্ঠা। তখন কি ও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে, না মনে রাখবে আমাদের কথা। কি ভাই রাজকন্যে, তোমার মনের কথাটি শুনি।

শর্মিষ্ঠা বলল, তোমরা আজ এই কথা বলছ কেন?

লোকে বলাবলি করছে বলেই তো বলছি!

কী রকম?

সবাই বলেছিল যে কচ এসেছে দেবযানীকে নিয়ে যেতে।

শর্মিষ্ঠা জিজ্ঞাস করল, কোথায়?

কোথায় আবার! কচ স্বর্গে থাকে, স্বর্গেই নিয়ে যাবে দেবযানীকে!

শর্মিষ্ঠা বলল, কিন্তু দেবযানী তার বাবাকে ছেড়ে যাবে কেন?

বিয়ে করলে যাবে না! যেতেই তো হবে। বাবা মেয়েকে সম্প্রদান করে দিলে তো স্বামীর সঙ্গে যেতেই হবে মেয়েদের।

শর্মিষ্ঠা বলল, আমি কোথাও যাব না।

একজন বলল, কেন?

আর একজন বলল, বিয়ে করলে আর কি যাব না! বলা যায়!

শর্মিষ্ঠা বলল, আমি বিয়েই করব না।

সখীরা বলল, কী করবে তাহলে ?

দিদির মতো তপস্যা করতে যাব।

তারপর ?

আর একজন বলল, কেউ যদি ধরে নিয়ে যায় ? বনে তো রাক্ষস আছে ! তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে দেখলে রাক্ষস কি আর ছেড়ে দেবে তোমাকে ?

শর্মিষ্ঠা ভয়ে ভয়ে বলল, খেয়ে ফেলবে বুঝি ?

একজন হেসে বলল, খেয়ে ফেলবে কেন ! তোমাকে নিয়ে একটা সুন্দর ঘর বাঁধবে। বলবে, এই ঘরে আমরা দুজনে থাকব। তারপর একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হবে তোমার।

শর্মিষ্ঠা রেগে গিয়ে বলল, তোমরা ভারি অসভ্য হয়েছ, যা মুখে আসে তাই বল আজকাল।

একজন গম্ভীর হয়ে বলল, ও যখন বিয়ে করবে না বলছে, তখন ও রাজ-বাড়িতেই থাক। তার পর একে একে আমরা সবাই বিয়ে করে শ্বশুর বাড়িতে চলে যাব। আমরা কেন চিরকাল ওর মতো আইবুড়ো হয়ে থাকব।

আর একজন বলল, ঠিক কথা।

কিন্তু ভাই, দেবযানীর কী ভাগ্য !

কেন।

কত দূর দেশ থেকে কচ এসেছে ওর কাছে। এখন দুজনেই কত কি শিখছে গুরুদেবের কাছে। ভাব করছে।

তারপর ?

তারপর এক দিন কচ বলবে, দেবযানী, তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গে চল।

দেবযানী কী বলবে ?

দেবযানী বলবে, নিয়ে যাবে আমাকে ! বলে এমনি ভাবে—

দুহাতে শর্মিষ্ঠাকে জড়িয়ে ধরে হেসে উঠল।

শর্মিষ্ঠা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, অসভ্য কোথাকার !

সখী বলল, একে কি অসভ্যতা বলে ! এই রকমই তো করতে হয়, এই নিয়ম !

এই নিয়ম মানে !

যাকে ভালবাসবে, তাকে জড়িয়ে ধরবে। এর মধ্যে অসভ্যতা কী আছে !

শর্মিষ্ঠা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, বলল, দেবযানীর মতো আমারও অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করে।

একজন বলল, গুরুদেবকে ডেকে এনে শিখলেই তো পারো!

গুরুদেবকে কি ডেকে আনা যায়!

তবে তার কাছে চলে যেও। তোমাদের রথ আছে, শকট আছে, শিবিকা আছে। লোকজন আছে কত! তুমি চাইলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

শর্মিষ্ঠা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মেয়েদের যে এ সব চাইতে নেই। তারা ঘরের বাইরে যাবে কেন!

একজন সখী বলল, দেবযানীতো তোমার কাছে আসে।

আমরাও তো তোমার কাছে আসি।

কিন্তু আমার যে কারও কাছে যেতে নেই।

কে বলল যেতে নেই? একবার যেতে চেয়ে দেখ না। যেতে চাইলেই যেতে পারবে।

না। যা করতে নেই শুনেছি, তা করতে চাইব কেন? মার কাছে শুনেছি, মেয়েদের খুব সাবধানে থাকতে হয়।

শর্মিষ্ঠা গম্ভীর হয়ে গেল এক অদ্ভুত ভাবনায়! তাই দেখে সখীরাও ভয় পেল। একজন বলল, কী ভাবছ ভাই শর্মিষ্ঠা?

শর্মিষ্ঠা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, দিদির কথা। বড় দুঃখ হয় দিদির জন্যে। দিদিতো মা বাবার খুব অল্প বয়সের সন্তান, তাঁরা খুব ভালবাসতেন দিদিকে।

তোমার চেয়েও বেশি?

নিশ্চয়ই। আমাকে কি আর প্রথম সন্তানের মতো ভালবাসেন তাঁরা! কত আদরে মানুষ করেছিলেন দিদিকে। তারপর সবচেয়ে ভাল ঘরে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। মহারাজা প্রহ্লাদের ছেলে বিরোচনের সঙ্গে। ধার্মিক বলে কত নাম-ডাক তার।

হঠাৎ একজন বলে ফেলল, ধার্মিক, না বোকা?

আর একজন ধমক দিয়ে বলল, বোকা বলছ কেন?

বোকা না হলে কেউ কথা রাখবার জন্যে নিজের হাতে নিজের মুণ্ডু কাটে!

এ কথার উত্তর কেউ দিতে পারল না। কিন্তু শর্মিষ্ঠা বলল, দিদির কপালে অনেক দুঃখ ছিল, তাই ধর্ম তার কপালে সইল না। ধর্ম নাকি

পরীক্ষা করে ধার্মিককেই, ইহ জন্মে তার সুখ নেই, সুখ পরের জন্মে।

সখীরা আশ্চর্য হল এই কথা শুনে। একজন জিজ্ঞাসা করল, এ সব কথা তোমাকে কে বলেছে?

দিদি মাকে বলেছে। দিদি শুনেছে গুরুদেবের কাছে। দিদি নাকি তার স্বামীর চিতায় একই সঙ্গে পুড়ে মরতে চেয়েছিল। কিন্তু গুরুদেব তা করতে দেন নি।

কেন?

তিনি বলেছিলেন, জীবনের সব কাজ শেষ না হলে জীবন বিসর্জন দিতে নেই। দিদির ছেলে তখন ছোট। তাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, এই ছেলেকে বড় করে সিংহাসনে বসাতে হবে। তারপর ভাববে ছুটি নেবার কথা।

ছুটি!

ছুটি মানে মৃত্যু নয়।

তবে কী?

শর্মিষ্ঠা বলল, সংসার থেকে ছুটি। বনে গিয়ে তপস্যা করবে জ্ঞানের জন্যে। এ জীবনে যা জানা হল না, তপস্যা করে তা জানতে হবে। পরের জন্মে তুমি সেই জ্ঞান নিয়ে জন্মাবে।

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসল তার একজন সখী। কিন্তু শর্মিষ্ঠা তা দেখতে পেল না। সে বলল, আগের জন্মে তপস্যা করি নি বলেই আমি কিছু জানি নে।

আর একজন সখী বাতায়নের পথে বাইরে চেয়ে ছিল। বলে ঐতো, সূর্য দেখা যাচ্ছে গাছের আড়ালে। চল চল, বাইরে চল, বাগানে।

শর্মিষ্ঠাকে তারা সবাই মিলে টেনে নিয়ে চলল।

দানবরাজ বৃষপর্বা আজ মনে একটা অস্থিরতা বোধ করছিলেন। কিন্তু তার কারণ বুঝতে পারছিলেন না। রাজসভায় প্রবেশ করতে গিয়েও তিনি থমকে দাঁড়ালেন। একজন অমাত্য তাঁর নিকটে এসে বলল, মহারাজ!

বৃষপর্বা বললেন, আজ আমি সভায় বসব না।

অমাত্য বললেন, আজ অনেক দর্শনার্থী আছে।

তাঁদের আগামী কাল আসতে বলে দাও।

বলে তিনি তাঁর নিভৃত কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলেন। সংবাদ পেয়ে প্রধান অমাত্য এলেন ছুটে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বললেন, ভেতরে আসতে পারি মহারাজ?

মহারাজ গম্ভীর গলায় বললেন, এসো।

প্রধান অমাত্য ভিতরে এসে বললেন, মহারাজ কি আজ অসুস্থবোধ করছেন?

বৃষপর্বা বললেন, এক দিন তো অসুস্থ বোধ করব, অক্ষম হব রাজকার্যে। সেদিন কী হবে?

প্রধান অমাত্য সহাস্যে বললেন, তার দেরি আছে মহারাজ।

কত দেরি তা কি জানো?

তা কেউ জানে না।

তবে সেদিনের ব্যবস্থা কী হবে?

প্রধান অমাত্য বললেন, তার আগে কোন ব্যবস্থা না হলে সেদিন আমরা নিশ্চয়ই ভাবব।

মহারাজ বললেন, আজ ভাবতে কোন দোষ আছে?

নিরুত্তর রইলেন প্রধান অমাত্য। আর বৃষপর্বা বললেন, আমার বয়েস হয়েছে অনেক। পুত্র পৌত্র নেই, দৌহিত্র নির্বাসিত হয়েছে।

কিন্তু কন্যা আছে।

কন্যা রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না।

কেন?

ইতিহাসে এ রকমের নজির কি আছে!

কিন্তু জামাতা রাজ্যের অধিকারী হতে পারেন।

বৃষপর্বা সোজা হয়ে বসে বললেন, দৈত্য বা দানবকুলে সে রকম যোগ্য ব্যক্তি কে আছে বল।

সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না প্রধান অমাত্য। বললেন, আমাদের তা ভেবে দেখতে হবে।

কবে ভাববে?

মহারাজের আজ্ঞা পেলেই আমরা ভাবব। তবে—

তবে কি ?

শর্মিষ্ঠা তো এখনও কিশোরী। সে বিবাহযোগ্য হলেই আমরা সচেতন হব।

বৃষপর্বা বললেন, নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণেই সচেতন হতে হয়। তা না হলে পরে পস্তাতে হতে পারে।

প্রধান অমাত্য অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, মহারাজ !

কিছু বলবে ?

যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি।

বল।

আমরা যথাসময়ে শর্মিষ্ঠার বিবাহের কথা চিন্তা করতে চাই।

রাজা বললেন, কেন ?

এই বিবাহের সঙ্গে রাজ্যের অধিকার যুক্ত আছে বলে দাবিদারদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়ে যাবে এবং তার পরিণাম ভাল না হওয়াই সম্ভব।

হুঁ।

বলে বৃষপর্বা নীরব হলেন।

প্রধান অমাত্য বললেন, নিজেদের মধ্যে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। দানবকুলে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্ররা আছে। তাঁদের অনেকেই এই ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। আপনি এখনও কন্যার বিবাহ ব্যাপারে কোন চিন্তা ভাবনা করছেন না বলে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় নি।

বৃষপর্বা বললেন, একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

আজ্ঞা করুন।

গুরুদেব বলেন যে রক্তের সম্পর্ক যাদের সঙ্গে আছে তাদের সঙ্গে বিবাহ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু--

তুমি বলবে, এ যাবৎ এ প্রশ্ন ছিল না। হঠাৎ এই নিয়ম করা হবে কেন ? তোমার কথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু গুরুদেব মনে করেন যে পিতা-মাতার রোগাদি রক্তের সঙ্গে সন্তানের দেহে সঞ্চারিত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এর পরিণাম ভাল হয় নি। এই নিয়ে অনুসন্ধান চালাবার সময় এসে গেছে। উপযুক্ত শিষ্য পেলে তিনি তাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করবেন বলেছেন।

প্রধান অমাত্য চিন্তিত ভাবে বললেন, যত দিন তা না হচ্ছে, তত দিন কি

তা আমাদের মেনে চলতে হবে ?

রাজা বললেন, একটা সন্দেহের কথা যখন জানা গেছে তখন তা মানা না মানার প্রশ্নটি নিজেদের বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে। পিতামাতা বা তাদের পূর্বপুরুষদের কোন রক্তের দোষ আছে বা ছিল কিনা তা জানা সম্ভব নয়, কিন্তু কোন রোগে অকালমৃত্যু হয়েছে কিনা তা আমরা জেনে নিতে পারি। গুরুদেব মনে করেন যে মাতৃকুল সম্বন্ধেই বেশি সচেতন হওয়া আবশ্যক।

প্রধান অমাত্য বললেন, তাহলে তো দৈত্য বা দানব কুলে বিবাহ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ কথা প্রকাশ করা চলবে না, মহারাজ। তা প্রকাশ হলেই অশান্তির সৃষ্টি হবে।

বৃষপর্বা বললেন, আমার চিন্তা ভাবনা তো এই জন্যেই। আমার জীবদ্দশায় কি আমি এই রাজ্যের যুবরাজ নির্বাচন করে যেতে পারব না!

প্রধান অমাত্য বললেন, মহারাজ, এর জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। যথাসময়ে সবই সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করি।

বৃষপর্বা বললেন, এই রকমের আশা করার বোধ হয় কোন যুক্তিসম্মত কারণ নেই।

আশা যুক্তির পথ বেয়ে চলে না, মহারাজ, তার পথ ভিন্ন। আশাকে প্রশ্রয় দেয় হৃদয়। আর এই আশা না থাকলে জীবন বিস্বাদ মনে হয়।

বৃষপর্বা এ কথা অস্বীকার করলেন না দেখে প্রধান অমাত্য বললেন, আজ মহারাজের এই নূতন চিন্তার উদয় হয়েছে কেন জানি না, জানতে চাইবার সাহস আমার নেই।

রাজা বললেন, আমি বলছি। মহারানী আজও ইতিহাসের কথা জানতে চাইছিলেন। আজ তাঁকে আমি নহুষের কথা সবিস্তারে বললাম। তোমরা তো জানো, নহুষের মা আমাদের দানব বংশের কন্যা। আমার বড় ভাই স্বর্ভানুর কন্যা প্রভার সঙ্গে পুরূরবার পুত্র আয়ুর বিবাহ হয়েছিল। তাঁদের পাঁচটি পুত্র সন্তান হয়েছিল। জ্যেষ্ঠ নহুষ। তারপর ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, রম্ভ ও অনেনা। ইন্দ্রের অবর্তমানে দেবতারা নহুষকে ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর মৃত্যুটা বেশ রহস্যময়। এ কথা ঠিক যে নহুষের পুত্ররা কোন প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু তাঁর ভাইরা কেন নীরবে ছিলেন তা জানি না। তার চেয়েও বড় কথা এই যে ইন্দ্রের জন্য রজি আমাদের সঙ্গে

অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করেছিলেন। বলতে কি, তাঁর সাহায্য না পেলে ইন্দ্র তাঁর সিংহাসন ফিরে পেতেন কিনা সন্দেহ।

প্রধান অমাত্য বললেন, তাঁদের কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু সত্য ঘটনা আমাদের অজ্ঞাত। রজি রাজার অনেকগুলি পুত্র আছে শুনেছি। তাঁরা নাকি স্বর্গের আধিপত্য নিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতির বুদ্ধিতে তাঁরা পরাজিত হয়েছেন।

বৃষপর্বা বললেন, নহুষের পুত্রদের কোন সংবাদ জানো?

না, মহারাজ।

কিছুই জানো না?

শুনেছি তাঁর ছটি পুত্র, তাদের নাম যতি যযাতি সংযাতি আয়তি বিয়তি ও কৃতি।

যতি জ্যেষ্ঠ, কিন্তু তিনি রাজা হলেন না কেন?

যযাতি রাজা হচ্ছেন শুনে আমাদের মনেও সংশয় জেগেছিল। কিন্তু শুনেছি যে যতি রাজ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন বলেই যযাতি সিংহাসনে বসেছেন।

বৃষপর্বা বললেন, তোমাদের এ কথা বিশ্বাস হয়েছে?

প্রধান অমাত্য বললেন, এই জন্যেই বলেছিলাম যে নহুষের পুত্রদের কথা আমরা জানি না। যতি সিংহাসনে বসতে চাইলেন না কেন, তার সঠিক কারণ আমরা জানতে পারি নি।

এ নিয়ে কোন কথা শোন নি?

লোকে বলে যে যতি অধ্যাত্ম সাধনায় মন দিতে চেয়েছিলেন বলেই রাজত্ব ত্যাগ করেছেন।

অন্য ভাইরা কী করছেন?

জানি নে মহারাজ।

দানবরাজ বৃষপর্বা বললেন, আজ তোমরা আমাদের গুরুদেবের উপদেশ শুনেছ?

শুনেছি, মহারাজ।

তিনি চান না যে আমরা প্রতিবেশী রাজাদের সম্বন্ধে এই রকম অজ্ঞ থাকি। চন্দ্র বংশে আমাদের বিবাহ সম্পর্ক আছে বলে আমরা কিছু সংবাদ রাখি। কিন্তু সূর্য বংশের রাজাদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলে

স্বীকার করতে হয়। অথচ এরা অনেকেই আমাদের চতুর্দিক থেকে বেস্টন করে আছে। যে কেউ যে কোন সময়ে একা বা সম্মিলিত ভাবে আক্রমণ করে আমাদের পরাভূত করতে পারে। অথচ আমরা পুরাকালের ধ্যান ধারণা নিয়েই বাস করছি। ভাবছি যে আমাদের একমাত্র শত্রু হল স্বর্গ-রাজ্যের ইন্দ্র। আমরা একবারও ভেবে দেখি না যে ইলাবৃত বর্ষ ও হিমবর্ষের মাঝখানে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমে গন্ধমাদন এবং পূর্বে হিমালয় এই দুই বর্ষকে পৃথক করে রেখেছে। ইন্দ্র আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারবে না, তা পারবে আমাদের প্রতিবেশী রাজারা। তাঁদের অনেকেই এখন ইন্দ্রের চেয়েও প্রবল হয়ে উঠেছে।

প্রধান অমাত্য কোন প্রতিবাদ না করে এ কথা মেনে নিলেন। অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললেন, মহারাজ ঠিকই বলেছেন, প্রতিবেশী রাজাদের সম্বন্ধেই আমাদের বেশি সতর্ক হওয়া উচিত।

রাজা বললেন, কাল মন্ত্রণা সভায় এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আজ এসো, অন্ধকারে আমরা রাজধানীর পথে খানিকটা পরিক্রমা করে আসি। তুমি সবাইকে বিদায় নিয়ে একটু অপেক্ষা কর। আমি রাজবেশ ছেড়ে সাধারণ বেশে ফিরে আসছি।

দানবরাজ বৃষপর্বা তাঁর বেশ পরিবর্তন করে এসে দেখলেন যে প্রধান অমাত্যও তাঁর উষ্ণীষ খুলে কাঁধের উপরে ফেলেছেন উত্তরীয়ের মতো করে। তা না হলে জনসাধারণের বেশে রাজার সঙ্গে তাঁকে বেমানান মনে হবে।

রাজা তাঁর প্রমোদ উদ্যানে কিছুক্ষণ পাদচারণা করলেন। বললেন, অন্ধকার আর একটু গভীর হোক।

প্রধান অমাত্য বললেন, সেই ভাল, মহারাজ, তা না হলে কোন পথচারী আপনাকে চিনতে পারলে নগরে কথাটা ছড়িয়ে পড়বে। অকারণ কৌতূহল হবে অনেকের।

এই সবই তো রাজার অভিশাপ।

কে অভিশাপ বলছেন কেন, মহারাজ?

জা হয়েছি বলে কি আমি জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশার অধিকার

হারিয়েছি! আমার কি ইচ্ছা করে না তোমার গৃহে গিয়ে তোমার পুত্র কন্যাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করি? কিংবা এক দিনের জন্যও ভাবি যে আমি রাজা নই।

প্রধান অমাত্য বললেন, মহারাজ!

বল।

আপনার এই ইচ্ছা পূরণ করা তো কঠিন কাজ নয়।

জানি, তা নিতান্তই গোপনে করতে হবে। অর্থাৎ এ কথা যেন জানাজানিও না হয়। কিন্তু তোমাকে কি এ রকম কাজ এমন চোরের মতো সন্তর্পণে করতে হয়? যখনই ইচ্ছা করে, তুমি কি তখনই তা করতে পারো না?

প্রধান অমাত্য এ কথার কোন উত্তর দিলেন না দেখে রাজা বললেন, আমি এই স্বাধীনতার কথাই বলছি, ইচ্ছার কথা নয়। আমার যা ইচ্ছা করে আমি তো তোমার মতো স্বাধীন ভাবে তা করতে পারি না। এটাই আমার রাজা হবার অভিশাপ। নিজের স্বাধীনতাকে নিজেই খর্ব করতে হয়, তা না হলে তোমরা আমাকে পাগলা রাজা বলবে।

প্রধান অমাত্য নিরুত্তর রইলেন। রাজা আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, চল এই বারে।

বৃষপর্বা সিংহদ্বার দিয়ে রাজপথে এলেন না। তিনি তাঁর প্রহরীদেরও জানতে দিতে চান না যে তিনি আজ পথে বেরিয়েছেন। নগর পরিক্রমার কথাটা তিনি গোপন রাখতেই চান। কিন্তু একেবারে একা বেরোনো যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। দিন কাল দ্রুত বদলাচ্ছে। পথে জনতার জটলা, বাগবিতণ্ডা এবং হাতাহাতির সংবাদও তাঁর কানে আসছে। কোন দিন শুনবেন যে তারা অস্ত্র-শস্ত্রও ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কিন্তু কেন এই রকম পরিবর্তন হচ্ছে? কারণটা তাঁর জানা দরকার। তা না জানলে কোন প্রতিবিধান করা সম্ভব নয়। তাই রাজা কখনও সন্ধ্যার অন্ধকারে, কখনও বা গভীর অন্ধকারে এক-জন মাত্র সঙ্গী নিয়ে নগর পরিক্রমা করেন। কখনও ছদ্মবেশও ধারণ করেন। বিশেষ করে যেদিন রাত্রে পানশালা বা বারাঙ্গনা পল্লীতে যাবার প্রয়োজন বোধ করেন। পণ্যশালাতেও তাঁকে ছদ্মবেশেই যেতে হয়। অনেক সময়েই পরিচিত ব্যক্তিদের দেখতে পান। তারা যাতে তাঁকে চিনতে না পারে, এই জন্যেই ছদ্মবেশ। তাঁর সঙ্গী তাঁকে কখনও 'মহারাজ' বলে সম্বোধন করে না, সে নির্দেশ তাকে দেওয়াই থাকে। কেউ তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তাকে

বলতে হয়, আমার এক বিদেশী বন্ধু।

আজও রাজা রাজপথে নেমেই তাঁর আলাপ আলোচনার বিষয় পাল্টে নিলেন। বললেন, মেয়েদের বড় সুখ।

প্রধান অমাত্য বললেন কেন?

তাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পুরুষ রোজগার করে সংসার প্রতিপালন করতে। কন্যা জন্মালে সৎপাত্র খুঁজে তার হাতে সম্প্রদান করতে হয়। যে বেচারা সেই সৎপাত্র হবে, তারপর থেকে তারই সব দায় দায়িত্ব।

প্রধান অমাত্য জানেন যে এখন আর তিনি রাজার সঙ্গে কথা বলছেন না। তিনি কথা বলছেন একজন বন্ধুর সঙ্গে। তাই তখনই এ কথার প্রতিবাদ করে বললেন, কিন্তু স্ত্রীর যন্ত্রণা কোন অংশে কম নয়।

কেন?

বাপের ঘরে তার দায় দায়িত্ব না থাকলেও শিক্ষানবিশী করতে হয় মায়ের সঙ্গে। তার পর বিয়ে হয়ে গেলেই কাঁধে জোয়াল। কন্যার জন্ম যন্ত্রণা দিয়ে আরম্ভ, শেষ পর্যন্ত স্বামীর সেবা করতে করতেই জীবন শেষ। তার স্বাধীনতাই বা কোথায়, আনন্দই বা কিসে?

কেন, পুরুষ কি একা ফুর্তি করে? মেয়ে না হলে কি ফুর্তি হয়?

কিন্তু সে ফুর্তি তো ঘরের বউ নিয়ে হয় না!

সে বুদ্ধিমতী হলে—

কুলটাদের কথা থাক।

দুজনে পথের দুধারে দেখতে দেখতে চলেছিলেন, আর কান পেতে শুনছিলেন পথচারীদের কথাবার্তা। নানা অভাব ও অভিযোগের দৃশ্য চোখে পড়ছিল। সেই সঙ্গে বিলাস-বাসনের দৃশ্যও তাঁরা দেখছিলেন কল্পনায়। অন্ধকার পথে দারিদ্র্যের চিহ্নই দেখা যায়, বিলাসের দৃশ্য গৃহের অভ্যন্তরে উজ্জ্বল আলোয়। বাইরে থেকে তা দেখা যায় না। দেখা যায় শুধু কল্পনাতেই। রাজা দেখছিলেন, আর ভাবছিলেন এই অবস্থার পরিবর্তন আনা কি সম্ভব নয়। তাঁর রাজ্যে প্রজাদের অবস্থা দু রকম হবে না, এই অন্ধকার পথও হবে আলোকিত গৃহের মতো। দেশে দারিদ্র্য থাকবে না, অভাব থাকবে না অন্ন-বস্ত্রের। অযত্নে অবহেলায় প্রজারা মরবে না, মরবে না রোগে, যুদ্ধে বা আত্মহত্যা করে। সবাইকে কি সমান বাঁচার অধিকার দেওয়া সম্ভব নয়?

এক সময়ে রাজা বললেন, আজ আর পানশালার দিকে নয়, পণ্যাঙ্গনাদের আবাসের দিকেও নয়।

অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললেন প্রধান অমাত্যকে। প্রধান অমাত্য বললেন, তবে কোন্ দিকে যাবেন ?

কোন নির্জন স্থানে চল।

তাঁরা নিঃশব্দে নগরের উপকণ্ঠের দিকে চললেন। এক জায়গায় মনে হল যে কাছে কোন জনবসতি নেই, দূরের বসতিও দেখা যাচ্ছে না। স্থানটি বেশ নির্জন। রাজার পছন্দ হল এই জায়গাটি, বললেন, এসো ঐ গাছের নিচে একটু বসি।

প্রধান অমাত্য চমকে উঠে বললেন, গাছের নিচে ধূলোর ওপরে বসবেন আপনি ?

বলে তাঁর কাঁধের উত্তরীয় দিলেন বিছিয়ে। রাজা হেসে বললেন, ধূলোকে অবজ্ঞা কোরো না, এই ধূলোই একমাত্র সত্য।

রাজা সেই উত্তরীয় সরিয়ে বসলেন, বললেন, তুমি আমার পাশে বোসো তোমার ঐ উষ্ণীষ বিছিয়ে।

আমাকে লজ্জা দেবেন না। বলে প্রধান অমাত্য একটু দূরে বসলেন।

রাজা বললেন, আজ এইটুকু পথ অতিক্রম করে আমার যা মনে হচ্ছে, তাই বলবার জন্যে তোমাকে এই নির্জন স্থানে টেনে আনলাম।

প্রধান অমাত্য রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রাজা বললেন, সব কথা রাজপ্রাসাদে বলা যায় না। রাজারও অনেক দুঃখ আছে। অনেক অক্ষমতার জন্যে দুঃখ। রাজার অনেক কর্তব্য আছে, অনেক দায়িত্ব। কিন্তু তার সামান্যই রাজা পালন করতে সক্ষম। আমরা নহুষের পুত্রদের কথা বলছিলাম। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র যতি রাজা হতে চান নি বলেই যযাতি রাজা হয়েছেন খুব সম্প্রতি। তিনি এখনও তরুণ। সাধারণত রাজ্যাভিষেকের উৎসব হয়, কিন্তু তাঁর বেলায় হয় নি। কিন্তু আমি এই ঘটনাকে স্বাভাবিক মনে করি নি; তাই চর পাঠিয়েছিলাম অনুসন্ধানের জন্যে।

প্রধান অমাত্য এবারে সবিস্ময়ে তাকালেন রাজার মুখের দিকে। তাই দেখে রাজা সহাস্যে বললেন, যতি ভয় পেয়েছিলেন রাজার দায়িত্ব নিতে।

ভয় কিসের ?

তাঁর ধারণা যে রাজত্বের পরিণাম হল নরক।

কেন?

এই রাজ্যে প্রজাদের নিকটে কর গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই। কিন্তু চন্দ্র বংশের রাজারা তাঁদের মন্ত্রীদের পরামর্শে একটি নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। এই নিয়ম তাঁরা গ্রহণ করেছেন ইক্ষাকু ও নাভাগ বংশের রাজাদের নিকট থেকে। ইক্ষাকু বংশের রাজা অনেনা এখন আমার মতোই বৃদ্ধ। তিনি পৃথুকে যুবরাজ নির্বাচন করেছেন। নাভাগ বংশের রাজা বৎসপ্রিয় প্রাংশুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন। রাজা নিমির বংশ লোপ হয়েছে বলেই আমার মনে হয়। এই রাজারা প্রজাদের নিকট থেকে সুনির্দিষ্ট কর গ্রহণ করেন।

প্রধান অমাত্য তাঁর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না, বললেন, আমরা তা করছি না কেন?

দৈত্য ও দানব বংশের রাজারা তা কখনও করেন নি বলে। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তাঁর অমাত্যরা এই যজ্ঞভাগের অংশ পায়। কিন্তু আমরা ধনার্জন করে অমাত্য ও প্রজার জন্য কোষ ক্ষয় করি। এ ভাবে কোন রাজার রাজত্ব চলে না এবং আমি বুঝতে পারছি যে অদূর ভবিষ্যতে দৈত্য ও দানব রাজা থাকবে না।

থাকবে না!

না। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে যে কর গ্রহণের নীতি প্রবর্তিত হয়েছে তা যতির মনঃপূত হয় নি। তাঁর ধারণা যে রাজা যে জন্য কর গ্রহণ করেন, তা না করে পণ্ড করেন। তাঁর রাজ্যের বণিকরা রাজাকে পণ্যের দ্বাদশ ভাগ কর দেয়, অথচ পথে তারা রাজার অর্থরক্ষী পুরুষদের বদলে দস্যুদের কৃপার উপরে নির্ভর করে যাতায়াত করে। গোপ ও কৃষকেরা সেখানে তাদের ঘৃত ও শস্যের ষষ্ঠ ভাগ কর দেয়। যতির ধারণা যে তারা যদি রাজাকে বেশিও দেয় ও রাজা গ্রহণ করেন, তাহলে তা চুরি করা হয়।

প্রধান অমাত্য জিজ্ঞাসা করলেন, চুরি করা হয় কেন?

রাজা বললেন, প্রাচীন কালের পণ্ডিতরা এই ষষ্ঠ ভাগ রাজার রক্ষণ বেতন হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন। রাজা যদি প্রজাকে চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারেন, তাহলে তাঁরই চুরির পাপ হয়। যতি বলেছেন

যে প্রজার কাছে বৃত্তি নেবেন রাজা এবং অন্যে তাদের প্রতিপালন করলে সেই বৃত্তি নেবার দায়ে রাজার নরক ভোগ করা উচিত। তাই তিনি রাজা হয়ে পাপের ভাগী হতে চান নি।

প্রধান অমাত্য বলে উঠলেন, আশ্চর্য!

রাজা বৃষপর্বা বললেন, আশ্চর্য নয়, এ সত্য কথা। রাজা হবার অর্থ সুখভোগ নয়, প্রজাদের সুখের বিধান করাই রাজার প্রথম কাজ। রাজা সে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে রাজ্য শাসনের বা রাজ্যসুখ ভোগের কোন অধিকার তার নেই। আর যে মন্ত্রী ও অমাত্যরা রাজাকে এই কাজে সাহায্য না করে শুধু নিজের স্বার্থই দেখে, তাদের বেঁচে থাকবারও অধিকার নেই।

তার পরেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল, আমাদেব ফেরার সময় হয়েছে।

রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে দানবরাজ বৃষপর্বা নৃত্য সভায় গেলেন না। প্রধান অমাত্যকে বললেন, সবাইকে ছুটি দিয়ে দাও। আমি আজ বিশ্রাম করব।

প্রধান অমাত্য চিন্তিত ভাবে বললেন, মহারাজের দেহ সুস্থ আছে তো?

রাজা বললেন, ভয় নেই, দেহ আমার সুস্থই আছে।

বলে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে মহারানীও উদ্বিগ্ন হলেন, নিকটে এসে একই প্রশ্ন করলেন, কিছু হয় নি তো?

রাজা সহাস্যে বললেন, কেন বলতো?

মহারানী বললেন, শুনলাম আজ রাজ সভায় যাও নি, গিয়েছিলে উদ্যানে।

তারপর?

বোধহয় নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছিলে।

কী করে জানলে?

সবাই তোমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করে, অর্থাৎ তোমার গতিবিধি গোপন রাখা সম্ভব নয়।

রাজা বললেন, সে ইচ্ছা থাকলে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

কী রকম?

আমি উদ্যানে না গিয়ে বলে পাঠাতে পারতাম যে আজ অসুস্থ বোধ করছি বলে রাজসভায় যাব না। তারপর অন্ধকারে একাকী নগর পরিক্রমায় বেরোতে পারতাম।

একাকী!

গোপনীয়তা রক্ষা করতে হলে একাকী বেরোতে হত বৈ কি! কিন্তু সে প্রয়োজন তো আমার নেই!

মহারানী রাজাকে তাঁর আসনে বসিয়ে নিজে ব্যজন করতে লাগলেন। বৃষপর্বা সেবা সামান্যই চান, কিন্তু দাসী ও পরিচারিকাদের সেবা পছন্দ করেন না। তাই রাজা আসছেন শুনেই তারা মহারানীর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে অন্তরালে চলে যায়। মহারানী না ডাকলে কেউ কাছে আসে না। বৃষপর্বা তাঁর যৌবনেও এই রকম ছিলেন। কোন দিন বেশি সুরাপান করেন নি, নৃত্য সভাতেও কোন বিভ্রম ঘটে নি তাঁর। তিনি বরাবরই মিতাচারী ছিলেন এবং এইজন্যেই দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হয়েছেন। একটু পরেই তিনি মহারানীর হাত ধরে তাঁকে পাশে বসিয়ে দিয়ে বললেন, একজনের আরামের জন্যে আর একজন শ্রম স্বীকার করবে, এই নিয়ম চিরকাল চলবে না।

মহারানী বললেন, এ তো কোন নিয়ম নয়, এই কাজে আমিও আরাম পাই।

রাজা বললেন, এই আন্তরিক সেবা অমূল্য বলেই তা চিরকাল থাকবে, যে সেবা মূল্য দিয়ে পাওয়া যায় তা স্বল্পায়ু অর্থাৎ সেই সেবা বেশি দিন পাওয়া যাবে না। পেলেও তা আনন্দ দেবে না, হবে নিরানন্দের উৎস। নির্যাতন বলে তা নিন্দিত হবে!

মহারানী বললেন, ভবিষ্যতের ভাবনায় তুমি সর্বদাই শঙ্কিত থাকো। কিন্তু আমরা এই ভাবনায় কাতর হব কেন?

এর কোন প্রতিবিধান আছে কিনা তা কে ভাববে! জীবনে আমরা একটা আদর্শ অনুসরণ করে আসছি। এ যুগের জনতা চারি দিক থেকে তাকে আঘাত করছে। মনে হচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে আদর্শ বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

আজ এ কথা তোমার মনে হচ্ছে কেন?

আজ নয়, এ আমার প্রতি দিনের চিন্তা।

কেন, বলতো ?

রাজা বললেন, ইলাবৃত বর্ষ থেকে কিছু ব্যক্তি কেতুমাল বর্ষ হয়ে হিমবর্ষে এসেছে। তারা কৃষিকার্য জানে তাই নিজেদের আর্য বলে পরিচয় দেয়। পশুপালনও তাদের বৃত্তি। কিন্তু স্বভাবে যাযাবর, এক জায়গায় তারা স্থির হয়ে বাস করতে পারে না। যারা কৃষিজীবী, তারা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর তীরে বাস করবে বলে স্থির করেছে।

মহারানী বললেন, তারা কি ইন্দ্রের প্রজা ?

ইলাবৃত বর্ষ থেকে যখন এসেছে, তখন তাঁরই প্রজা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যতদূর জানতে পেরেছি, তারা ইন্দ্রের কাছে আসে নি, এসেছে জীবিকার অন্বেষণে। কেউ বলছে, ইলাবৃত বর্ষে এখন শীতের আধিক্য অসহ্য হয়ে উঠেছে দরিদ্র লোকের, আবার কেউ জলের অভাবের কথাও বলছে। তারা এই দেশে বসবাস করবার জন্যে এসেছে বলেই মনে হচ্ছে।

এতে ভয় পাবার কী আছে ?

না, ভয়ের কথা নয়।

তবে ?

ভাবনার কথা।

কিসের ভাবনা ?

এরা যদি কোন দিন এ দেশে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে, তবে এ দেশে আমরা চিরকাল নিন্দিত হব।

আমরা মানে ?

দৈত্য ও দানবেরা।

কেন ?

ইন্দ্রকেই তারা স্তব স্তুতির যোগ্য বলে প্রচার করবে। আমাদের ধর্ম, আদর্শ, নীতি এ সবই এক দিন পালটে যাবে।

মহারানী উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কিন্তু তারা কি এতই প্রবল যে এ দেশের সংস্কৃতি রাতারাতি পালটে দিতে সক্ষম হবে ?

বৃষপর্বা বললেন, অনেক দিন থেকেই তারা এ দেশে আসছিল এবং আসছিল ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এক একজনকে নেতা করে। এই ভাবে তারা সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বলেই প্রবল হয়ে ওঠে নি, মিলিত হলেই প্রবল হবে।

তুমি কি তার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছ ?

আমাদের জীবদ্দশায় আমরা তা দেখব না, কিন্তু এক দিন যে তারা প্রবল হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। আর আমরা দিন দিন যে রকম দুর্বল হয়ে যাচ্ছি, তাতে কোন সংঘর্ষ হলে আমাদের পিছু হটতে হবে।

তুমি তাই মনে কর ?

শুধু মনে করা নয়, বিশ্বাস করি যে সেদিন আসতে আর খুব বেশি দেরি নেই। আজ তারা নিজেদের আর্য বলছে, কাল আমাদের অনার্য বলে ঘৃণা করবে। জয় করতে পারলে বলবে দাস বা দস্যু। আমাদের দেশে আমরাই হব বিদেশীদের দাস।

মহারানী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভবিষ্যৎটা তুমি চিরকালই অন্ধকার দেখ।

রাজা বললেন, ভবিষ্যৎ চিরকালই অন্ধকারের গর্ভে, নির্বোধেরাই সেখানে আলো দেখে।

মহারানী কোন প্রতিবাদ করলেন না দেখে রাজা বললেন, এই আমাদের কথাই ভাবো না। ইন্দ্র যখন আত্মগোপন করে রইলেন, তখন দেবতারা বেরোলেন একজন রাজা খুঁজতে। আমাকে যে তারা মানবে না তা আমি ভাল ভাবেই জানতাম। তাদের সঙ্গে আমি যতই সদ্ভাব রেখে চলি না কেন, তারা আমাকে চিরকালই শত্রু ভাবে। কিন্তু পরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা কী দোষ করেছিল বল ? বৎসপ্রিয় ?

এরা কারা ?

ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা। অনেনা ও বৎসপ্রিয় দুজনেই আশা করেছিল যে তাদের একজনই ইন্দ্রপদ পাবে। দেবতারা যে নহুষকে নির্বাচন করবে, এ তারা ভাবতেই পারে নি।

কেন ?

নহুষের জননী প্রভা তো আমাদের দানব বংশের মেয়ে।

সে কথা ধরলে বলতে হয় যে ইন্দ্রাণী শচীও তো তাই।

হতে পারে। কিন্তু অনেনার পিতা পরঞ্জয়ের কথা ভাবো। সে তো দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদেরই পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করত। একবার তো তারই পরাক্রমে দেবতাদের জয় হয়।

মহারানী বললেন, এই রাজাদের কথা তুমি আমাকে বল নি।

বলি নি ?

না।

বলছি তাহলে।

বলে রাজা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, মনুর পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুর পুত্র হলেন শশাদ।

শশাদ নাম শুনে মহারানী আশ্চর্য হয়েছেন দেখে রাজা বললেন, আসলে তাঁর নাম ছিল বিকুক্ষি, কিন্তু একটা ঘটনায় তাঁর নাম হয় শশাদ।

সেই ঘটনার কথা বলবে না ?

রাজা অস্টকা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যুবরাজ বিকুক্ষিকে বললেন মাংসের ব্যবস্থা করতে। বিকুক্ষি বনে গেলেন শিকারে। সারা দিন পরিশ্রম করে অনেক মৃগ ও শশক বধ করলেন। তারপর ক্লান্তি ও ক্ষুধা দূর করতে একটি শশক খেয়ে বিশ্রাম করলেন এবং অন্য সব মাংস নিয়ে ফিরে এলেন।

তারপর ?

গোলমাল বাধালেন তাঁদের গুরু বশিষ্ঠ। তিনি বললেন যে যুবরাজ শ্রাদ্ধের মাংস থেকে একটি শশক খাবার জন্যে সমস্ত মাংস অপবিত্র হয়ে গেছে।

তবে কী হবে ?

হবে আর কী! এই কথা শুনে রাজা পুত্রকে পরিত্যাগ করলেন। আর লোকে বিকুক্ষির নাম দিল শশাদ।

তাহলে রাজা হলেন কে ?

বৃষপর্বা বললেন, ইক্ষ্বাকুর পর এই শশাদই রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্রের নামই পরঞ্জয়। বীর নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। অসুরদের নিকটে পরাজিত হয়ে দেবতারা পরঞ্জয়ের সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছিল। কিন্তু পরঞ্জয় বলেছিল, সাহায্য করব, তবে একটা শর্ত আছে।

কী শর্ত ?

আমি কোন যান বাহনে চডে যুদ্ধ করব না, ইন্দ্রের কাঁধে চড়ে যুদ্ধ করব। রাজী ?

রাজী হলেন ইন্দ্র ?

রাজী না হয়ে উপায় কী! স্বর্গরাজ্য তো বেহাত হয়েছে, এখন পরঞ্জয় কাঁধে চড়লেই যদি সেই রাজ্য ফিরে পাওয়া যায় তো মন্দ কি।

তাই হল ?

হ্যাঁ, পরঞ্জয় ইন্দ্রের কাঁধে চড়ে যুদ্ধ করে অসুরদের জয় করল। তাঁর নাম হল ককুৎস্থ। অনেনা এই ককুৎস্থ পরঞ্জয়েরই পুত্র। ভুল কোরো না, নহুষের এক ভাইএর নামও অনেনা।

অনেনা নামটা বোধহয় অরণ্য থেকে হয়েছে। সে যাই হোক, অনেনা খুব আশা করেছিল যে দেবতারা তার পিতার সম্মানে তাকেই ইন্দ্রপদ দেবে।

দিল না কেন ?

বুঝতেই পারছ। অপমানটা তারা তখনও ভুলতে পারে নি। যে লোক ইন্দ্রের কাঁধে চেপেছে, তার পুত্রকে ইন্দ্র করলে সে সমস্ত দেবতাদের কাঁধে চেপে বেড়াবে। কাজেই অনেনার ইন্দ্র হওয়া হল না।

আর একজন দাবীদারের নাম বলছিলে ?

নিমি ছিলেন বিকুক্ষির ভাই, কিন্তু যজ্ঞের সময়ে কী একটা গোলমালে তাঁর বংশ লোপ হয়েছিল। আমি বোধহয় বৎসপ্রিয়র কথা বলছিলাম।

হ্যাঁ।

বৎসপ্রিয়র জন্ম ইক্ষ্বাকুর ভাই ন-ভাগের বংশে। এঁর পুত্র নাভাগ এক বণিকের কন্যাকে বিবাহ করে রাজ্যচ্যুত হয়। ভনন্দন যুদ্ধ করে রাজ্য উদ্ধার করেন। বৎসপ্রিয় ভনন্দনের পুত্র। একে অনেকে বৎসশ্রী বলে। বৎসপ্রিয় ইন্দ্রের এক শত্রুকে বধ করে তাঁর প্রিয় হয়েছিল। সেও এক মস্ত কাহিনী।

মহারানী সেই কাহিনী শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলে রাজা বললেন, সে কাহিনীও বলছি।

বলে তিনি বৎসপ্রিয়র কাহিনী বললেন খুব সংক্ষেপে, বৎসপ্রিয় তখন যুবরাজ, সংবাদ পেলেন যে প্রতিবেশী রাজা বিদূরথের কন্যা সুনন্দাকে হরণ করে নিয়ে গেছে এক দৈত্য। তার নাম কুজৃম্ভ। ইন্দ্রও তাকে ভয় পায় তার শক্তির জন্য। তার কাছে এক অসাধারণ মুষল আছে।

মহারানী বললেন, সে কি ! কোন দৈত্য রাজকন্যাকে হরণ করে নিয়ে গেল, এ রকম কথা তো কখনোও শুনি নি !

কী ঘটেছিল আমরাও তা জানি না। শুধু শুনেছি যে রাজকন্যা সখীদের নিয়ে উপবনে গিয়েছিল বেড়াতে। আর কুজৃম্ভ সেখান থেকে তাকে হরণ করে নিয়ে যায়।

কুজৃম্ভ কে ?

জানি নে সে কে, কার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, তার নামও আমি শুনি নি। অনেক সময়ে দেখেছি যে নিজেদের মধ্যেই কোন দুষ্কৃতকারী কারও কন্যা হরণ করলে প্রচার করা হয় যে কোন দৈত্য বা দানব এই কাজ করেছে। কুজ্ম্ভও এই রকম কোন দৈত্য হতে পারে।

তারপর বল।

রাজা বললেন, বৎসপ্রিয় নাকি বিদূরথের কাছে গিয়ে বলেছিল যে সে তার কন্যাকে উদ্ধার করে দেবে।

তারপর ?

বিদূরথ তার দুই ছেলেকে পাঠিয়েছিল। তারা নাকি যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল। আর রাজা ভাবছিল কী করা যায়। এই সময়ে বৎসপ্রিয় এসে এই কথা বলতেই বিদূরথ বলল, বেশ তো, রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনতে পারলে তোমাকেই কন্যাদান করব।

তারপর বৎসপ্রিয় গিয়ে ঘোর যুদ্ধ করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনল, এই তো ?

রাজা হেসে বললেন, এর ওপরে অনেক রঙ চড়ানো হয়েছে।

কী রকম ?

রাজা বিদূরথ অনেক দিন আগে এক দিন মৃগয়া করতে সেই উপবনে এসে ছিল। তখন একটি সুড়ঙ্গ পথ দেখেছিল সেখানে। সুব্রত নামে এক তপস্বীর কাছে রাজা জানতে পেরেছিল যে সেই পথে কুজ্ম্ভ তার রাজ্যে যাতায়াত করে। কুজ্ম্ভের কাছে এমন একটা মুষল আছে যে তার আঘাত কেউ সইতে পারে না। কিন্তু স্ত্রীলোকে তা স্পর্শ করলেই তার আর কোন ক্ষমতা থাকে না। সেই মুষল নিয়ে কুজ্ম্ভ ইন্দ্রকেও জয় করতে পারে। রাজপ্রাসাদে ফিরে রাজা রানীর কাছে যখন এই গল্প বলছিল, তখন রাজকন্যা মুদাবতী শুনেছিল আড়ালে থেকে।

বাধা দিয়ে রানী বললেন, কি বিপদ, তুমি তো রাজকন্যার নাম বলেছিলে সুনন্দা !

ঠিকই বলেছি। যার নাম মুদাবতী ছিল, তারই নাম হয়েছিল সুনন্দা।

কেন ?

সেই মুষলের নাম ছিল সুনন্দ। মুদাবতীকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে তো কুজ্ম্ভ অন্তঃপুরে আটকে রেখেছিল। সে দেখেছিল যে দৈত্য ধূপ দীপ দিয়ে

সেই মুষলের পুজো করে প্রত্যহ। বৎসপ্রিয় তাকে উদ্ধার করতে এসেছে শুনে মুদাবতী গিয়ে সেই মুষল স্পর্শ করে আসে। ব্যাস, আর কি চাই! যুদ্ধে হেরে গেল কুজৃম্ভ। বৎসপ্রিয় মুদাবতীকে নিয়ে ফিরে এল। সুনন্দ মুষলের নামে তারই নাম হয়ে গেল সনন্দা।

মহারানী বললেন, স্ত্রীলোকে ছুঁলে মুষল অকেজো হয়ে যাবে। এ কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

রাজা বললেন, কিন্তু এ কথা এমন ভাবে প্রচার করা হয়েছে যে সরল লোকেরা বিশ্বাস করবে। আর এই সব কথা কারা প্রচার করছে জানো?

না।

কয়েকজন আর্য পণ্ডিত বৎসপ্রিয়র সভায় স্থান পেয়েছে। তারাই তৈরি করছে এই সব গল্প। তাদের ধারণা যে প্রচার দিয়ে মানুষকেও দেবতায় পরিণত করা যায়।

একটু থেমেই রাজা বললেন, কী প্রসঙ্গে যেন আমি এই কাহিনী তোমাকে শোনালাম?

মহারাণী ভেবে বললেন, তুমি বলছিলে ইন্দ্রপদের জন্য দেবতারা নহুষকে কেন নির্বাচন করল।

মনে পড়েছে। এই বৎসপ্রিয় সুনন্দাকেই বিবাহ করেছিল। সেও ইন্দ্রের একজন মিত্র এবং দৈত্য বধ করার জন্য তাঁর প্রিয় হয়েছিল। কিন্তু দেবতারা ইক্ষ্বাকু বংশের অনেনা বা নাভাগ বংশের বৎসপ্রিয়কে পছন্দ না করে চন্দ্র বংশের নহুষকে ইন্দ্রপদের জন্য নির্বাচন করে নিয়ে গেল। নহুষকে আমি জানি। ধার্মিক বলে তাঁর সুনাম ছিল। কতকটা আমাদের জামাতা বিরোচনের মতো। অর্থাৎ ধর্মের জন্য নিজের গর্দান দিতেও পেছপা হবেন না। কিন্তু স্বর্গ এমনই রাজ্য যে নহুষও বদলে গেলেন। তিনিও বুঝতে পারলেন বুদ্ধিমানেরা ধর্মের নামে মানুষকে বোকা তৈরি করে রাখে। শক্তিমানকে ধর্মের নামে বোকা বানিয়ে প্রভুত্ব করবে দুর্বল চালাকরা। এই ভাবেই দেবতারা দৈত্যদের উপরে চিরকাল প্রভুত্ব করতে চেয়েছে। এখন দেখছি আর্য নামে যে সব পণ্ডিতরা মানব রাজাদের সভায় স্থান পেয়েছে, তারা দেবতাদের নামেই যশোগান গাইছে।

কেন?

এসেছে তো বাইরে থেকে। ভাবছে, এ দেশের লোককে হীন প্রতিপন্ন

করতে পারলে এক দিন তারাই সমাজে প্রভুত্ব করতে পারবে। আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে সূর্য ও চন্দ্র বংশের রাজারা কি তাদের অভিসন্ধি বুঝতে পারছে না! সবাই এক একজন আর্য ঋষিকে পুরোহিত মনোনয়ন করেছে এবং তার কথা মতোই চলছে।

মহারানী বললেন, এ তো তারা আমাদের কাছেই শিখেছে। আমরাও কি এই ভাবেই চলি না?

রাজা বললেন, ঠিক কথা। আমাদের গুরুদেব সন্তানের মতো আমাদের পালন করেন। প্রাণ দিতে পারেন আমাদের কল্যাণের জন্য। কিন্তু ইন্দ্রের নামে স্তব-স্তুতি রচনা করেন না।

মানব রাজাদের পুরোহিতরা কি তাই করছে?

তাই তো শুনতে পাচ্ছি। শুধু ইন্দ্রের নামে নয়, অন্যান্য অনেক দেবতার নামেই তারা স্তব রচনা করছে। কোন দিন শুনবে, দেবতাদের তুষ্টির জন্যে আমাদেরও নিন্দা ছড়াচ্ছে।

মহারানী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাই দেখে রাজা বললেন, এ সবের জন্যে আমি ভাবি না।

কেন?

আমাদের জীবন তো শেষ হয়ে এসেছে। আমার ভাবনা শর্মিষ্ঠার জন্যে। তাকে পাত্রস্থ করতে হবে, কিন্তু সৎ পাত্রের সন্ধান পাচ্ছি না।

কেন, আমাদের সমাজে কেউ নেই?

রাজা হবার যোগ্য কোন যুবক তো এখনও আমার নজরে পড়ে নি। তাই সূর্য ও চন্দ্র বংশের যুবরাজদের খবর রাখছি। পৃথু অনেনার রাজ্য পাবে।

পুরাকালেও তো পৃথু নামে এক রাজা ছিলেন।

এ সে নয়। এ হল ইক্ষাকু বংশের ছেলে। বৎসপ্রিয়রও বারোটি ছেলে আছে, তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রাংশু যুবরাজ নির্বাচিত হয়েছে। ও দিকে চন্দ্র বংশে যতি রাজা হতে চাইল না বলে তার ছোট যযাতি রাজা হয়েছে। তার সম্বন্ধে এখনও কিছু জানি না। তবে তার অনেক ভাই আছে, তাদের কেউ রাজ্যের অধিকার পেয়েছে কিনা কে জানে। নহুষ কোন ব্যবস্থা করে গেছেন কিনা সে খবর পাই নি।

আর কেউ?

বৃষপর্বা চিন্তিত ভাবে বললেন, ইন্দ্রেরও একটি পুত্র আছে, নাম জয়ন্ত।

মহারাণী যেন চমকে উঠলেন। তাই দেখে বৃষপর্বা বললেন, কেন, শচী তো আমার ভাই এর মেয়ে।

কিন্তু তোমার ভাই তো ইন্দ্রের হাতে কন্যাদান করে নি।

তা করে নি। কিন্তু আমি তা করলে কি অন্যায় হবে?

ইন্দ্র রাজী হবেন কেন?

দেবাসুরের যুদ্ধ চিরকালের মতো শেষ হয়ে যাবে বলে।

মহারানী আশ্চর্য হয়ে বললেন, এমন আশাবাদী তুমি!

বৃষপর্বা বললেন, আমি বুঝতে পারি। তিনিও যে আমার মতোই ভাবছেন তাতে আমার সন্দেহ নেই। গৃহ বিবাদেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। আর এই সুযোগে প্রবল হয়ে উঠছে সূর্য ও চন্দ্র বংশের রাজারা।

মহারানী নীরবে রইলেন। আর রাজা বললেন, আমাদের এই বিপদে ইন্ধন যোগাতে এসেছে আর্য ঋষিরা। তারা আমাদের উভয়কেই ধ্বংস করতে চায়।

মহারানী অন্য কিছু ভাবছিলেন। তা বুঝতে পেরে রাজা বললেন, তুমি কী ভাবছ?

মহারানী বললেন, শুনেছিলাম, জয়ন্তী নামে ইন্দ্রের এক কন্যা আছে। ইন্দ্র কি তার বিবাহের কথা ভাবছেন না?

বৃষপর্বা গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন, না।

কেন?

কথাটা বলার মতো নয় বলেই এত দিন বলি নি।

কী হয়েছে তার?

সে নাকি নিজেই তার পতি নির্বাচন করেছে।

মহারানী চমকে উঠে বললেন, কাকে?

জানি নে কাকে।

বলে বৃষপর্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তবে সে আর অমরাবতীতে নেই।

মহারানী বললেন, আশ্চর্য!

জগতে আশ্চর্য বলে কিছু নেই, সবই সম্ভব।

বলে বৃষপর্বা আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধ্যানে মগ্ন হয়ে দৈত্যগুরু শুক্র জানতে পেরেছিলেন যে বৃহস্পতির পুত্র তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে এসেছে সঞ্জীবনী বিদ্যালাভের জন্য। এত দিন তিনি এই বিদ্যা নিজের কুক্ষিগত রেখেছিলেন এবং এই বিদ্যার প্রভাই তিনি যুদ্ধে মৃতপ্রায় অসুর সৈন্যদের বাঁচিয়ে তুলতেন। এই বিদ্যা দানের যোগ্য কোন শিষ্য তিনি আজও পান নি, তাই অপাত্রে তিনি এই বিদ্যা দান করেন নি। তাঁর বয়স হয়েছে এবং এক দিন তাঁকে এই জগৎ থেকে বিদায় নিতে হবে। সেদিন লোপ পাবে এই সঞ্জীবনী বিদ্যা। তাতে ক্ষতি হবে জগতেরই। গৃহ বিবাদে দেবতা ও অসুররা তো নিঃশেষ হয়ে এসেছে। অল্প দিন পরেই এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বেঁচে থাকবে মনুর বংশ। যারা মানুষ নামে পরিচিত হচ্ছে। তাঁর মৃত্যুর পরে এই সঞ্জীবনী বিদ্যা মানুষের কাজে আর লাগবে না।

কিন্তু দেবতাদের উপকারের জন্য কচকে কি এই বিদ্যা দেওয়া যায়? সে কি যোগ্য এই বিদ্যা লাভের? অসুরদের মধ্যে তো কাউকে তিনি এই বিদ্যা দানের যোগ্য বলে বিবেচনা করেন নি। কচকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলে এই বিদ্যা তাকে দিতে হবে। গুরু নিঃশেষে তাঁর সমস্ত অধীত বিদ্যা দান করবেন উপযুক্ত শিষ্যকে, এই তো ধর্ম। কচকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করবার আগে এই কথা তাঁকে বিচার করে দেখতে হবে।

কচকে তিনি ফিরিয়ে দেন নি, তাকে বসতে দিয়েছেন শিষ্যদের সঙ্গে। কচ এখন ব্রত পালন করছে, যথাসময়ে তাকে দীক্ষা দিতে হবে। অন্যান্য শিষ্যদের মতো ব্রত পালন করেই সে বিদ্য লাভের অধিকারী হবে। তখন তাকে তিনি বলতে পারবেন না যে সমস্ত বিদ্যা তোমাকে দেব না। তাই তাকে সব দেবার ইচ্ছা না থাকলে এখনই তাকে বিদায় দেওয়া উচিত হবে। নিষ্ঠুরের মতো বলতে হবে, না, তোমাকে আমি দীক্ষা দেব না। সে যদি জানতে চায়, কেন? তবে তাকে বলতে হবে, তুমি আমাদের শত্রুপক্ষের বিদ্যার্থী।

কিন্তু বিদ্যার্থীদের মধ্যে কি শত্রু বা মিত্র আছে? না বিদ্যার্থীদের মধ্যে কেউ তাদের গুরুকে শত্রু বা মিত্র বলে মনে করতে পারে? গুরু শিষ্যের সম্পর্ক তো এখনও আছে পূর্বের মতোই পবিত্র। তাঁর নিজের

গুরু অঙ্গিরার কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর পুত্র বৃহস্পতির সঙ্গে তিনি এক সঙ্গে বসে অধ্যয়ন করেছেন। তখন তিনি উশনা নামে পরিচিত ছিলেন এবং বৃহস্পতিকে সবাই অঙ্গিরস নামে জানত। আজও তাঁর স্পষ্ট মনে আছে যে গুরুদেবের নিকটে তিনি তাঁর পুত্র বৃহস্পতির চেয়েও অনেক বেশি স্নেহ পেয়েছেন। নিজের পুত্র নয় বলে বিদ্যা দানে কোন কার্পণ্য করেন নি তিনি।

আজ এত দিন পর দৈত্য গুরু শুক্র এর কারণ ভাবতে লাগলেন। সে কি তাঁর সত্য নিষ্ঠা, চরিত্র বল, না গুরু সেবা? না তাঁর বিদ্যার্জনের জন্য আন্তরিক অভিলাষ? তিনি কি সর্ব প্রযত্নে নিজেকে সকল বিদ্যা লাভের যোগ্য বলে প্রমাণ করেন নি? কিন্তু কারণ যাই হোক, তিনি গুরুর আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস যে তিনি গুরু পুত্রের চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছিলেন তাঁর গুরুর কাছে। আজ সেই গুরুর পৌত্র এসেছে তাঁর শিষ্য হবার জন্যে। তাকে কি তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন?

গুরুদেব মহর্ষি অঙ্গিরার কথা তাঁর মনে পড়ল। তাঁর তেজপ্রভায় অগ্নিও নিজেকে নিষ্প্রভ মনে করতেন। তাঁর সুগঠিত দেহ ও রূপলাবণ্য সেকালে ঈর্ষার বস্তু ছিল। তিনি বিবাহ করেছিলেন কর্দম ঋষির কন্যা শ্রদ্ধাকে। সর্বগুণান্বিতা ছিলেন তিনি। মায়ের মতো স্নেহ করতেন তাঁর স্বামীর শিষ্যদের, নিজের দুই পুত্র উতথ্য ও বৃহস্পতির সঙ্গে কোন প্রভেদ করতেন না। বৃহস্পতি তাঁর সমবয়সী ছিল, কিন্তু সে তার পিতার মতো রূপবান হয় নি। মহর্ষি অঙ্গিরার পাশে তাকে কুৎসিত বলেই মনে হত।

মহর্ষি কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির কয়েকটি কন্যাকে এক সঙ্গে বিবাহ করে-ছিলেন। জ্যেষ্ঠা পত্নী অদিতির পুত্ররা মহর্ষি অঙ্গিরাকেই পুরোহিত পদে বরণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি এ কাজে রাজী হন নি। বলেছিলেন যাগ যজ্ঞ আমার কাজ নয়, তোমরা আমার পুত্র বৃহস্পতিকে এ কাজে বরণ করতে পারো। দেবতারা মহর্ষির কথায় তাই করেছিল। বৃহস্পতি দেবতাদের পৌরোহিত্য করতে গেলেন।

তারপর কশ্যপের দ্বিতীয় স্ত্রী দিতির পুত্ররা এসেছিল তাঁর কাছে। মহর্ষি বললেন, তোমরা আমার এই প্রিয় শিষ্য উশনাকে নিয়ে যাও। ইনি তোমাদের গুরু হবার যোগ্য। এঁকে শুক্রাচার্য বলবে। আমি একে আমার সমস্ত বিদ্যা দান করেছি। এ আমার গৌরব বৃদ্ধি করবে। দৈত্যরা সেই

দিনই উশনাকে প্রণাম করে বরণ করেছিল। সেদিন থেকেই তিনি হয়েছেন শুক্রাচার্য।

কচ তার পিতামহর রূপ পেয়েছে। তাঁরই মতো দীর্ঘ সবল দেহ, প্রজ্বলিত অগ্নির মতো গাত্র বর্ণ, প্রিয়দর্শন রূপ, প্রিয়বাদী, স্মিত হাসি তাঁর ওষ্ঠাধরে। এমন শিষ্যকে কি ফিরিয়ে দেওয়া যায়!

কিন্তু তবু তাঁর প্রিয় শিষ্যদের কল্যাণের জন্য দেবতাদের অভিসন্ধি তাঁর জানা দরকার। তিনি কাছে ডাকলেন কচকে, বললেন, বৎস, আমি নিভৃতে তোমার কাছে একটি কথা জানতে চাই।

কচ সবিনয়ে বলল, আজ্ঞা করুন গুরুদেব।

দীক্ষার পূর্বেই তুমি আমাকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করলে!

আমি কি ভুল করেছি।

ভুল নয়, ভুলের কথাও নয়।

তবে কি অনুশাসনের কথা? তাহলে আমি বলব, আমি তো শুধু আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীর পুত্র নই, আমি আপনার গুরুর পৌত্র, আপনার পুত্রপ্রতিম। আমি আপনারই পুত্র বলে দাবী করতে পারি।

শুক্র অভিভূত হলেন এই কথা শুনে, বললেন, এ কথা তোমাকে কে বলেছে বৎস?

এ আমারই কথা প্রভু, আমার বিবেক আমাকে এই কথা শিখিয়েছে। এ যদি আমার বিশ্বাসের কথা না হত, তবে এই সুদীর্ঘ দুর্গম পথ আমি একাকী অতিক্রম করে আসবার মতো দুঃসাহসী হতাম না। আমি জানি, আমি আপনার পুত্র স্নেহের যোগ্য হতে পারব।

শুক্র বললেন, বোসো আমার সামনে।

কচ উপবেশন করে বলল, এইবারে বলুন, কী জানতে চান আমার কাছে।

শুক্র একটু ইতস্তত করলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, তুমি সত্য বল, কে তোমাকে আমার নিকটে পাঠিয়েছে।

কচ বলল, আমি কখনও মিথ্যা বলি না প্রভু। আপনি বিশ্বাস করুন, সত্য ভিন্ন অন্য কিছু আমি আপনাকে বলব না।

তুমি নির্ভয়ে বল।

সত্য বলতে আমি কখনও ভয় পাই না। দেবতাদের এক প্রতিনিধি

দল আমার কাছে এসেছিলেন। বলেছিলেন, আমরা তোমাকে গুরুপুত্র রূপে ভজনা করি, তুমিও আমাদের সহায়তা করে আমাদের ভজনা কর। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি আপনাদের কী সাহায্য করতে পারি? তাঁরা বললেন, তোমার বয়স অল্প, তাই তুমিই এ কাজ পারবে।

শুক্র বললেন, কী কাজ?

তাঁরা অকপটে তাঁদের ভয়ের কথা আমাকে বললেন। আপনি যে সঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন, তার প্রভাবে আপনি যুদ্ধে নিহত অসুরদের প্রাণ দান করতে পারেন। কিন্তু এ বিদ্যা আমার পিতার অজ্ঞাত। দেবাসুরের যুদ্ধে নিহত দেবতাদের তিনি বাঁচিয়ে তুলতে পারেন না। তাই তাঁরা চান যে আপনার নিকটে যে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা আছে, আমি তা আহরণ করে আনি। তাঁরা আমাকে যজ্ঞের ভাগ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

দৈত্যগুরু শুক্র স্তব্ধ হয়ে রইলেন, কিন্তু কচ থামল না। সে বলে চলল, তাঁরা আমাকে বলেছেন, এই বিদ্যা দিয়ে আপনি দৈত্য ও দানবদের রক্ষা করেন, যারা দানব নয় তাদের আপনি রক্ষা করেন না। কিন্তু সমস্ত জাতির কল্যাণের জন্যই এই বিদ্যা আমাকে আহরণ করতে হবে। আমার বয়স অল্প বলেই তাঁরা মনে করেছেন যে আমি আপনার আরাধনা করে এই বিদ্যা আহরণে সমর্থ হব।

দৈত্যগুরু তাকে কোন বাধা দিলেন না। কচ বলে চলল, তাঁরাই আমাকে বলেছেন যে আপনি এখন দানবরাজ বৃষপর্বার রাজ্যে আছেন, আপনার আশ্রম তাঁর প্রাসাদের সন্নিকটে। দেবযানী নামে আপনার একটি কন্যা আছে। তাঁরা আমাকে এ কথাও বলেছেন যে অন্যের পক্ষে যা সম্ভব নয় সেই কাজও আমি করতে পারব।

কী কাজ?

গুরুর সঙ্গে গুরু কন্যারও আরাধনা।

দৈত্যগুরু চমকে উঠলেন। এই সরল সত্যবাদী কিশোর তাঁর কাছে কিছুই গোপন করছে না। যৌবনে পদার্পণ করতে এর বিলম্ব নেই, কিন্তু সে সম্বন্ধে সে আজও সচেতন নয়। তাই এমন অকপটে এই কথা তাঁকে বলতে পারল। তিনিও নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করলেন, আর কী বলেছেন তাঁরা?

কচ বলল, বলেছেন, আমি যদি আমার শীল আচার মাধুর্য দাক্ষিণ্য ও গুণের দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তবে আপনার নিকট থেকে

সেই বিদ্যা আমি অবশ্যই লাভ করতে সক্ষম হব।

শুক্রাচার্য মুগ্ধ হলেন এই তরুণ বিদ্যার্থীর সত্যনিষ্ঠা ও সারল্যে। বললেন, তোমার পিতা কী বললেন ?

তিনি কিছু বলেন নি।

দেবরাজ ইন্দ্র ?

তাঁর সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয় নি।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের মনে সন্দেহ এসেছিল যে দেবরাজ ইন্দ্রই বোধহয় তাঁর গুরুপুত্রকে পাঠিয়েছে তার কাছে। কিন্তু কচের কথায় মনে হল যে তা নয়, তারা নেপথ্যে ছিল। কচকে তাঁর কাছে পাঠাবার চক্রান্ত যে-ই করে থাক, সে আড়ালেই থেকে গেছে। কচ সরল ভাবে জেনেছে যে মৃতসঞ্জীবনীর মতো একটা বিদ্যা জগতের সব লোকের কল্যাণে লাগুক; শুধু দৈত্য ও দানবের নয়, দেবতা ও মানুষের কাজেও ব্যবহৃত হোক। তাই সে এই বিপুল কষ্ট স্বীকার করে এসেছে ইলাবৃত বর্ষ থেকে হিমবর্ষে, গন্ধমাদন পর্বত পেরিয়ে, একা অসহায় ভাবে। ধন্য তার সংকল্প, প্রশংসার্হ তার উদ্যম, তার ত্যাগেরও কোন তুলনা নেই। দৈত্যগুরু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এসো।

বলে কচকে দুহাতে তার বুকে টেনে নিলেন।

অপরাহ্ণে আকাশের দিকে তাকাতেই কচকে আকর্ষণ করল নদীর ধারের সেই রমণীয় নির্জন স্থান। কচ সেই দিকেই ধীরে ধীরে পা বাড়াল একা। কোন দানব বালককে সে সঙ্গে যাবার জন্য ডাকল না, দেবযানীকেও বলল না কিছু। কিন্তু দেবযানী তাকে দেখতে পেয়েছিল। কুটিরের বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ ?

কচ থমকে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে তাকাল। দেবযানীকে দেখতে পেয়ে বলল, তুমি আমাকে বলছ ?

হ্যাঁ, আর কে আছে এখানে !

কচ বলল, নদীর ধারে।

তা একা যাচ্ছ কেন ?

একাই তো ভাল।

সে কি ! তোমার একা ভাল লাগে ?

কচ সংক্ষেপে বলল, হ্যাঁ।

দেবযানী আশ্চর্য হয়ে বলল, কেউ সঙ্গে থাকলে তোমার ভাল লাগে না ?

কচ সহসা 'না' বলতে পারল না। বলল, একা থাকলে নিজেকে চেনা যায়। নিজেকে চেনা খুব দরকার।

দেবযানী বলল, এ আবার কী রকম কথা ?

কচ বলল, পণ্ডিতরা তো তাই বলেন, নিজেকে চেনো ; নিজেকে চিনতে পারলেই অপরকে চেনা যাবে। আমরা নিজেকে ভাল করে চিনি না বলেই তো অপরকে ঠকাই।

দেবযানী বলল, আমি তোমার সঙ্গে যাব ?

তুমি !

হ্যাঁ, আমি।

কচ ইতস্তত করছে দেখে বলল, তুমি এখানে নতুন এসেছ, পথ ঘাট তো চেনো না।

কচ বলল, নদীর ধারে একটা জায়গা আমার খুব ভাল লেগেছে।

দেবযানী বলল, তার চেয়েও অনেক ভাল জায়গা আছে এখানে।

কচ বলল, তবে একটা নির্জন জায়গা আমাকে দেখিয়ে দাও না। যেখানে কেউ যায় না, কেউ আসবে না আমাকে খুঁজতে, আমি একা বসে থাকতে পারব।

এসো।

বলে দেবযানী কচকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হল। পথে যেতে যেতে বলল, সেই নির্জন জায়গায় একা বসে তুমি কী করবে ?

কচ বলল, গান গাইব।

গান !

হ্যাঁ, গান। একজন গন্ধর্বের কাছে আমি গান শিখতে আরম্ভ করেছিলাম, নাচও শিখেছি।

দেবযানী আশ্চর্য হয়ে গেল এই কথা শুনে। বলল, ঋষিকুমারেরা কি নাচ-গান শেখে ?

শিখবে না কেন। এও তো বিদ্যা।

কিন্তু এখানে কেউ নাচ গান শেখে না। রাজার নৃত্য সভা আছে, সেখানে পাত্র-মিত্র নিয়ে রাজা নাচ দেখেন অপসরাদের। গন্ধর্বরা গান গায়।

তার পরেই প্রশ্ন করল দেবযানী, কেউ তোমার নিন্দা করে নি ?

দেবতারা তো আমাকে উৎসাহ দিতেন তাড়াতাড়ি নাচ গান শিখে নেবার জন্যে।

আশ্চর্য !

আশ্চর্য কেন ?

আমরা ভাবি, খারাপ লোকেরাই এই সব করে।

কচ বলল, তা কেন হবে !

দেবযানী বলল, সত্যিই তো।

নদীর তীরে তারা পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু দেবযানী কচকে অন্য পথে আরও এগিয়ে নিয়ে চলল। বনের মধ্যে দিয়ে সেই পথ আরও দূরে গেছে। তারপর এক জায়গায় পৌঁছে দেখা গেল যে সেখানে সেই নদী ঝর্ণার মতো ঝর্ঝর করে নিচে নেমেছে পাহাড়ের গা থেকে। সেখানে পৌঁছে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়াল কচ। তার দৃষ্টি সেই ঝর্ণার দিকে নিবদ্ধ। দেবযানীর কথা সে ভুলে গেল।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকবার পর দেবযানী বলল, কী দেখছ এমন মনোযোগ দিয়ে ?

কচ চমকে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, তোমাদের দেশটা কী সুন্দর !

আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দেবযানী বলল, তোমার খুব ভাল লাগছে ?

হ্যাঁ।

তারপর বলল, এরও ওপরে গেলে বোধহয় আরও সুন্দর জায়গা দেখতে পাব, তাই না ?

দেবযানী সভয়ে বলল, না না, এর ওপরে আর যেও না।

কেন ?

যেতে বারণ করে সবাই। বলে এমন অনেক জন্তু আছে যার কাছে যাওয়া উচিত নয়। তার চেয়ে এসো, এখানেই আমরা একটু বসি।

সেই ভাল।

বলে কচ একটা পাথরের উপরে বসল. আর দেবযানী তার মুখোমুখি বসল আর একখানা পাথরের উপরে। বলল, তোমাকে আজ এখানে টেনে আনলাম কেন জানো ? নদীর ধারে সেই জায়গাটায় আমরা বেশিক্ষণ বসতে পারতাম

না।

কেন ?

সবাইকে নিয়ে বাবা ঐ ঘাটে আসেন সূর্যাস্তের আগে। স্নান করে বন্দনা করেন সূর্যের। ছেলেরা তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বন্দনা গান গায়।

কার বন্দনা ?

সন্ধ্যার।

সেও তো গান !

দেবযানী বলল, না, গান নয়, তাকে স্তোত্র পাঠ বলে। সুর করে পড়া।

কচ বলল, আমি তোমার বন্দনা করব ?

আমার বন্দনা !

বলে সে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল কচের মুখের দিকে। দেখল যে তার বেশভূষা দানব বালকদের মতো নয়। সে এমন ভাবে বস্ত্র পরিধান করেছে যে তাকে দেখতে ভারি ভাল লাগছে। কাষায় রঙের সেই বস্ত্র ভারি সুন্দর মানিয়েছে তাকে। দেবযানী যখন মুগ্ধ নয়নে তাকে দেখছে, তখন কচ হেসে বলল, কী দেখছ ?

তোমাকে।

আমি কি দেখবার মতো বস্তু ?

দেবযানী বলল, তোমার এই কাষায় বস্ত্রে তোমাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

কচ বলল, তোমাদের এখানে ফুল নেই ?

কেন থাকবে না ! গাছে গাছে কত রকমের ফুল ফোটে।

তোমরা কী কর সেই ফুল দিয়ে ?

গাছ থেকে ফুল তুলব কেন ? ফুল তো গাছেই ভাল।

কচ বলল, আমরা সেই ফুল তুলে মালা গাঁথি। আর সেই মালা পরি গলায়। ফুল সুগন্ধ হলে কত ভাল লাগে বল।

দেবযানী বলল, আমরা তো ফুল ঝরে যেতে দিই।

কচ বলল, সে তো ভাল নয়। ফুলের জন্ম গন্ধ বিলোবার জন্যে। গলায় সুগন্ধ মালা পরলে তো সবাই গন্ধ পাবে।

কেমন করে মালা গাঁথো ?

কাল দেখিয়ে দেব তোমাকে।

তবে আজ একটা গান শোনাও।

গান শুনবে।

হ্যাঁ। তোমাদের গান কী রকম তা শুনতে ইচ্ছে করছে।

কচ খুশি হল এই প্রস্তাব শুনে। অল্প দিন হল সে গান শিখতে শুধু করেছে একজন দেবতারই পরামর্শে। তিনি তাকে বলেছিলেন, তোমার গলায় এমন মিষ্টি সুর, তুমি গন্ধর্বদের চেয়েও ভাল গান গাইতে পারবে। কিন্তু কচ বলেছিল, গান শিখে কী লাভ হবে? সেই দেবতা বলেছিলেন, লাভ! তুমি যুবক হবে আর কিছুদিন পরে, তোমার গান শুনে যুবতী মেয়েরা তোমার—

বল।

তোমার প্রেমে পড়ে যাবে।

দেবযানী হেসে বলল, তাই বুঝি তুমি গান শিখেছ?

না, সেজন্যে নয়।

তবে?

গান আমার ভাল লাগে বলেই আগেই আমি গান শিখেছি।

আর নাচ?

নাচ শিখেছি অপ্সরাদের নাচ দেখে। যে গন্ধর্বের বাড়িতে গান শিখতাম, সেখানে অপ্সরাদের মেয়েরা নাচ শিখত। সেই নাচ দেখে দেখেই আমি নাচ শিখেছি।

দেবযানী বলল, এইবারে তোমার গান শোনাও।

কচ গুণগুণ করে গান ধরল। কোন কথা নেই, শুধু শব্দ নিয়েই খেলা করল কিছুক্ষণ। তারপরে দু একটি কথাই ফিরে ফিরে নানা ভাবে গাইতে লাগল। দেবযানীর এই শব্দ নিয়ে খেলা ভারি ভাল লাগছিল। তাই নিঃশব্দে চেয়ে রইল কচের মুখের দিকে। গান থামলে দেবযানী বলল, তোমার এ গান বন্দনা গানের মতো নয়।

তবে কী রকম?

আরও ভাল। আরও সুন্দর।

গানের কি রূপ আছে যে তাকে সুন্দর বলা যায়।

কী বলব তাহলে?

মনোহর। মন হরণ করে গান।

দেবযানী বলল, তুমি নাচবে না?

আজ থাক।

কেন ?

আর এক দিন নাচব।

সেই ভাল। তবে আজ চল।

সন্ধ্যা হবার আগেই আমাকে আশ্রমে ফিরতে হবে।

কেন ?

সন্ধ্যাদীপ জ্বালতে হবে না! অন্ধকার থাকবে কি আমাদের আশ্রম!

কচ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ কাজ বুঝি তোমার ?

দেবযানী বলল, আমি আর ধাত্রী ছাড়া আশ্রমে আর কে আছে বল। তবে ধাত্রী এ সব কাজ করে না। বাবা তো নদীর ধারে যান এই সময়ে। ফিরে এসে সন্ধ্যাদীপ না দেখলে খুব চিন্তিত হবেন।

কেন ?

ভাববেন আমার শরীর খারাপ। নয় মন।

তবে তাড়াতাড়ি চল।

ফেরার পথে দেবযানী বলল, দীক্ষার পর বাবা বোধ হয় তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তখন আমাকে একা থাকতে হবে এই সময়টা।

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

শুভদিন দেখে দীক্ষা হল কচের। খুবই সরল অনুষ্ঠান। কচ সমিধ আহরণ করে আনল, আর কুশ। অগ্নিহোত্রে দৈত্যগুরুর সঙ্গে কুশের উপরে একত্রে বসে অগ্নির পরিচর্যা করল। বলল, আমি আপনার কাছে বিদ্যালাভ করতে চাই।

শুক্রাচার্য বললেন. যতদিন তুমি ব্রহ্মচারী ব্রতধারী হয়ে আমার আশ্রমে বাস করবে, ততদিন আমি তোমাকে বিদ্যাদান করব।

কচ বলল, ব্রহ্মচারীর ব্রত নিয়ে আমি আপনাদের সেবা করব অবিরত। আমাকে আপনি পুত্রতুল্য জ্ঞান করবেন।

তথাস্তু। বলে গুরু আশীর্বাদ করলেন এই নবীন শিষ্যকে। তারপর দুজনে অগ্নিহোত্র থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে বৃক্ষের নিচে বসলেন। অন্য শিষ্যরাও কচের এই দীক্ষা গ্রহণের দৃশ্য দেখল নিঃশব্দে। দেখল দেবযানীও। দৈত্যগুরু কয়েকটি গাভী পরিচর্যার ভার দিলেন কচের উপরে। সমস্ত

শিষ্যের উপরেই এই রকমের কিছু কিছু দায়িত্ব দেওয়া আছে। সবাইকেই কাজ করতে হয়। সবাই যেন একই পরিবারের লোক।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিষ্যদের অধ্যয়ন করতে হয়। শিষ্যরা গুরুকে বেষ্টন করে বসে। নানা বিষয়ে কথা বলেন গুরুদেব। তারা আশ্চর্য হয়ে শোনে, আর ভাবে যে কত কথাই জানেন তাদের গুরুদেব। জানার কথার বুঝি কোন শেষ নেই।

সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে কচ। দিনের বেলায় গাভী চরানোই তার একমাত্র কাজ নয়, নানা ভাবে গুরুর পরিচর্যাও করতে হয়। অবসর সময়ে সে গুরুকন্যার মনোরঞ্জন করে। গাভীদের নিয়ে বেরোবার সময়ে কচ দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার জন্যে কিছু আহরণ করে আনতে হবে?

দেবযানী বলে, কিছু চাইনে তো আমার!

কোন ফল ফুল?

ফল তো অন্যেরা আহরণ করে!

কিন্তু কচ জানে যে কেউ কিছু না চাইলেও দিতে হয়, প্রার্থী হবার সুযোগ দিতে নেই কাউকে। তাই কিছু চাইবার আগেই তার প্রিয় জিনিসটি সময়মতো যুগিয়ে যেতে হয়। তাই গাভীদের এক শ্যামল উপত্যকায় নিয়ে গিয়ে সে তাদের ছেড়ে দেয় চরে খাবার জন্য, আর নিজে খুঁজে বেড়ায় সুন্দর জিনিস; গুরুদেবের জন্য শুকনো সমিধ সংগ্রহ করে, আর দীর্ঘ কুশ; দেবযানীর জন্য নানারকম সরস ফল। ফুলও সংগ্রহ করে। ফিরে আসে অন্ধকার হবার অনেক আগেই। গাভীদের গোষ্ঠে রেখে সমিধ ও কুশ এনে রাখে অগ্নিহোত্রে গুরুদেবের আসনের পাশে। আর ফুল ও ফল তুলে দেয় দেবযানীর হাতে।

দেবযানী এই সব ফলের কিছু দেয় কচকে ফিরিয়ে, কিছু রাখে নিজে। আর ফুল হাতে নিয়ে হেসে বলে, এই ফুল দিয়ে আমি কী করব?

কচ বলে, কেন, মালা গেঁথে গলায় পর, চুলে জড়িয়ে রাখো।

দেবযানী লজ্জা পেয়ে বলে, কী বলবে সবাই।

কী আবার বলবে! ফুলের মালা গলায় দিলে বড় সুন্দর দেখাবে তোমাকে।

সবাই যে হাসবে!

বলে দেবযানী পালিয়ে যায় কচের সামনে থেকে।

সায়াহ্নে স্নান ও বন্দনা সেরে গুরুদেব শিষ্যদের নিয়ে ফিরে আসেন নদীতীর থেকে। অগ্নিহোত্রে নিজের আসনে বসে আশ্চর্য হয়ে যান। তাঁর হাতের কাছে শুকনো সমিধ আর দীর্ঘ কুশ দেখে জিজ্ঞাসা করেন, কে এনেছে এই সব জিনিস?

শিষ্যরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, আর মাথা নত করে থাকে কচ। গুরুদেব বলেন, তুমি এনেছ?

নিরুত্তর থেকে কচ স্বীকার করে যে এ তারই কাজ।

গুরুদেব বলেন, তোমরা যে কাঠ আনো তা শুকনো নয় বলে আগুনের চেয়ে ধোঁয়া হয় বেশি। কিন্তু এই শুকনো সমিধে ধোঁয়ার বদলে শুধু আগুনই জ্বলে। অগ্নিহোত্রের জন্য এই কাঠই উপযুক্ত।

একদিন দেবযানী একটি যন্ত্রে গানের সুর শুনে আশ্চর্য হল। কোথা থেকে আসছে এই সুর?

তখন চারিদিকের দিগন্ত থেকে অন্ধকার এসে চেপে ধরেছে দৈত্যগুরুর প্রশস্ত আশ্রম। আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রও তাদের স্বল্পপ্রভ আলো দিয়ে এই অন্ধকার দূর করতে পারে নি। এ কাজ করতে পারে চাঁদ। তার উদয় হলে অন্ধকার তরল হয়ে যায়, স্বপ্নময় হয়ে ওঠে বনময় জগৎ। দেবযানী তার কুটির থেকে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। সামনে একজন দানব বালককে দেখে প্রশ্ন করল, কোথা থেকে এই গানের সুর ভেসে আসছে?

সে বলল, তুমি জান না? কচ যে আজ একটি যন্ত্র তৈরি করেছে! বাদ্য যন্ত্র। ঐ তো ঐ গাছের নিচে বসে সে তার যন্ত্র বাজাচ্ছে।

দেবযানীর মুখ ভারি হয়ে গেল অভিমানে। কোন উত্তর দিল না তাকে। কিন্তু ছেলেটি বলল, এসো না, দেখবে তার যন্ত্র।

গম্ভীর ভাবে দেবযানী বলল, না, দেখব না।

কেন দেখবে না?

সে আমায় সবার আগে দেখায় নি কেন?

ছেলেটি হেসে বলল, তোমায় চমকে দেবে বলে। সে আমাদের সবাইকে বলেছে, অন্ধকারে বসে এই যন্ত্র যখন বাজাব তখন দেবযানী সব চেয়ে বেশি আশ্চর্য হবে, খুশিও হবে সবচেয়ে বেশি।

বলেছে বুঝি !

বলেই দেবযানী ছুটে চলে গেল কচের কাছে। কিন্তু তার সামনে গিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করল না, অন্ধকারে তার আবছা মূর্তি দেখে পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। নির্দিষ্ট মনে শুনতে লাগল কচের বাজনা।

দেবযানীর মনে হল যে এই সুরটি কচ তাকে এর আগেই শুনিয়েছিল সেই উপত্যকায় মুখোমুখি বসে। যে গানটি সে গেয়েছিল, সেই গানের সুরই সে বাজাচ্ছে তার নতুন যন্ত্রে। রাতের অন্ধকারে দেবযানীর যেন আরও ভাল লাগছে এই সুর।

তার পিতা এখন অগ্নিহোত্রে অগ্নির সামনে বসে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন। দানব বালকেরা নানা রকমের ক্রীড়া করছে তাদের কুটিরের অভ্যন্তরে। শুধু কচ বাহিরে একাকী বসে সঙ্গীতের সাধনা করছে এক মনে। সে কি দেবযানীর কথা ভাবছে না! তার মনে কি বাসনা নেই দেবযানীকে তার নতুন যন্ত্রের কথা জানাবার! যদি থাকে তবে তো সে তারই জন্যে এইভাবে বাজাচ্ছে এক মনে, দেবযানী কখন তার কাছে ছুটে আসবে এই আশায়!

কিন্তু কচ তার মুখ তুলে একবারও তাকাচ্ছে না, সামনের দিকেই যখন চাইছে না তখন পিছনে তাকাবে কেন! তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে দেবযানীকে আরও নিকটে যেতে হবে, তার তন্ময়তা ঘোচাতে হবে কোন-প্রকারে তার উপস্থিতি জানিয়ে।

দেবযানী গুণগুণ করে গান গাইবার চেষ্টা করল। যে কয়েকটি কথা তার মনে ছিল তাই সে গাইল বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গে সুর মিলিয়ে। তার কণ্ঠস্বর একটু স্পষ্ট হতেই কচ চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল। আর দেবযানীকে দেখতে পেয়ে প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হল তার সুন্দর মুখ।

লজ্জা পেল দেবযানী। এ এক অদ্ভুত লজ্জা! এ রকম লজ্জা বুঝি এর আগে সে কখনও পায় নি। তার পালিয়ে আসতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু পা দুটো সহসা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে তার মনে হল। সে তার মুখ নামিয়ে বলল, অসভ্য।

কচ আশ্চর্য হয়ে বলল, অসভ্য বলছ কেন? আমি তো কোন খারাপ আচরণ করি নি!

অমন করে হাসলে কেন?

বলে যেন ফিরে যেতে চাইল সেখান থেকে।

কিন্তু কচ বলল, রাগ করছ কেন! তোমাকে দেখে খুব ভাল লেগেছে, তাই হেসেছি। অন্য কোন কারণে নয়।

দেবযানী বলল, আমি কি হাসবার মতো কোন কাজ করেছি?

ভাল লাগার মতো কাজ নিশ্চয়ই করেছ।

কেন?

তোমার অমন মিষ্টি গলা। ইচ্ছে করলে তুমি আমার চেয়ে ভাল গাইতে পারবে। তাইতেই তো আমার ভাল লেগেছে। এসো, এইখানে আমার সামনে এসে বোসো। তারপর আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাও।

বলে কচ তার বাজনার সঙ্গে গান গাইতে আরম্ভ করল। দেবযানীর ইচ্ছা হল তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইবার। কিন্তু তারপরেই দানব বালকদের কথা তার মনে পড়ে গেল। তারা সবাই আছে নিকটে। তাকে গান গাইতে শুনলে তারা কী ভাববে! এর আগে তো সে কখনও গান গায়নি! কচের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইলে তারা নিশ্চয়ই হাসবে। পিতার কাছে তার কিছু-মাত্র লজ্জা নেই। তিনি হয়তো খুশিই হবেন, উৎসাহ দেবেন তাকে। কিন্তু তবু দেবযানী নীরবেই রইল।

কিন্তু কচের কোন ভাবনাই নেই, ভয়ও নেই কোন। লজ্জার কথাও সে ভাবতে পারছে না। তাই বলল, ও কি, তুমি চুপ করে রইলে কেন?

দেবযানী তার লজ্জার কথা বলতে পারল না। সে কথা বুঝি কারও কাছেই প্রকাশ করা যায় না। তাই খুব মৃদু স্বরে সে তার কণ্ঠ মেলাল কচের সঙ্গে। এমন করে গাইল যে শুধু কচই শুনতে পাবে, আর কেউ নয়। তার গলার স্বর চাপা পড়ে যাবে কচের যন্ত্র সঙ্গীতে।

এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেল তার খেয়াল ছিল না দুজনেরই। এক সময়ে দুজনেই চমকে উঠল দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের আহ্বানে। তিনি ডাকছিলেন, ও মা দেবযানী, তুমি কোথায়?

কচের কাছে থেকে দেবযানী কোন উত্তর দিল না, ছুটে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বলল, এই তো, আমি এখানে!

শুক্র বললেন, কে গান গাইছে মা?

দেবযানী বলল, কচ।

বাঃ, ভারি মিষ্টি গলা তো ছেলেটির!

১২

দেবযানীর রোমাঞ্চ হল এই মন্তব্য শুনে, বলল, কচ একটা নতুন যন্ত্র তৈরি করেছে।

ছেলেটি শুধু বিনয়ী ও সত্যবাদী নয়, গুণী ও পরিশ্রমীও বটে। জীবনে উন্নতি করবে নিশ্চয়ই।

আমারও তাই মনে হয়।

বলে দেবযানী কুটিরে প্রবেশ করল পিতার আহার্যের ব্যবস্থা করতে।

দানব বালকেরাও আশ্চর্য হল কচের পারদর্শিতা দেখে। অধ্যয়নে যেমন মেধা, তেমনি সব কিছু মনে রাখার প্রখর স্মৃতি শক্তি। অল্প দিনেই সে সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। সে শুধু শোনে না, প্রশ্ন করে বোঝবার জন্যে, চিন্তা করে, সন্দেহ নিরসন করে তর্ক করে, তারপর গুরুদেবের ব্যাখ্যা মেনে নিয়ে প্রসন্ন হয়। দৈত্যগুরু বললেন, এরই নাম অধ্যয়ন। শুধু শ্রবন নয়, মনন তর্ক ও অভ্যাসের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান আত্মসাৎ করতে হয়, তারপর অভিজ্ঞতায় সে জ্ঞান পরিপক্ক হয়। শোনবার পর যে চিন্তা করে, তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। তর্কে সে সবের নিরসন না হলে জ্ঞান অসম্পূর্ণ।

কচ সবাইকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। শুধু জ্ঞানার্জনে নয়, সকল বিষয়ে সে তার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছিল সকলের কাছে। তার মতো কর্মঠ ও পরিশ্রমী কেউ নেই, তার মতো সেবা ও পরিচর্যা করতে কেউ পারে না। শুধু দৈত্যগুরু নয়, গুরুকন্যা দেবযানীও তার সেবা যত্নে বিস্ময়, ব্যবহারে প্রশংসা করতে লাগল সরবে বা নীরবে। দৈত্যগুরু অকুণ্ঠিত চিত্তে যা সবার সমক্ষে প্রকাশ করলেন, গুরুকন্যা তা লজ্জায় গোপন করল সকলের কাছেই। কিন্তু তার ভীরু হৃদয়ের অব্যক্ত বারতা গোপন রইল না বেশিদিন। দেবযানীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তা প্রকাশ হয়ে পড়ল অনেকের কাছেই।

দেবযানীর পিতাই এই কথা জানলেন সকলের আগে। কিন্তু কিছু বললেন না তাকে। তিনি তো শুধু পিতা নন, মাতাও বটে। জয়ন্তীকে যেদিন তিনি ত্যাগ করে এসেছেন গন্ধমাদন পর্বতের সানুদেশে, সেদিন থেকেই তিনি এই কন্যাকে লালন করেছেন মাতৃস্নেহেও। মায়ের অভাব তার শিশুকন্যাকে কোনদিন বুঝতে দেননি। আজ তাঁর সমস্ত হৃদয় জুড়ে আছে এই মেয়ে, একে তিনি দুঃখ দিতে পারেন না কোন কারণে। তাই তিনি বাধা দিতে পারলেন না দেবযানীকে।

কিন্তু মনে একটা সংশয় জেগে রইল। কচ এখানে চিরকাল থাকবার জন্যে

আসেনি। তার বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ হলে সে ফিরে যাবে ইলাবৃত বর্ষে। তার পিতা দেবগুরু বৃহস্পতি এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাকে অভ্যর্থনা করে গ্রহণ করবার জন্য অপেক্ষা করছেন। সরল স্বভাব কচ জানে যে সে এখানে এসেছে জগতের সবার কল্যাণের জন্য তাঁর কাছ থেকে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র গ্রহণ করতে। কিন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য সন্দেহ করেন যে এ বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের চক্রান্ত। কচের নিকটেও তাঁরা নিজেদের দুরভিসন্ধির কথা গোপন রেখেছেন সযত্নে। তাঁরা বোধহয় মনে করেন যে সত্য কথা জানতে পারলে কচ এ কাজে রাজী হবে না। তাই অন্য দেবতাদের উপরেই কচকে পাঠানোর দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

তাঁর এও সন্দেহ হয়েছে যে দেবযানীর মনোহরণের জন্য তাকে নৃত্য গীতে তালিম দেওয়া হয়েছে সুকৌশলে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কচ নারীর মনোরঞ্জনের বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। এর পিছনেও দেবরাজ ইন্দ্র এবং দেবগুরু বৃহস্পতির হাত আছে সুনিশ্চিত ভাবে। মনে এ সব সন্দেহ দৃঢ় মূল থাকা সত্ত্বেও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য নিজের কন্যাকে সাবধান করতে পারলেন না।

কচকে ব্রত দীক্ষা দেবার আগে থেকেই দৈত্যগুরু এ সব কথা গভীর ভাবে ভেবেছেন। সব রকম পরিণামের কথা ভেবেই তিনি কচকে গ্রহণ করেছেন প্রসন্ন চিত্তে। কচের মতো শিশুকে শত্রুপক্ষের লোক বলে গ্রহণ না করা অধর্মের কাজ হত। প্রার্থীকে যেমন দান না করে ফেরানো অধর্ম, তেমনি বিদ্যার্থীকেও বিদ্যাদানে বঞ্চিত করা অন্যায়। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের মতো প্রাকৃতিক। এর মধ্যে কোন রাজনীতির স্থান নেই।

আরও একটি কথা দৈত্যগুরুর মনে হয়েছে। যে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা তাঁর কঠোর তপস্যার ফল তা লোপ পাবে তাঁর মৃত্যুর পরে, জগতের কল্যাণে তা আর কাজে লাগবে না। আজ দেবতা ও অসুরেরা দুই জাতি বলে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের বংশ এখন শেষ হবার দশায় পৌঁছেছে। তাদের বদলে মানব বংশ ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্বিদিকে। মানুষের মধ্যে জাতিভেদ এখনও প্রবেশ করেনি। যতদিন তা না করছে ততদিন কোন সংঘর্ষ বাধছে না। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে যে জগতে একদিন একটি জাতই থাকবে, তা মানুষ জাত। সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কোন মতবাদ চাপিয়ে না দিলে ঐ একটি জাতই পৃথিবী শাসন করবে। সে রকম দিন এলে তাঁর মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা গোপন রাখবার প্রয়োজন যাবে ফুরিয়ে। তার ব্যবহার হবে মানুষের

কল্যাণের জন্য।

সেদিনই দৈত্যগুরু স্থির করলেন যে কচকে তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করবেন এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে তিনি তাঁর সমস্ত অধীত বিদ্যা নির্দ্বিধায় দান করতে পারবেন। নিতান্ত প্রয়োজন হলে তিনি একটি শর্ত আরোপ করবেন। সেই শর্ত হবে সহজ—যারা হিংসায় মত্ত হয়ে হানাহানি করে মরবে, তাদের বাঁচাবার জন্যে তা প্রয়োগ করা হবে না। কল্যাণের মন্ত্র যেন হিংসাকে প্রশ্রয় না দেয়।

এ কথা স্থির করবার পর দৈত্যগুরুর মন শান্ত হয়ে গিয়েছিল। কচ দেবতা নয়, অসুরও নয় সে। দৈত্য, দানব বা আদিত্য বংশের রক্ত নেই তার ধমনীতে। সে ঋষির পুত্র, তাঁরই মতো কল্যাণের ব্রত নিয়ে জীবন উৎসর্গ করতে পারবে। তার মনে কোন সঙ্কীর্ণতা যদি না থাকে, তবে সেই হবে তাঁর শ্রেষ্ঠ মন্ত্রলাভের যোগ্য পাত্র।

দেবযানীর কথাও তিনি ভেবেছেন গভীর ভাবে। কন্যা এখন বড় হয়েছে, কৈশোর পেরিয়ে যাচ্ছে। প্রথম যৌবনের সলজ্জ উন্মেষ দেখছেন তার দেহ-মনে। জীবনের এই তো শ্রেষ্ঠ সময়। এখন তার সহজ ও স্বাধীন ভাবনায় বিধিনিষেধ আরোপ করলে জীবনের দাবীকেই যে অস্বীকার করা হবে! প্রভাতের প্রথম আলোর উষ্ণতায় যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হবার বাসনায় উন্মুখ, তাকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলে প্রকৃতি ক্ষমা করবে না। ব্যর্থতায় মন বিষাক্ত হলে জীবন হবে শুকনো ফুলের মতো বেদনাময়। তাই তিনি দেবযানীকে দিয়েছেন অবাধ স্বাধীনতা। তার কোন কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না। নিজের মঙ্গল বোঝা প্রাণীর ধর্ম, অবোধ শিশুও তার মঙ্গল বোঝে। দেবযানীও যে তা বোঝে তাতে তাঁর কোন সংশয় নেই।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এও লক্ষ্য করেছেন যে বিগত কয়েক বছরে দেবযানী কচের দিকে অনেক এগিয়ে গেছে। কচ চোখের আড়াল হলে সে অস্থির বোধ করে, সারাক্ষণ দেখতে চায় তাকে। দ্বিপ্রহরে আশ্রমের কাজের শেষে সেও চলে যায় গোচারণ ক্ষেত্রে, ফেরে গোধূলি লগ্নে। এ নিয়েও তিনি মাথা ঘামান না কোনদিন। তিনি কচকে চিনেছেন। ব্রহ্মচারী ব্রতচারী কচ তার দেহে প্রাণ থাকতে ব্রত ভঙ্গ করবে না, করতে পারে না। নিজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় তার ব্রত। সংকল্পে সে দৃঢ়, কিছুতেই সে তার সংকল্প চ্যুত

হবে না।

দানব বালকেরাও এখন আর বালক নয়, তারাও কিশোর হয়েছে, যুবাও হয়েছে অনেকে। চরিত্রবলে তারাও বিশ্বাসী। দেবযানীর স্বাধীনতা নিয়ে তাদের মধ্যেও কোন আলোচনা হয় বলে তিনি মনে করেন না। তবে যতই দিন যাচ্ছে ততই তাঁর মনে একটা সংশয় দানা বাঁধছে। সে দেবযানীর ভবিষ্যৎ। দেবযানীকে তিনি তার পতি নির্বাচনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। কচের এত কাছাকাছি যাবার পর দেবযানী কি ফিরে আসতে পারবে। তা যদি না পারে, তবে কচের বিরহ সে কেমন করে সইবে! সে কি কচকে বিবাহ করতে চায়? তা চাইলে কচ কি তাকে বিবাহ করতে সম্মত হবে?

কচ এখনও মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যালাভের আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তাঁর দেবার দিনও নির্দিষ্ট হয়নি। দৈত্যগুরু বোঝেন যে কচ কোন দিনই এই আগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং এই বিদ্যা লাভ না হলে ফেরবার কথাও সে ভাববে না। দানব'শিষ্যদের মধ্যে দু-একজন স্নাতক হয়ে ফিরে গেছে, নূতন শিষ্যও এসেছে। কিন্তু কচের মধ্যে কোন চঞ্চলতা নেই। নিবিড় নিষ্ঠা নিয়ে সে তার ব্রত পালন করে চলেছে।

কিন্তু এই অবস্থা কি চিরকাল চলতে পারে! এর অবসান তো ঘটাতে হবে তাঁকেই। শুধু তো সঞ্জীবনী মন্ত্র দানই একটা সমস্যা নয়, তার চেয়ে অনেক বড় সমস্যা দেবযানীর জীবন ও যৌবন। তাকে তো ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না। কচের বিদ্যালাভের সঙ্গেই এই প্রশ্ন আছে জড়িয়ে। তার বিদ্যার্জন সাঙ্গ হলেই সে ফিরে যাবে ইলাবৃত বর্ষে তার পিতার গৃহে। স্নাতক স্নানের পরই তার গৃহী হবার স্বাধীনতা। কিন্তু কচ দেবযানীর প্রতি আকৃষ্ট কিনা তিনি তা জানেন না। জানা সম্ভব নয়; তার কারণ কচের ব্যবহারে যে সংযম ও সৌজন্য তা তপস্বীর মতো। দেবযানীকে সে গ্রহণ করবে কি না তার কিছুমাত্র অনুমান করাও এখন সম্ভব নয়। যদি তাকে গ্রহণ না করে, তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে সেই আঘাত দেবযানী সইতে পারবে কিনা তাও তিনি অনুমান করতে পারেন না। এও অনুমানের বিষয় নয়।

এই সমস্ত ভেবে দৈত্যগুরু এখন মনে মনে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছেন। কিন্তু এই যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করতে পারছেন না কারও কাছে। যে কথা প্রকাশ করা যায় না, তা ভারাক্রান্ত করে মন, ক্ষতবিক্ষত করে। যন্ত্রণায় রক্তক্ষরণ হয়। দৈত্যগুরু শুক্র তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দেখলেন, না রক্ত

লাগেনি তাঁর হাতে।

কচের কাছে দেবযানী ইলাবৃত বর্ষের অনেক কথা শুনেছে। সে দেশ নাকি আর আগের মতো নেই। শৈত্য বাড়ছে, শীতের প্রকোপে দরিদ্ররা দেশ ছেড়ে চলে গেছে। চাষের জমিতে জলের অভাব দেখা দিয়েছে কিছুদিন থেকে। তার জন্যে চাষীরা শ্যামল প্রান্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধনীদের এ সব ভাবনা নেই। তারা সুখেই আছেন। অমরাবতীর ঐশ্বর্য কিছুমাত্র কমেনি, তার আনন্দের উৎস এখনও প্রাণবন্ত আছে।

অমরাবতীর পুরাতন ঐশ্বর্যের কথা শুনেছে দেবযানী, আনন্দ উৎসবের কথাও। ইন্দ্রসভার অপ্সরাদের খ্যাতি এক সময়ে জগৎজোড়া ছিল। যেমন তাদের রূপ, তেমনি তাদের নৃত্য। উর্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা ঘৃতাচী বিশ্বাচী পুঞ্জিকস্থলা—এদের যে-কোন একজন বিশ্বের যে কোন পুরুষের মনোহরণে সক্ষম। স্থিরযৌবনা তারা, তাদের বয়স অনুমান করতে পারে এমন পুরুষ জন্মায়নি। গায়ক গন্ধর্বদের কথাও শুনেছে দেবযানী—হাহা হূহু বিশ্বাবসু চিত্ররথ চিত্রসেন তুম্বুরুর কথা। এরা গান শিখেছে বিষ্ণু ও মহাদেবের কাছে, আর গান শিখিয়েছে ত্রিলোকের অনেককে, দেবর্ষি নারদকেও।

সোমরস পান করতে জানে দেবতারা। পাহাড় থেকে আহরণ করে আনে সোমলতা। পাথরে পিষে রস বার করা হয় সেই সবুজ পাতা থেকে। তারপর মেষলোমের ছাঁক্‌নিতে ছেঁকে চামড়ার কলসি ভরে রাখা হয়। কয়েকদিন পরেই তা পানীয় হয়ে যায়। উপাদেয় এই পানীয়। কিন্তু সবার অধিকার নেই সোমপানের। দেবরাজ ইন্দ্র এই সোমপানের অধিকার দেন অভিজাত দেবতাদের। যজ্ঞের সময়ে তারা ইন্দ্রের সঙ্গে বসে সোমপান করেন। অমরাবতীর বৈদ্য অশ্বিনীকুমাররাও সোমপানের অধিকারী ছিলেন না।

দেবযানী জিজ্ঞাসা করেছিল, যজ্ঞ কী?

কচ আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, তোমাদের এখানে বুঝি যজ্ঞ হয় না?

হয় কিনা জানি না। আমি কোন যজ্ঞ দেখিনি।

উৎসব, খুব বড় উৎসব আমাদের। চারিদিক থেকে দেবতারা এসে সমবেত হন এই যজ্ঞে। কত দ্রব্য সংগৃহীত হয়। কত মাংস, কত সোমরস, কত আয়োজন নৃত্য গীতের। কত স্তব স্তোত্র রচিত হয় এই সময়, কত ঋষি আসেন দূর দূরান্তর থেকে।

দেবযানী আশ্চর্য হয়ে বলে, তোমরাও মাংস খাও ? সোম পান কর ?

না।

কেন ?

কচ বলল, পশুহত্যা দেখলে আমার কষ্ট হয়। তাই মাংস খেতে আমি পারি না।

সোমরস ?

আমি সোমপানের অধিকারী নই। আর—

বল।

সোমপান করে দেবতারা মত্ত হয়ে ওঠেন। সে দৃশ্য আমার ভাল লাগে না। মত্ত হলে মাত্রাজ্ঞান থাকে না। অশালীন আচরণও করেন মত্ত অবস্থায়। অথচ কিছু বলার নেই।

কেন ?

কাণ্ডজ্ঞানরহিত হয়ে যান সে সময়ে। কী করছেন, তা নিজেরাই বুঝতে পারেন না।

পশুচারণ ক্ষেত্রে পত্রবহুল বৃক্ষের নিচে বসে দুজনের কথাবার্তা হয় দ্বিপ্রহরে। আশ্রমের কাজ শেষ করে দেবযানী ছুটে যায় সেখানে। আর কচ তার সমস্ত কাজ শেষ করে অপেক্ষা করে দেবযানীর জন্য। অত্যন্ত দ্রুত কাজ করবার জন্য ক্লান্ত হয় বেশি, অবসন্ন দেখায় তাকে। তাই দেবযানী এসে তার বস্ত্রের প্রান্ত দিয়ে ব্যজন করে খানিকক্ষণ, অবিন্যস্ত কেশদামে হাত বুলিয়ে দেয়, সংবাহন করে তার পরিশ্রান্ত হস্তপদ। কচ আপত্তি করে বলে, দেবযানী, আমি ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থী, শ্রম স্বীকার করেই আমাকে বিদ্যার্জন করতে হবে। আমার পরিচর্যা করে তুমি আমার ব্রত ভঙ্গ করো না।

দেবযানী বলে, এই সামান্য পরিচর্যায় তোমার ব্রত ভঙ্গ হবে না।

কচ বলে, দেবযানী, পরিচর্যা এমন বস্তু যে পেলে লোভ বাড়ে, বেশি পেলে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর বঞ্চিত হলে দুঃখের কারণ হয়। না পাওয়ার চেয়ে পেয়ে হারাবার দুঃখ বেশি। তুমি আমার দুঃখের কারণ হয়ো না।

দেবযানী আহত হয়ে বলল, এ কথা কেন ভাবছ ?

খুব স্বাভাবিক কারণেই এ কথা ভাবছি।

বল কী কারণ ?

আমি তো চিরকাল এখানে থাকতে আসিনি! আমার শিক্ষা সমাপ্ত হলেই ফিরে যেতে হবে আমার দেশে, সেই পুরাতন পরিবেশে—স্নেহহীন প্রীতিহীন প্রেমহীন নিষ্ঠুর পরিবেশে।

দেবযানী বলল, ছি ছি, তুমি তাকে নিষ্ঠুর বলছ কেন!

তাহলে কী বলব! সেখানে তো এই স্নেহ পাইনি, এই প্রীতি, আর এই—

দেবযানী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলে, আর কী?

কিন্তু কচের মুখে দুই অক্ষরের প্রেম কথাটা আটকে যায়। তার বদলে বলে, থাক সে কথা।

দেবযানী তাকে থামতে দেয় না, বলে, থাকবে কেন! বল, কী বলতে চেয়েছিলে।

কচ বলে, স্বর্গে ঐশ্বর্য আছে, ভোগের উপাদান আছে, আছে তৃষ্ণা। কিন্তু প্রেম নেই, নেই শান্তি। ভোগে তৃষ্ণার নিবৃত্তি নেই। থাকলে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হত, জন্ম হত প্রেমের। গুরুদেব ঠিকই বলেন, প্রেম দিয়ে জগৎ জয় হয়, হিংসায় নয়। তাঁর উপদেশে আমি এই জগৎটাকে চিনতে শিখেছি। এ জগৎ ভোগের জন্য নয়, ত্যাগ দিয়েই ভোগ করতে হবে।

দেবযানী আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমিও এই কথা বলছ?

কেন, ঠিক বলছি না?

দেবযানী বলল, আমার পিতা তো এই কথাই বলেন সবাইকে। কিন্তু ত্যাগ দিয়ে কি ভোগ করা যায়! ত্যাগই যদি করলাম, তাহলে ভোগ করব কেমন করে! না কচ, এ অসম্ভব কথা। এ আমি মানতে পারব না। আমি যা চাই, তা একেবারে আত্মসাৎ করে সম্পূর্ণ একা ভোগ করব। কারও সঙ্গে ভাগ করে কিছু ভোগের কথা আমি ভাবতেই পারি না।

কচ বিস্মিত হয়ে তাকাল দেবযানীর মুখের দিকে। খানিকক্ষণ এক-দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, ভোগীর বাসনা এই রকমই। কিন্তু এতে ভোগের তৃষ্ণা একটুও মেটে না। দিন দিন তা বেড়ে গিয়ে একটা কুৎসিত আকার ধারণ করে। ত্যাগের আনন্দ আছে অন্তরে নিহিত, অন্যের জন্য ত্যাগ করে সেই আনন্দ প্রকাশিত হয়। অপরকে ভোগ করতে দিয়ে যে আনন্দ, তার আস্বাদ নিজে ভোগ করার চেয়ে অনেক মধুর।

দেবযানী বলল, এ সব ফাঁকির কথা কচ। তুমি এ সব কথায় ভুলো না। তোমার সামনে যে সুন্দর জীবন পড়ে আছে, তাকে তুমি এই সব অবাস্তব

কথায় বিশ্বাস করে নষ্ট কোরো না।

কচ বলল, একে তুমি অবাস্তব কথা বলছ দেবযানী! স্বর্গে আমি ভোগ দেখেছি। সে জীবন আমার কাছে বিস্বাদ বলে মনে হয়েছে। সে-রকমের জীবন আমার কাম্য নয়। এই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন গুরুদেব। তিনি যা বলেন তা তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ। এই সত্য অবিশ্বাস করলে জীবনকেই অস্বীকার করা হবে।

দেবযানী তর্ক করল না, প্রতিবাদও জানাল না। শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নীরব হয়ে রইল।

কচ বলল, তুমি দুঃখ পেলে দেবযানী?

দেবযানী বলল, দুঃখ নয়, হতাশ হয়েছি তোমার কথায়।

কেন?

সামনে সুস্বাদু আহার্য দ্রব্য আছে সাজানো, অথচ উপবাসেই আনন্দ বেশি বলে তুমি নিজে অনাহারে থেকে সবই বিলিয়ে দিলে অন্যকে—একে তুমি বুদ্ধিমানের কাজ বল?

কচ বলল, অনাহারে থাকব কেন! জীবন ধারনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই গ্রহণ করব। কিন্তু তার আগে অপরকে তা ভোগ করতে দিয়ে দেখব তাদের ভোগের আনন্দ। সে আনন্দ নিজে ভোগের চেয়ে অনেক বেশি।

দেবযানী হতাশ সুরে বলল, তোমার সঙ্গে আর আমি তর্ক করব না।

কেন?

একটা ভ্রান্ত ধারনা তোমার মনে গভীর হয়ে চেপে বসেছে। এর হাত থেকে তুমি সহজে মুক্তি পাবে না।

কচ এ কথার উত্তর না দিয়ে হাসল। তার মনে হল যে ঠিক একই কথা সে দেবযানীকে বলতে পারে, কিন্তু তা বলল না।

এক সময়ে দেবযানী জিজ্ঞাসা করল, আর কত দিনে তোমার ব্রত শেষ হবে?

কচ অন্যমনস্ক ভাবে কিছু ভাবছিল, বলল, জানিনে।

দেবযানী আশ্চর্য হয়ে বলল, সে কি! তোমার ব্রত শেষ করার কথা তুমি জানো না!

কচ এবারে সচেতন হয়ে বলল, কি করে জানব বল। যে বিদ্যা লাভের জন্যে আমি এখানে এসেছি, তা কবে পাব সে কথা তো আমার জানা নেই।

সে বিদ্যা না পেলে ?

আমার ব্রত শেষ হবে না।

দেবযানী আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার পরেই অন্তরালে একটা শব্দ শুনেই সচকিত হয়ে চারিধারে তাকাল। তার মনে হল যে এতক্ষণ কারা সংলাপ শুনছিল মনোযোগ দিয়ে। তাদেরই পদশব্দ সে শুনতে পেয়েছে। ভাবনা হল দেবযানীর, ভয়ও হল। এই রকমের সন্দেহ তার আগেও কয়েকবার হয়েছে। কেউ তাদের লক্ষ্য করে, কথা শোনে তাদের। কিন্তু কেন ? কী অভিপ্রায়ে ? কোন দুরভিসন্ধি নেই তো !

দেবযানী উঠে দাঁড়াল কচের হাত ধরে। বলল, চল, আমরা আশ্রমে ফিরি।

কচ সবিস্ময়ে বলল, সে কি ! এত তাড়াতাড়ি ? গাভীরা যে এখনও চরছে !

দেবযানী বলল, আমার ভয় করছে কচ, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছা করছে না।

কচ হেসে বলল, ভোগের বাসনা থেকেই ভয়ের জন্ম। তৃষ্ণা ত্যাগ কর, ভয় তোমাকে ত্যাগ করে, যাবে।

বলে কচ গাভীদের ডাকল তার যন্ত্র বাজিয়ে।

দেবযানীর ভয় একদিন সত্যে পরিণত হল। গাভীরা গোচারণ ক্ষেত্র থেকে গোষ্ঠে এল ফিরে. কিন্তু কচ ফিরল না। দেবযানী ছুটে গেল বাইরে, চারিধারে ছুটোছুটি করল, দানব শিষ্যদের পাঠাল চারিদিকে। কিন্তু কচকে কোথাও পাওয়া গেল না।

আতঙ্কে কাতর হয়ে দেবযানী এল তার বাবার কাছে। বলল, কচ ফেরেনি বাবা, কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

দৈত্যগুরু শুক্র বললেন, এতে ভয় পাবার কী আছে ! সে এখন যুবাপুরুষ ! হয়তো বনান্তরে গেছে কোন কিছুর অন্বেষণে। অন্ধকার গভীর হবার আগেই ফিরে আসবে।

দেবযানী বলল, না বাবা, কারা তাকে লক্ষ্য করে আড়াল থেকে। একা পেয়ে হয়তো—বলেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

শুক্র তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, অমন উতলা হলে কি চলে ! রাজা তাকে হিংসা করেন না, তাই তার প্রাণের ভয় নেই। এ রাজ্যে কেউ কাউকে

হত্যা করে না। আর কচ তো কারও কাছে কোন অপরাধ করেনি।

কিন্তু সে যে তোমার কাছে সঞ্জীবনী মন্ত্র লাভের জন্য অপেক্ষা করছে!

তার জন্যে দায়ী তো আমি হব, কচ নয়!

না বাবা, তারা তোমার কিছু করতে পারবে না বলে কচকেই সরিয়ে দিতে চায়। আমি জানি কচের পিছনে শত্রু লেগেছে।

ভয় নেই। আমি বেঁচে থাকতে তার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

তবে তাকে ডাকছ না কেন?

ডাকছি।

বলে দৈত্যগুরু শুক্র অগ্নিহোত্রে প্রবেশ করে ধ্যানে বসলেন। মতি অস্থির থাকলে কর্তব্য স্থির করতে সময় লাগে। ধ্যানে স্থির হয় অশান্ত মন। যা ঘটেছে, ঘটছে বা ঘটতে পারে, তা ছায়ার মতো মনের পর্দায় ভেসে যায় একটার পর একটা। তখন কর্তব্য স্থির করতে সময় লাগে না, ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না। অভ্যাসের দ্বারাই এই ধ্যানের গভীরতা বাড়ে। ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতে পারলেই মনের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দেহের চোখের আড়ালের ঘটনা। শুধু অতীত বা বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের ঘটনাও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়।

পিতা ধ্যানে বসেছেন দেখে দেবযানী কতকটা আশ্বস্ত হল। ধ্যানে তিনি কচকে দেখতে পাবেন। কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে তাকে অপহরণ করেছে, তাও তিনি জানতে পারবেন বলে দেবযানীর বিশ্বাস। তাই সে নীরবে পিতার পাশে বসে তার ধ্যান ভঙ্গের অপেক্ষা করতে লাগল।

কিয়ৎকাল পরেই দৈত্যগুরু শুক্র উঠে দাঁড়িয়ে তার কয়েকজন শিষ্যকে ডেকে বললেন, এসো আমার সঙ্গে।

দেবযানী বলে উঠল, কোথায়?

তুমি আশ্রমেই থাকো ধাত্রীর সঙ্গে।

বলে দৈত্যগুরু কয়েকজন সমর্থ শিষ্যকে নিয়ে বনের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেলেন। তারপর উচ্চ স্বরে ডাকলেন, কচ, তুমি কোথায়?

দানব শিষ্যদের মুখের দিকে তাকাতে তারা আরও জোরে চেঁচিয়ে ডাকল, কচ, কোথায় তুমি? গুরুদেব তোমাকে ডাকছেন।

উত্তরের মতো একটা শব্দ এল বহু দূর থেকে। শিষ্যরা সানন্দে বলে উঠল, ঐতো। ঐ দিক থেকে কচের উত্তর এসেছে।

বলে সেই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন সকলে। শিষ্যরা চিৎকার করে ডাকতে লাগল, আর কচের উত্তর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল তাকে। একটি গাছের সঙ্গে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। শিষ্যরা তার বন্ধন খুলে দিল।

কচ গুরুদেবকে প্রণাম করে বলল, আপনি না এলে আজ রাতে আমি বাঘের পেটে যেতাম।

দৈত্যগুরু আশীর্বাদ করে বললেন, তুমি দীর্ঘজীবী হও।

তারপর কচকে নিয়ে সবাই ফিরে এলেন আশ্রমে।

কচকে দেখেই দেবযানী তার পিতাকে জড়িয়ে ধরল আনন্দে। বলল, বাবা, কচ আর একা যাবে না গোচারণে। তার সঙ্গে আর কোন শিষ্যকে দিও।

শুক্র সহাস্যে বললেন, তাই হবে।

বলে একজন শিষ্যের দিকে তাকাতেই সে বলল, কাল থেকে আমি কচের সঙ্গে যাব, আর আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরব।

বলে দেবযানীর দিকে তাকাতেই সে প্রসন্ন হয়ে বলল, কচ বড় অসাবধান। সে ভাবে তার শত্রু নেই। শত্রুতা না করলেই কি সবাই মিত্র হয়? তা হয় না। কিন্তু কচ এ কথা বোঝে না।

কচ বলল, অকারণে কেউ শত্রুতা করবে কেন!

শুক্র বললেন, তুমি কোন ব্যক্তির শত্রু নও, তুমি দেশের শত্রু: এ দেশের লোকের শত্রুপক্ষের মিত্র, তাই তুমি এদেশের লোকের শত্রু। এদের শত্রুর উপকারের জন্য তুমি এসেছ। তাই তোমাকে মিত্রের চোখে এরা দেখে না। দেবযানী ঠিকই বলেছে। তোমাকে সর্তক থাকতে হবে, সাবধানে থাকতে হবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে যেতে হবে।

কচ তার মাথা নত করে রইল। গুরুদেবকে বলতে পারল না যে সঞ্জীবনী মন্ত্র না নিয়ে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তার জীবন বিপন্ন করেও এখানে থাকতে হবে। ফিরে যেতে না পারলে সে একটুও দুঃখিত হবে না, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার কথা সে ভাবতে পারে না। সে ঋষির পুত্র, সংকল্পে অটল থাকাই তার জীবনের ধর্ম। সেই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে পারবে না।

দৈত্যগুরু শুক্র তার মুখের দিকে চেয়েছিলেন। দৃষ্টি দিয়ে তার হৃদয়ের

গভীরে এই সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, বৎস। তুমি সফলকাম হবে।

কচ তাঁকে পুনরায় প্রণাম করে বলল, ধন্য আমি।

দৈত্যগুরু একজন দানব শিষ্যকে বললেন সারাক্ষণ কচের সঙ্গে থাকতে। কচকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করাই হবে তার একমাত্র কাজ।

দেবযানী বলল, কচের কি গোচারণে না গেলেই নয়?

শুক্র বললেন, বিপদকে ভয় পাওয়া পুরুষের ধর্ম নয়। যে ভয় পায়, তার পিছু নেয় বিপদ। ভয় পেয়ে ঘরে আবদ্ধ হয়ে থেকে বিপদকে জয় করা যায় না। বিপদকে জয় করতে হলে খোলা ময়দানে গিয়ে বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। তোমার অনুরোধেই আমি এই শিষ্যটিকে সঙ্গে দিলাম, তা না হলে কচকে একাই যেতে বলতাম।

দেবযানী বলল, তার শত্রুরা যদি প্রবল হয়?

আত্মরক্ষায় দক্ষতা প্রাণীর ধর্ম। কচও আত্মরক্ষায় সমর্থ বলে আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সে তো বাঘের পেটে যাচ্ছিল!

গেল না তো!

তোমরা সেখানে পৌঁছবার আগেই যদি বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলত?

কচের চেয়ে অনেক অসহায় প্রাণীও ঐ বনে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঘের সঙ্গে শত্রুতা করে না বলেই তারা বাঘকে ভয় পায় না। হিংসা প্রাণীর ধর্ম নয়। হিংসার জন্ম প্রাণীর হৃদয়ের এমন এক স্থানে, যেখানে তার কোন কর্তৃত্ব নেই। সেখানে প্রাণীর প্রেম ভালবাসা বিবেকবুদ্ধি ধর্মবোধ সবই পরাজিত হয়। তাই হিংসাকে বর্জন করতে চাইলেও তা বর্জন করা সম্ভব নয়। অহিংসাকে ধর্ম বলতে পারো, কিন্তু প্রাণীর সেই নিভৃত অদৃশ্য স্থানে তাকে রোপন করতে পারো না। হিংসা চিরকাল থাকবে, কিন্তু কেন থাকবে তার কারণ জানতে পারবে না।

কচকে বললেন, বৎস, হিংসার একটা কারণ আমি জানি। সেটা হল আত্মরক্ষার চেষ্টায় হিংসার আশ্রয়। প্রাণী যখন মনে করে যে তার প্রাণসংশয় উপস্থিত, তখন সে সহসা হিংস্র হয়ে ওঠে। যাকে আততায়ী ভাবে, তাকে সে আগেই আক্রমণ করতে চায়। প্রাণের ভয় ত্যাগ করলেই মৃত্যুকে এড়ানো যায়। সামনে বাঘ দেখে তুমি যদি ভয় না পাও, তোমার

চোখে-মুখে যদি মৃত্যুভয় ফুটে না ওঠে, তবে বাঘেরও হিংসা জাগবে না, সে কুকুরের মতো তোমার কাছে এসে তোমার বিপদে সাহায্য করতে চাইবে। অনেক মুনি-ঋষির কথা শোননি? তাঁদের আশ্রমে বাঘের সঙ্গে হরিণ ঘুরে বেড়ায় নির্ভয়ে। বাঘের সঙ্গে গাভী জল খায় এক ঘাটে।

কচ কোন উত্তর দিল না। দৈত্যগুরু বললেন, তোমরা নির্ভয় হও, প্রকৃতি তোমাদের সারাক্ষণ রক্ষা করছে।

শিষ্যরা নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে পড়ল। কচের সঙ্গে চলল সেই দানব শিষ্য। পথে যেতে যেতে সে বলল, তোমাকে একটা কথা বলব কচ?

কচ বলল, বলবে বৈকি, অসংকোচে বলবে।

গুরুদেবের আশ্রমে আমরা তো দীর্ঘদিন আছি। সংসারে আমার কেউ নেই বলেই আমি এতদিন আছি। কিন্তু তুমি বিদায় নিচ্ছ না কেন?

কচ বলল, ভাই, দেবতারা আমাকে গুরুদেবের কাছ থেকে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র আনতে বলেছিলেন। সে মন্ত্র আমি আজও পাইনি।

তা তুমি সে মন্ত্র চাইছ না কেন?

চাইলে তো কিছু পাওয়া যায় না, পাবার যোগ্য হলে সবই পাওয়া যায়।

কথাটা মিথ্যে নয়। গুরুদেবের কাছে আমরা কত কি পেয়েছি, কত কি জেনেছি এতকাল ধরে। কিন্তু অলৌকিক কোন মন্ত্র তিনি আমাদের দেননি। এই বিরাট বিশ্ব সম্বন্ধে কত কি জানবার আছে, চেষ্টা হচ্ছে জানবার, সে সবই জেনেছি তাঁর কাছে। যা জানা যায় না, অথচ জানার চেষ্টা আছে অব্যাহত তাও জেনেছি আমরা।

গোচারণ ক্ষেত্রে এসে দুজনে পাশাপাশি বসল। সেই দানব শিষ্য বলল, কত দিনের ইতিহাস জেনেছি বল।

কচ বলল, কল্পের আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, সবই তো আমরা জেনেছি।

হ্যাঁ, ছটি মন্বন্তর শেষ হয়ে এখন বৈবস্বত মন্বন্তর চলছে। তিনশো পঞ্চান্ন বছরের এক একটি মন্বন্তর। অর্থাৎ কল্পের আরম্ভ থেকে দু হাজার বছরেরও বেশি ঘটনা আমরা জেনেছি। কত আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ঘটনা, কত কৌতূহলপ্রদ।

কচ বলল, সেকালের সমাজ আধ্যাত্মিক চেতনায় কত উন্নত হয়েছিল, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। দু হাজার বছর আগে জন্মগ্রহণ করে কপিল

প্রচার করেছিলেন সাংখ্য দর্শন। কৈলাসপতি শিবের শক্তি আরাধনার সঙ্গে তার প্রভেদ কতটুকু!

দুজনেই তো স্বায়ম্ভুব মনুর দৌহিত্র। তবে তাঁরা পরস্পরের মত না জেনেই বোধহয় নিজেদের এই মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রভেদটাও স্পষ্ট। কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি, বলেছেন, ঈশ্বর অসিদ্ধ। প্রকৃতিতেই পুরুষের অধ্যায় সিদ্ধ হয়েছে। শিব বলেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংসর্গে যে শক্তি তা থেকেই এই বিশ্বের সৃষ্টি। এই রূপেই ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে। লিঙ্গই ঈশ্বরের প্রতীক।

দানব শিষ্য বলল, ঋষভকে ভুলে যাচ্ছ কেন! মনুর পৌত্র নাভির পুত্র ঋষভ, যিনি অর্হৎ ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাঁর রাজত্ব জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে দিয়ে। তাঁর বিশ্বাসকেও তুমি উপেক্ষা করতে পারো না।

কচ বলল, আধ্যাত্মিক জগতে ভরতের অবদানও কম নয়।

তাই তো ভাবছি, এর দু হাজার বছর পরে আজ আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি! শুধু হানাহানি, হিংসা ও মৃত্যুভয়!

কচ বলল, গুরুদেব তো বলেছেন, প্রলয়ের পরে এই রকমই হয়।

প্রলয় তো বিশ্বের শেষ নয়, প্রাকৃতিক কারণে একটা সভ্যতার শেষ। সেই মহাপ্লাবনের পরেও তো এক হাজার বছর কেটে গেল। কিন্তু আমাদের সেই সভ্যতার কথা তো লুপ্ত হয়ে যায়নি!

দানব শিষ্য বলল, আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা আমরা ভুলিনি, ঋষিরা তা পরম যত্নে রক্ষা করেছেন। কিন্তু জীবন যাত্রার যে উন্নতি হয়েছিল, তা কি আমরা ধরে রাখতে পেরেছি! সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতার চরম উৎকর্ষ হয়েছিল, সে তো মহাপ্লাবনে পৃথিবীর গর্ভে চলে গেছে! তা কি আমরা কোন দিন উদ্ধার করতে পারব?

কচ বলল, সময় হলেই পারব।

তুমি খুবই আশাবাদী কচ, তাই এই রকম ভাবছ। যারা পারত, তারা পারিবারিক বিবাদেই নিজেদের সর্বনাশ ডেকেছে। এক সময়ে বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু বুঝেছিলেন এই কথা, তিনি দেবতা ও অসুরদের মিলিত হয়ে ক্ষীরোদ সাগর থেকে পাতাল পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশ মন্থন করে দেখতে চেয়েছিলেন। সেই দুরূহ কাজ আরম্ভও হয়েছিল। কিন্তু অমৃত নিয়ে আবার শুরু হয়ে গেল বিবাদ। কই, দেবতারা তো সেই অমৃত খেয়ে অমর হতে পারল না, তুমি

এসেছ গুরুদেবের কাছে মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রের জন্যে! যে বিবাদ থেমে এসেছে, সেই বিবাদ আবার শুরু হয়ে যাবে বলে সবাই আশঙ্কা করছে। তুমিই বল, কী হবে এই বিবাদকে বাঁচিয়ে রেখে। কিছু পাওনি বলে ফিরে যাও না এখান থেকে!

কচ এ কথার কোন উত্তর দিল না, কী উত্তর দেবে তা ভেবে পেল না। দানব শিষ্যটি বলল, মিথ্যা কথা তোমাকে বলতে হবে না, তুমি সত্যি কথাই বলবে সবাইকে। যে মন্ত্রের জন্য তুমি দীর্ঘকাল কাটালে এখানে, সে মন্ত্র তো তুমি সত্যিই পাওনি। অথচ তা পাবার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করনি তুমি! তুমি ফিরে গিয়ে সত্যি কথাই বলবে, সে মন্ত্র পাওনি গুরুদেবের কাছে।

কচ করুণ ভাবে বলল, কিন্তু আমি যে অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছিলাম!

তা ঠিক। আর তা পাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছ। এমন কি গুরু কন্যারও সেবা করেছ গুরুর মতো। তোমার এই সেবার কথা আমরা কোন দিন ভুলব না কচ।

তবে আমি কিসের জন্যে ফিরে যাব বল!

তোমার তো বাবা-মা আছেন! বাকি জীবনটা তাঁদের সেবা করে কাটাবে।

কিন্তু কোন্ মুখ নিয়ে আমি ফিরে যাব! কেমন করে বলব যে আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি। সংগ্রামে যেমন পরাজয় কাম্য নয়, তার চেয়ে মৃত্যু মহৎ, তেমনি সাধনার ব্যাপারেও অসফল হয়ে ফিরে যাবার চেয়ে নির্বাসনে মৃত্যু ভাল।

দানব শিষ্যটি কিছু ইতস্তত করে বলল, দুঃখ যদি না পাও তো একটা কথা তোমাকে বলি।

বল।

গুরুদেবের কাছে সঞ্জীবনী মন্ত্র পেলে তোমাদের মঙ্গল হবে না।

কেন?

যে বিবাদ প্রায় মিটে এসেছে, তা আবার জেগে উঠবে। আমরা কেন আমাদের পূর্বপুরুষদের পুরাতন বিবাদ জিইয়ে রাখার অস্ত্র হব!

কচ বলে উঠল, এতে যে বিশ্বের কল্যাণ হবে ভাই। এ বিদ্যা হারিয়ে গেলে আর তো কেউ এর ফলভোগ করতে পারবে না।

কিন্তু দেবাসুরের সংগ্রাম !

তাতে আমরা ইন্ধন জোগাব কেন ? অদিতির বংশে আর কজন অবশিষ্ট আছে। তোমরাই বা কজন আছ ? এখন এই দেবাসুরের দেশে মানব বংশই বিস্তার লাভ করেছে অপ্রতিহৃত ভাবে। বড় দুর্বল অসহায় এই মানুষ, বড় দরিদ্র দুর্দশাগ্রস্ত। সঞ্জীবনী মন্ত্র পেলে আমি তাদের দুঃখ দূর করতাম। অনাহারে রোগ ভোগে তারা অসময়ে মরে যায়। এই মন্ত্রের গুণে আমি কি তাদের দীর্ঘ জীবন দিতে পারতাম না ?

দানব শিষ্য স্তব্ধ হয়ে গেল কচের কথা শুনে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, তোমার এই সংকল্পের কথা কেউ জানে না। সবাই সন্দেহ করে দেবতাদের জন্যে তুমি এই মন্ত্র নিতে এসেছ।

তাদের কথায় আমি এসেছি ঠিকই, কিন্তু তাঁদের জন্যে মন্ত্র নিতে আসিনি। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

অনেক কথা হল দুজনের। তারপর একসঙ্গেই ফিরে এল। আশ্রমে ফিরেই শুনল যে কচকে হত্যার নূতন ষড়যন্ত্র করেছে দুর্বৃত্তরা। এবারে আর অরণ্যে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখবে না, তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে হাত পা বেঁধে।

এখানে সমুদ্র কোথায় ?

প্রশস্ত নদীকেই এখানে সমুদ্র বলে। সে রকম নদী আছে নিকটে।

একজন শিষ্য বলল, গুরুদেব তোমাকে নির্ভয় হতে বলেছেন।

কেন ?

তিনি বলেছেন, মিত্র লাভে সমর্থ হয়েছে কচ, তারাই এখন থেকে তাকে রক্ষা করবে।

একদিন এক ধনীর পরিবারে যজ্ঞের জন্য নিমন্ত্রণ পেলেন দৈত্যগুরু। তাঁর এক প্রবীণ যজমান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে চায়। দানবরাজ বৃষপর্বাও সেই যজ্ঞে আসবেন। নানা উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। আনন্দের ব্যবস্থাও হয়েছে নানা রকমের। দৈত্যগুরু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যথাসময়ে সেই যজ্ঞ করতে এলেন। গৃহস্থের এই রকম যজ্ঞেই তারা যজ্ঞের কাজ শেখার সুযোগ পায়। খুশি হয় তারা, আনন্দও পায়।

রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তার আয়োজন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। তাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সামর্থ্য সব রাজার নেই। তাঁরা সোমযজ্ঞও করেন। কিন্তু

ইলাবৃত বর্ষেই তার প্রচলন বেশি। সেদিকেই সোমলতা পাওয়া যায়। হিমবর্ষে এই লতা সংগ্রহ তো সহজ নয়। সুরা প্রস্তুত হয় অন্য উপকরণ থেকে। যজ্ঞে সুরাপানের রীতি প্রচলিত আছে।

সারাদিন ব্যাপী যজ্ঞ হল। দৈত্যগুরুর শিষ্যরাই সমস্ত কাজ সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করল। যজ্ঞের ভাগ পেলেন দানবরাজ বৃষপর্বা। তিনিই যজ্ঞপতি। প্রচুর আহারের আয়োজন ছিল। কিন্তু দৈত্যগুরু মাংসাহার করেন না, সুরাপানও করেন না। কিন্তু যজমান ও তার আত্মীয় বন্ধুরা দৈত্যগুরুকে বারে বারে অনুরোধ করতে লাগল, তিনি এ সব আহার করেন না বলে তাঁর শিষ্যরাও বঞ্চিত হচ্ছে। একদিনের জন্য তারা নিয়ম ভঙ্গ করুক, একপাত্র সুরাপান করে মাংস ভোজন করুক। গুরুদেব না খেলে তারা খেতে পারছে না।

বৃষপর্বা বললেন, এ তো দোষের নয় গুরুদেব, এ রুচির কথা। এতে আপনার রুচি নেই বলেই তো আপনি একে দোষের ভাবছেন।

দৈত্যগুরু বললেন, মাত্রাতিরিক্ত না হলে দোষের নয় ঠিকই। কিন্তু সুরা এমন জিনিস যে মাত্রা ঠিক থাকে না। মত্ত হয়ে লোকে যে কোন কুকর্ম করতে পারে এবং করেও। তাই সুরা স্পর্শ না করাই ভাল।

রাজা বললেল, খুব ঠিক কথা। কিন্তু এ সবে বিধি নিষেধ বেশি আরোপ করলেই তার আকর্ষণ বেড়ে যায়। আর এর আস্বাদ এমন কিছু নয় যে একবার এক পাত্র পান করলেই অভ্যাসে পরিণত হবে।

ততক্ষণে যজ্ঞের যজমান দুটি স্বর্ণপাত্রে সুরা এনে উপস্থিত করল। রাজা এক পাত্র তুলে নিয়ে গুরুদেবের হাতে দিলেন এবং নিজে নিলেন অন্য পাত্র। সমবেত সকলেই আনন্দিত হল। আরও অনেকে সুরার পাত্র পেল এবং সে সব নিঃশেষ হতেই যজমান একটি রূপার ভৃঙ্গার এনে গুরুদেব ও রাজার পাত্র দুটি ভরে দিল।

প্রচুর সুরা ও মাংসের ব্যবস্থা ছিল। আকণ্ঠ সুরাপান করায় অনেকে মত্ত হয়ে অশালীন ব্যবহারও করল। দু-তিন পাত্র পান করেই দৈত্যগুরু শুক্রের পা টলতে লাগল। কচ নিকটেই ছিল, বলল, গুরুদেব, চলুন, আমরা আশ্রমে ফিরে যাই।

দৈত্যগুরুর দু চোখ তখন রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি রাগত ভাবে বললেন, ফেরার জন্য তোমাদের এমন তাড়া কেন ?

বলে সরিয়ে দিলেন কচকে।

কচ তার সতীর্থদের নিকটে গিয়ে অত্যন্ত মৃদু স্বরে বলল, গুরুদেবকে মত্ত করার কোন দুরভিসন্ধি আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

সেই দানব শিষ্যটি বলল, মনে হচ্ছে, এর পিছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে। হয়তো গুরুদেবকে মত্ত করে তোমাকেই অপহরণ করতে চায়।

কচ বলল, অসম্ভব নয়।

তবে তুমি অন্ধকারে আত্মগোপন কর। গুরুদেবকে আমরা আশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

তাই হল। শিষ্যরা রাজার অনুমতি নিয়ে দৈত্যগুরু শুক্রকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এল। কিন্তু কচকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

সবাই বলল, কচ কোথায়? সেও কি মত্ত হয়ে কোথাও পড়ে আছে? কিন্তু কেউ তো তাকে সুরাপান করতে দেখে নি। সে মত্ত হবে কেমন করে?

কেউ তাকে আহার করতে দেখেছে?

না, কেউ না।

তবে সে কি এই যজ্ঞস্থলে আসেনি?

তা কেন হবে! যজ্ঞের কাজ তো সে পরম নিষ্ঠায় সম্পন্ন করেছে গুরুদেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে।

তবে কি সে এই অবকাশে ফিরে গেল তার দেশে?

গুরুদেবের কাছে বিদায় না নিয়ে তো সে যাবে না! তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেবে তাঁর কাছে। বিদায় নেবে দেবযানীর কাছেও।

দৈত্যগুরু যখন আশ্রমে ফিরলেন, তখন তিনি সম্পূর্ন মত্ত। দেবযানী বলে উঠল, এ কী অবস্থা হয়েছে পিতার!

শিষ্যরা তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে শয্যায় শুইয়ে দিল। দেবযানী চারি দিকে চেয়ে দেখল, কচ নেই, তার পিতাকে বয়ে এনেছে তাঁর দানব শিষ্যরা। পিতার পাশে বসে দেবযানী জিজ্ঞাসা করল, কচ কোথায়?

একজন শিষ্য উত্তর দিল, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যজ্ঞস্থলে তাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে, সে কোথাও নেই।

ডুকরে কেঁদে উঠল দেবযানী। বলল, দৈত্যরা নিশ্চয়ই তাকে ধরে নিয়ে গেছে, হাত-পা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেবে তাকে। তাই তোমাকে সুরাপান করিয়েছে বাবা, মত্ত হলে তুমি মন্ত্র যাবে ভুলে।

দৈত্যগুরু শুক্র শয্যায় উঠে বসে বললেন, কে বলে আমি মত্ত হয়েছি! সুরাপান করে উশনা মাতাল হয় না। আমার গুরু হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন।

দেবযানী তার পিতাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল, কচকে হারিয়ে আমি একদিনও বাঁচব না বাবা, কচকে তুমি আমার কাছে এনে দাও।

তাই হবে। কচকে আমি এইখানে টেনে আনব আমার মন্ত্রের জোরে—এইখানে—আমার পাশে।

বলে শয্যায় কাৎ হয়ে পড়লেন প্রায় অচেতন অবস্থায়।

দেবযানী এবারে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, কী হবে আমার! কেমন করে আমি বাঁচব! ওরা কচকে মেরেছে। এইবারে আমার পিতাকে তারা মেরে ফেলবে।

বলে দৈত্যগুরু শুক্রের বুকে মুখ রেখে দেবযানী কাঁদতে লাগল।

দানব শিষ্যরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর ধীরে ধীরে কুটির থেকে বেরিয়ে গেল। এক সময়ে দেবযানীও ঘুমিয়ে পড়ল শ্রান্ত দেহে।

মধ্যরাতে শুক্র উঠে বসলেন তাঁর শয্যার উপরে। ডাকলেন, কচ, তুমি কোথায়?

অস্পষ্ট স্বরে উত্তর এল, আমি আপনার কাছেই আছি গুরুদেব।

তুমি যেখানেই থাক, এইখানে এসো, আমার পাশে।

অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্তি কুটিরের এক কোণ থেকে বেরিয়ে এল দৈত্যগুরুর সামনে। বলল, আমি এসেছি গুরুদেব।

এসেছ!

বলে শুক্র তার মাথায় হাত বুলোলেন গভীর স্নেহে। বললেন, বৎস, মন্ত্র পাঠ করে কাউকে বাঁচানো যায় না। যে বাঁচবার সে-ই বাঁচে, আমি নিমিত্ত মাত্র। বৈদ্যশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব মহাদেব আমার গুরুদেব। তাঁর কাছে আমি যে ভেষজ বিদ্যা পেয়েছি, তাই দিয়ে আমি মৃতকল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, মৃতকে জীবন দিতে পারি না।

কচ স্তব্ধ হয়ে রইল, কোন কথা বলে গুরুদেবকে বাধা দিল না।

শুক্র বললেন, ভেষজ বিদ্যার প্রায় সবই আমি তোমাদের দিয়েছি, দিইনি শুধু একটি সাধারণ জ্ঞান—অচেতন ব্যক্তির চেতনা ফিরিয়ে আনার একটি সহজ উপায়। এটিকেই সবাই মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র বলে মনে করে। আজ তোমাকে

আমি একান্তে এই কৌশলটি শিখিয়ে দেব। তারপর তুমি তোমার কর্তব্য স্থির কোরো।

অন্ধকারেই কচ দৈত্যগুরু শুক্রকে প্রণাম করল। আর তিনি আশীর্বাদ করলেন দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচকে।

প্রত্যূষে তখনও আকাশে আলোর সঞ্চার হয়নি। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য তাঁর আশ্রমের অঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন। চারি দিক নিস্তব্ধ। শিষ্যরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছে।

ধীর পদক্ষেপে কচ এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ সংকল্পে উজ্জ্বল। গুরুর আজ্ঞার জন্য তাঁর সামনে মাথা নত করে রইল।

শুক্র বললেন, এসো। এই ব্রাহ্ম মুহূর্তে অবগাহন স্নান করে আমি তোমাকে সঞ্জীবনী বিদ্যা দান করব। বলে তাঁর আশ্রমের নিকটবর্তী নির্ঝরিণীর দিকে চললেন। কচ নিঃশব্দে তাঁকে অনুসরণ করল।

পথে যেতে যেতে শুক্র বললেন, তুমি আর এখানে থেকো না, বিদ্যা লাভের পর নিজ গৃহে ফিরে যেও অত্যন্ত সতর্ক ভাবে। পথে দুর্বৃত্তরা তোমাকে আক্রমণ করতে পারে। তাই আত্মগোপন করেই তোমাকে যেতে হবে।

নির্ঝরিণীর শীতল জলে দুজনে স্নান করলেন। প্রণাম করলেন জবাকুসুমসঙ্কাশ দিবাকরের উদ্দেশে। তারপর কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা দান করলেন। বললেন, বৎস, এই বিদ্যা তুমি জগতের সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ কোরো, হিংসা বৃদ্ধির জন্য কোরো না। তোমার কাছে এই আমার অনুরোধ।

কচ বলল, তাই হবে গুরুদেব।

তাঁরা আশ্রমে ফিরে দেখলেন যে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে দেখতে না পেয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কচের সঙ্গে তাঁকে ফিরতে দেখে তারা আনন্দধ্বনি করে উঠল।

এই সময়ে কয়েকজন দৈত্য ও দানব দৈত্যগুরুর সংবাদ নিতে এল। জোর করে তাঁকে সুরাপান করাবার জন্য তারা অনুতপ্ত। ক্ষমা চাইল গুরুর নিকটে। দৈত্যগুরু বললেন, তোমাদের কোন দোষ নেই, দোষ আমার। আমি ঋষি, কোন ঋষির চরিত্রে এ রকম দুর্বলতা শোভা পায় না। এ কথা বিস্মৃত হলে তাকে অনুশোচনা করতেই হবে। সুরাপান নিষিদ্ধ

হওয়া উচিত।

দৈত্য ও দানবরা বলতে পারল না যে সুরাপান নিষিদ্ধ হলে জীবনে আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যাবে কিসে।

দৈত্যগুরু গম্ভীর স্বরে বললেন, কচকে আজ আমি বিদায় দিচ্ছি, তোমরা তার যাত্রা-পথে কোন বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা কোরো না। এ কথা জানিয়ে দিও সবাইকে। বোলো যে হিংসায় কিছু লাভ হয় না, লাভ হয় প্রেমে, দয়ায়। জীবন সুন্দর হয় ভালবাসায়।

তারা বলল, তাই হবে প্রভু।

বলে গুরুদেবকে প্রণাম করে তারা ফিরে গেল।

শিষ্যরা দাঁড়িয়ে ছিল নিকটে, দেবযানীও সব কথা শুনেছিল। কচের দিকে সে তাকাল সতৃষ্ণ নয়নে।

দৈত্যগুরু শুক্র এবারে কচকে বললেন, বৎস, আজ তুমি সমাবর্তন স্নান করে যাত্রার উদ্যোগ কর।

গুরুর আজ্ঞায় কচ ব্রত ভঙ্গ করল দীর্ঘ দশ বৎসর পর। তারপর দেবযানীর নিকটে বিদায় নিতে গেল। কিন্তু দেবযানীকে আশ্রমের কোনখানে খুঁজে না পেয়ে গেল নির্ঝরিণীর তীরে। কিন্তু সেখানেও সে নেই। তারপর তার মনে পড়ল সেই শ্যামল উপত্যকার কথা, যেখানে তারা অনেকবার গেছে নানা সময়ে। দেবযানী বোধহয় আজ সেখানেই তার জন্য অপেক্ষা করছে ভেবে সে সেখানেই গেল ছুটে।

যেখানে তারা দুজনে বসত পাশাপাশি, দেবযানী আজ একা সেই জায়গায় বসে আছে নিঃশব্দে মাথা নত করে। কচের পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে উঠল না, অস্পষ্ট স্বরে প্রশ্ন করল, বাবার অনুমতি পেয়েছ?

পেয়েছি।

পেয়েছ?

বলে দেবযানী পুলকিত হয়ে উঠল।

কচ বলল, আমি আজ ফিরে যাচ্ছি, তাই তোমার কাছে বিদায় নিতে এলাম।

মুহূর্তে দেবযানীর পুলক অন্তর্হিত হল, অপরিসীম বিষণ্ণতায় ভরে গেল

তার দু চোখের দৃষ্টি। সে বুঝতে পারল যে কচ অনুমতি পেয়েছে স্বদেশে ফিরে যাবার, আর কোন অনুমতি তার পিতার কাছে চায়নি। তাই তার মুখ আবার অবনত করল।

কচ বলল, দেবযানী, তুমি কি আমায় সাদরে বিদায় দেবে না?

ধীরে ধীরে মুখ তুলল দেবযানী। তার দৃষ্টি এখন বাষ্পাচ্ছন্ন বর্ষার সজল মেঘের মতো। বলল, তা কি সম্ভব?

কেন সম্ভব নয় দেবযানী?

তুমি কি এই দেশে ঘর বেঁধে থেকে যেতে পারো না?

না।

তা কেন সম্ভব নয়?

আমাকে যে ফিরে যেতেই হবে। যে বিদ্যার জন্যে এখানে এসেছিলাম, তা আমি পেয়ে গেছি।

দেবযানী অত্যন্ত মৃদু স্বরে বলল, বিদ্যার গর্ব নিয়ে তুমি ফিরে যাবে, কিন্তু কি তোমাকে হারাতে হবে না?

হারাব এই আশ্রমের প্রশান্তি, হারাব তোমাদের সঙ্গ।

আর কিছু?

তোমার যত্নের কথা কোনদিন ভুলব না। তোমার সাহচর্যে আমি প্রবাসের দুঃখ ভুলতে পেরেছিলাম।

তারই জন্যে কি কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছ?

কচ নিঃশব্দে দেবযানীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তাই দেখে দেবযানী বলল, কচ, কোনদিন কি তোমার ইচ্ছে হয়নি এই দেশেই ঘর বেঁধে থেকে যাবার! কাউকে তোমার জীবনের সঙ্গী করে নেবার ইচ্ছা কি কোনদিন হয়নি?

কচ বলল, তুমি কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বল দেবযানী। তোমার এই হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারছি না।

আর কত স্পষ্ট করে বলব?

আমাকে বুঝিয়ে বল।

দেবযানী বলল, সে কথা শোনবার সাহস আছে কি তোমার?

আছে দেবযানী। ভয় পেতে আমি শিখিনি।

দেবযানী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি কি যথানিয়মে আমার পাণিগ্রহণ

করতে পারো না ?

কচ এই কথায় চমকে উঠেছিল। তারপর সংযতভাবে বলল, না দেবযানী, তা সম্ভব নয়।

কেন ?

তুমি আমার গুরু কন্যা, আমি তাঁর পুত্রের মতো। তাই আমাদের বিবাহ ধর্মসম্মত হবে না। গুরুদেবের কাছে শুনেছি, বিবস্বানের কন্যা যমী এই প্রস্তাব করেছিলেন তাঁর ভ্রাতা যমের কাছে। যম তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

দেবযানী বলল, সে কথা আমিও শুনেছি। তাঁরা ছিলেন সহোদর ভ্রাতা ও ভগিনী, একই মায়ের জঠরে তাঁদের জন্ম একই সঙ্গে। তাঁরা ছিলেন যমজ ভাই বোন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের তুলনা কোরো না।

কচ বলল, না দেবযানী, এ বড় অধর্মের কাজ হবে।

অধর্ম তুমি কাকে বলছ! তোমাদের বংশে কি গুরুপত্নীকে হরণ করেনি কোন শিষ্য !

কচ স্তব্ধ হয়ে গেল দেবযানীর এই অভিযোগ শুনে। সহসা কোন উত্তর তার মুখে যোগাল না। অনেক পুরনো কথা তার মনে পড়ে গেল, দুজনের অনেক ভাব বিনিময়ের কথা। সেই সব মুহূর্তে পরস্পরের হৃদয়কে তারা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করেছে। দেবযানী তার ভোগের বাসনার কথা অকপটে ব্যক্ত করতে একটুও দ্বিধা করেনি। কচ চমকে উঠেছিল এই বাসনার কথা জেনে। ভেবেছিল, কোন ঋষির কন্যা কেন এ রকম হবে! কেন ত্যাগের আদর্শকে গ্রহণ করবে না জীবনের ব্রত রূপে !

উত্তরের অপেক্ষা করছিল দেবযানী. বলল. চুপ করে রইলে কেন, উত্তর দাও।

কিন্তু কচ কোন উত্তর ভেবে পেল না। সে দেবযানীর কথাই ভাবছিল. তাকে এখন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ফিরে যেতে হবে। এই দুস্তর দুর্গম পথে কি দেবযানীকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব! সে কি পারবে পায়ে হেঁটে গন্ধমাদন পর্বত অতিক্রম করতে! দৈত্যগুরুর আশ্রমে সে পরম যত্নে লালিত হয়েছে। কষ্ট সইবার মতো ক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজন হয়নি। আজ এই রমণীয় পরিবেশে সে প্রেম বলে যা ভাবছে, তা শুকিয়ে যাবে পথের কষ্টে। কিন্তু দেবযানী এ সব বুঝবে না। তবু কচ বলল, স্বর্গে সুখ আছে সত্যি, কিন্তু

স্বর্গের পথে অনেক কষ্ট। তুমি তা সইতে পারবে না।

কী দরকার স্বর্গে ফিরে যাবার। এসো না, এখানেই আমরা আমাদের ঘর বাঁধি এই উপত্যকায়, এই নির্ঝরিণীর পাশে!

কিন্তু আমি যে ফিরে যাবার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ!

প্রতিশ্রুতি! জীবনের চেয়ে কি প্রতিশ্রুতি বড়? গৌরব আছে বিদ্যার, যশেরও গৌরব আছে। জীবনটাই যদি শুকিয়ে যায়, তবে কী হবে সেই গৌরবে?

কচ বলল, গৌরব নয় দেবযানী। সত্য পালনের চেয়ে বড় ধর্ম নেই। তুমি আমাকে সত্য ভ্রষ্ট কোরো না। এ দেশ থেকে ফিরে না গেলে আমি সবার কাছে নিন্দিত হব, দেবতারা ধিক্কার দেবেন আমাকে।

কেন?

আমি সত্যভ্রষ্ট হয়েছি বলে।

কিন্তু জীবনকে অস্বীকার করছ বলে এখানে কি কেউ তোমাকে ধিক্কার দেবে না?

সে ধিক্কার স্বর্গে পৌঁছবে না।

স্বর্গের ধিক্কারও এখানে আসবে না।

দেবযানীর যুক্তি খণ্ডন করতে পারল না কচ। দেবযানীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা সে আর একবার ভাবল মনে মনে। যদি সে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে পারে মনের জোরে, তাহলে কি তাকে সঙ্গে নেবার কোন বাধা আছে? দেবযানীর পরিচয় পেয়ে দেবতারা কী ভাববেন? শত্রুপক্ষের কন্যাকে ঘরে আনার জন্যে ধিক্কার দেবেন না তো? কিন্তু দেবযানী তো শত্রুর কন্যা নয়, সে ঋষির কন্যা, এসেছে শত্রুর দেশ থেকে। কচ একদিন দেবগুরু হবে, দেবতারা সেদিন দৈত্যগুরুর কন্যাকে কি সম্মান করতে পারবে?

কচকে নিরুত্তর দেখে দেবযানী বলল, ধর্মের কথা বা আদর্শের কথা বোলো না, বল সত্য কথা। আমি জানি, রূপে আমি তোমায় ভোলাতে পারিনি। স্বর্গের কোন কন্যা হয়তো তা পারবে।

ছিছি দেবযানী, এ রকম কথা বোলো না। কোনদিন আমি এ রকম কথা ভাবিনি। আজ বিদায়ের দিন এ সব কথা কেন বলছ?

এ কথা বলবার সুযোগ তো আর পাব না। তাই আজই বলছি।

নাই বা সুযোগ পেলে। ত্যাগ করতে হয় প্রসন্ন মনে, তিক্ত কথায় তার মহিমা নষ্ট হয়। তুমি আমায় সাদরে বিদায় দাও দেবযানী!

দেবযানী বলল, বিদায় দিচ্ছি কচ, কিন্তু সাদরে তা দিতে পারব না। সে অনুরোধ তুমি কোরো না। তবে একটা কথা জেনে রাখো। যে বিদ্যা নিয়ে তুমি ফিরে যাচ্ছ তা নিস্ফল হবে। ভালবাসাই তো জীবন, সেই জীবন তুমি কাউকে দিতে পারবে না। দেহে প্রাণ সঞ্চার করলে জীবন দেওয়া হয় না। তুমি শুধু বিদ্যা দানই করতে পারবে।

কচ বলল, তুমি দুঃখ কোরো না দেবযানী। আমি আমার কথা ভাবছি না, আমি ভাবছি তোমার কথা। তুমি আমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা কর। আমাকে বিবাহ করে তোমার ভোগের বাসনা পূর্ণ হত না। ঋষি পুত্রের সে ঐশ্বর্য কোথায়! তুমি এমন কাউকে গ্রহণ কর যে তোমার পায়ে উপভোগের সমস্ত সামগ্রী এনে ঢেলে দিতে পারে। তুমি সুখী হও, তোমার সুখেই আমার এই ত্যাগ সার্থক হবে।

বলে কচ ফিরে গেল ধীর পদক্ষেপে।

দেবযানীর বুকের ভিতরটা জ্বলে উঠল পরাজয়ের বেদনায়। প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে বুঝি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর তার অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে দু হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ সঞ্জীবনী মন্ত্র পাবার পর গুরুকন্যা দেবযানীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করে স্বদেশে ফিরে গেল প্রসন্ন মনে। দেবযানীর বেদনার কথা জানল না কেউ।

দৈত্যগুরু শুক্র তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, কচের প্রত্যাবর্তনের কথা তোমরা কারও কাছে প্রকাশ কোরো না, পথে তার জীবন সংশয় হতে পারে।

শিষ্যরাও এ কথা বুঝেছিল, বলেছিল, না গুরুদেব, এ কথা আমরা প্রকাশ করব না, এ সংবাদ গোপন রাখবার জন্যেই যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

কিন্তু দৈত্যগুরু দেবযানীর পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। সম্পূর্ণ নিরানন্দ

এক ছায়ামূর্তির মতো সে গৃহকাজে ব্যস্ত হয়ে রইল। মুখে কথা নেই, হাসি নেই ওষ্ঠাধরে। কন্যার এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে পিতা চিন্তিত হলেন। কিন্তু কী করবেন ভেবে পেলেন না।

দেবযানী আর শিশু নয়। কৈশোর অতিক্রম করে সে যৌবনে পদার্পণ করেছে কবে, তা তিনি লক্ষ্য করেন নি। এই বারে তাঁর মনে হল যে লক্ষ্য করা উচিত ছিল। মনে পড়েছে, একদিন তিনি বোধহয় এই সব কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু নিজের কর্তব্য স্থির করতে পারেন নি বলেই ভবিতব্যের উপর সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন কী করবেন? কী করা উচিত হবে তাঁর?

তিনি কি এই রকমই কিছু আশঙ্কা করেছিলেন? মনে পড়ছে না। আর আশঙ্কা করলেই বা কী করতে পারতেন? কন্যা বড় হয়েছে, ভবিষ্যৎ বুঝতে শিখেছে নিজের। সে যা ভাল মনে করবে, তাই করবে। তাকে বাধা দেবার কী আছে! পরামর্শই বা কী দেবেন! হৃদয় বিনিময়ের ব্যাপারে কি অন্যের পরামর্শের কোন প্রয়োজন আছে। না সে পরামর্শ কারও ভালো লাগে।

তবে কচের সম্বন্ধে তিনি এই রকমই ভেবেছিলেন। কৃত কৃতার্থ হয়ে সে আর কাল বিলম্ব করবে না। এ দেশের জন্যে তার আর কোন পিছু-টান থাকবে না। কৃতঘ্নের মতো সে সমস্ত মায়া ত্যাগ করে স্বর্গেই ফিরে যাবে। দৈত্যগুরু তার ব্রত পালনে যে নিষ্ঠা দেখেছেন, তা সংকল্পে সুদৃঢ়, হৃদয়ের আবেগ তা মুহূর্তের জন্যেও টলাতে পারবে না। ব্রহ্মচর্য ব্রতের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেল কচ।

তাঁর মনটাও বিষণ্ণ হয়ে রইল কিছু দিন। কিন্তু তিনি কিছুই প্রকাশ করলেন না। লক্ষ্য করলেন যে এই বিষণ্ণতা তাঁর একার নয়, অন্য শিষ্যরাও কচের অনুপস্থিতিতে বিষাদগ্রস্ত হয়ে আছে। অধ্যয়নে তাদের মনোযোগ বসেছে, আশ্রমের কাজে হারিয়েছে উৎসাহ। সন্ধ্যার অন্ধকারে তার গীত বাদ্যে যে আনন্দের সঞ্চার হত, তা একেবারেই অনুপস্থিত। দেবযানী কথা কইছে না কারও সঙ্গে, নিতান্ত প্রয়োজনীয় দু একটি কথা কইছে ধাত্রী ঘূর্ণিকার সঙ্গে, অন্য সময়ে অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকছে একাকী। এই অবস্থার পরির্বতন হতে যে সময় লাগবে তা তিনি বোঝেন। তাই এই প্রসঙ্গ নিয়ে কাউকে কিছু বলছেন না।

আরও একটা ব্যাপার তিনি লক্ষ্য করেছেন। কিছু দৈত্য ও দানব বংশের লোক ঘনঘন যাতায়াত করছে। কারণে অকারণে তারা আসা যাওয়া করছে দিন ও রাত্রির যে কোন সময়ে। তাদের এই যাতায়াত যে অভিসন্ধি-মূলক তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কারও কাছে কেউ কিছু প্রকাশ করছে না। কচকে অনুপস্থিত দেখে তারা কিছু ভাবছে কিনা তাও জানা যাচ্ছে না।

একদিন সখীদের নিয়ে শর্মিষ্ঠা এসে উপস্থিত হল দৈত্যগুরুর আশ্রমে। কুটিরের অভ্যন্তর থেকে দেবযানীকে টেনে বার করল। বলল, অনেক দিন তুমি আমাদের সঙ্গে খেলতে আসনি!

দেবযানী গম্ভীর ভাবে বলল, আমাদের কি আর খেলবার বয়েস আছে।

বয়েসের কথা তুমি কবে থেকে ভাবছ সখী?

দেবযানী এ কথার কোন উত্তর দিল না দেখে শর্মিষ্ঠাই আবার বলল, বয়েস নিয়ে তো আমাদের কোন ভাবনা নেই। স্বেচ্ছায় আমরা কেন সে কথা ভাবব?

দেবযানী বলল, বয়েস যে নিজেই বয়েসের কথা মনে করিয়ে দেয়, ভুলে থাকতে চাইলেই কি ভুলে থাকা যায়!

আমরা তো বেশ ভুলে আছি।

এ তোমাদের সৌভাগ্য।

তোমারই বা দুর্ভাগ্য কিসের?

বলে শর্মিষ্ঠা চারিদিকে তাকাল। কিন্তু নিকটে কাউকে দেখতে পেল না। অদূরে একটি বৃক্ষতলে দৈত্য ও দানব বালকেরা বসেছে গুরু শুক্রকে ঘিরে। তারা অধ্যয়ন করছে। শর্মিষ্ঠা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল যে তাদের মধ্যে কচ নেই। কচকে সে চেনে। কয়েকবার দেখেছে তাকে। ইলাবৃত বর্ষ থেকে কচ এসেছে শুনে শর্মিষ্ঠা এসে তাকে দেখে গিয়েছিল। তারপর দেবযানীর কাছে এলেই সে কচকে দেখত দেবযানীর সঙ্গে। সেই কিশোরকে দেখে সেও মুগ্ধ হয়েছে দেবযানীর মতো। কিন্তু ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করেনি বলে তার সঙ্গে কোন অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠেনি। পরবর্তী কালে সে আর কচের কোন সংবাদ রাখেনি। তার যৌবনের সংবাদ শর্মিষ্ঠার জানা নেই, জানা নেই দেবযানীরও পরিবর্তনের কথা। কিন্তু দেবযানীর অজানা কিছুই নেই। কচের সংস্পর্শেই সে তার নিজের বয়োবৃদ্ধির সংবাদ পেয়েছে। সে জানে যে যৌবনের সৌরভ দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না,

চেষ্টা করেও লুকিয়ে রাখা যায় না তাকে। কস্তুরী মৃগের মতো পাগল হয়ে ছুটে বেড়াতে হয় এই সৌরভের তাড়নায়। শর্মিষ্ঠা এখনও এমন কারও সংস্পর্শে আসেনি যে তাকে বয়সের কথা মনে করিয়ে দেবে। তাই সে এখনও প্রকৃতির ধর্ম সম্বন্ধে অচেতন হয়ে আছে। দেবযানী সংক্ষেপে বলল, তুমি সে কথা এখনও বুঝবে না।

শর্মিষ্ঠা আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন ?

দেবযানী বলল, বয়েস যে তোমার স্থির হয়ে আছে !

এ কথার মানে ?

রোগে শোকে যেমন বয়েস বাড়ে, তেমনি রাগে অনুরাগেও বাড়ে। তোমরা এক কল্পনার জগতে বাস কর, বয়েস তোমাদের কোন দিনই বাড়বে না। বয়েসের সঙ্গে সম্পর্ক বাস্তবের।

শর্মিষ্ঠার এক সখী হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, কচকে দেখছি না কেন ?

দেবযানী বলল, তার কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না।

কেন ?

সে এখনও বেঁচে আছে কিনা আমার জানা নেই।

শর্মিষ্ঠা সচকিত হয়ে বলে উঠল, না না, এ অসম্ভব কথা।

দেবযানী বলল, অসম্ভব নয় শর্মিষ্ঠা, তাকে হত্যার জন্যে লোকে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে।

কেন ?

সে নাকি আমাদের দেশের শত্রু।

তা কেন হবে ?

দেবযানী বলল, এতদিন পরে সবাই আবিষ্কার করেছে যে সে স্বর্গ থেকে এসেছিল সঞ্জীবনী বিদ্যা চুরি করে নিয়ে যেতে। বিদ্যা কি চুরি করা যায় ?

শর্মিষ্ঠার সখীরাও আশ্চর্য হল এই কথা শুনে। কিন্তু কিছু বলল না। দেবযানী বলল, একদিন তাকে একলা পেয়ে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে গভীর অরণ্যে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। তাকে উদ্ধার করে না আনলে সে বাঘের পেটে যেত।

তারপর ?

তারপর তাকে হাত-পা বেঁধে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেবার ব্যবস্থা।

হয়েছিল। সেই বিপদ থেকেও তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

এখন সে কোথায়?

যা শুনেছি তা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

শর্মিষ্ঠা বলে উঠল, কেন, কী শুনেছ তুমি?

এবারে নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছিল, তারপর ভস্ম করে সুরার সঙ্গে মিলিয়ে তা পান করানো হয়েছিল আমার পিতাকে। বিশ্বাস করতে পারো এই নিষ্ঠুরতার কথা?

শর্মিষ্ঠা বলল, না না, এ সত্য হতে পারে না।

দেবযানী গম্ভীর ভাবে বলল, লোকের হিংসা কত কুৎসিত হতে পারে তা জানো না বলেই এই কথা বলছ। স্বার্থের জন্যে লোকে আজকাল পারে না, এমন কাজ নেই।

কিন্তু কচকে হিংসা করা কার স্বার্থ?

দেবযানী বলল, সে কথা তোমরাই ভাল বুঝবে। এখানে আমরা সবাইকে সমান ভালবাসি, প্রাণী হিংসার কথা আমরা এখানে ভাবতে পারি না।

শর্মিষ্ঠা বলল, এ সব কথা থাক, আজ চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

কোন নতুন খেলা খেলব আমরা।

দেবযানী বলল, আজ থাক শর্মিষ্ঠা, আজ আমার কিছু ভাল লাগছে না।

শর্মিষ্ঠা বলল, তবে কাল আসবে বল, অনেক দিন তুমি আমাদের সঙ্গে খেলতে আসনি।

দেবযানী বলল, তুমি রাগ কোরো না শর্মিষ্ঠা, খেলার বয়েস আর আমাদের নেই। নিজের দিকে চেয়ে দেখো, বুঝতে পারবে সব কথাই। আমাদের পিতা এখনও আমাদের কথা ভাবছেন না, তাই আমরা ছেলেমানুষের মতো খেলার কথা ভাবছি।

শর্মিষ্ঠা আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি কি অন্য কিছু ভাবছ?

ভাবছি না। কিন্তু অন্য কিছু ভাবাই আমাদের উচিত। সাধারণ ঘরে আমাদের জন্ম হলে অনেক আগেই আমাদের ভাবতে হত।

শর্মিষ্ঠা সহাস্যে বলল, তোমার কথাবার্তা একটু অসাধারণ হয়েছে। এ বোধহয়—

বলে সে থেমে গেল।

দেবযানী কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। বলল, আজ থাক শর্মিষ্ঠা, মন ভাল হলেই তোমার কাছে যাব।

তাই এসো।

বলে সখীদের নিকট বিদায় নিল দানবরাজকন্যা শর্মিষ্ঠা।

কিন্তু দেবযানীর মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল কচের চিন্তায়। কচকে নিয়ে সে এক নূতন স্বর্গ রচনার পরিকল্পনা করেছিল। তার সেই স্বপ্ন কচ নিষ্ঠুর হাতে ভেঙে দিয়েছে। দেবযানী এখন সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে এই ভেবে যে এই রকমের চিন্তা কচের মনে কোনদিন স্থান পায়নি। তা হলে দেবযানীকে তার গোপন কামনা এমন নগ্ন ভাবে প্রকাশ করতে হত না। ছি ছি, কী লজ্জার কথা, কী অপমানের কথা। নারী হয়ে পুরুষকে জয় করতে না পারার মধ্যে যে এমন ক্ষোভ আছে, এত গ্লানি, এ কথা দেবযানীর জানা ছিল না। তাই এর প্রতিশোধ নেবার জন্য মন তার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তারপরেই পরাজয়ের বেদনায় সে ভেঙে পড়েছে।

দেবযানী কি তার ভোগের বাসনা উৎকট ভাবে প্রকাশ করেছে কচের কাছে? তবে কেন কচ বলে গেল যে তাকে গ্রহণ করলে দেবযানীর ভোগের বাসনা পূর্ণ হবে না! কচ কেন বলে গেল যে কোন ঋষিপুত্রের সে ঐশ্বর্য নেই বলে এমন কাউকে গ্রহণ করতে হবে যে পারবে সমস্ত উপভোগের সামগ্রী এনে তার পায়ে ঢেলে দিতে! সে কি ঐশ্বর্য চেয়েছিল, না প্রেম? সে যা চেয়েছিল' কচ কি তাকে তা দিতে পারত না?

এমনি করে আরও কিছুকাল কেটে গেল। দৈত্যগুরু শুক্র একদিন নিশ্চিন্ত হলেন যে কচ নিরাপদে স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে গেছে। তা না হলে তিনি কোন দুঃসংবাদ পেয়ে যেতেন। তারপর তিনি দেবযানীকে ডেকে বললেন, ঘরের বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে সারাক্ষণ থেকো না মা, তাতে দেহ ও মন। দুইএরই ক্ষতি হয়।

দেবযানী বলল, বাইরেও যে লাভের কিছু দেখছি না বাবা!

লাভের কথা ভেবে বাইরে আসতে নেই, তাতে ক্ষতির বোঝাই বাড়ে। লাভ-ক্ষতির হিসেব ঘরে রেখে বাইরে বেরোতে হয়, তাতেই লাভের অঙ্কে

মাঝে মাঝে জমা পড়ে। সেই জমার আশাতেই বাইরে ঘুরে বেড়ানো।

বলে দৈত্যগুরু সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

দেবযানী বুঝতে পারল যে তার পিতা তাকে বললেন যে কচও তাঁদের জীবনে এই রকমেরই একটা জমার অঙ্ক। তার বেশি কিছু নয়। তার বেশি কিছু ভাবলে ভুল হবে তাঁদের। কিন্তু দেবযানী এই ব্যাপারটা এত সহজে গ্রহণ করতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে যে কচকে হারালে দেবযানীর জীবনে একটা মস্ত ক্ষতি, এই ক্ষতির পরিমাণ অপূরণীয়। সারা জীবনের সমস্ত লাভ একত্র করেও এই ক্ষতির শূন্য স্থান কোন দিন ভরবে না। কিন্তু এ কথা প্রকাশ করা যায় না। এ কথা মানবে না কেউ। যা পাওয়া যায়নি তাকে হারানোর মূল্য কেউ দেবে না। দেবযানী তাই কুটিরে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু শুক্র তাকে বাধা দিয়ে বললেন, শর্মিষ্ঠার কাছে যাবে না মা?

দেবযানী বলল, আজকাল আমার কিছুই ভাল লাগে না।

সেইজন্যেই তো যেতে বলছি। পুরনো পরিবেশে যদি আনন্দের আস্বাদ না পাওয়া যায় তো নতুন পরিবেশে তা খুঁজতে হবে। আনন্দকে কেউ সিন্ধুকে বন্ধ করে রাখতে পারে না, তা ছড়িয়ে আছে আকাশে বাতাসে উদার দিগন্তে। মুঠো করে তাকে কুড়িয়ে আনা যায়, কিন্তু সঞ্চয় করে রাখা যায় না। আনন্দের সম্পদ গ্রহণ জীবনের একটি প্রাত্যহিক কাজ।

দেবযানী বলল, আনন্দের অন্বেষণেই কি জীবনটা ব্যয় করতে হবে?

আনন্দ তো একা ভোগের জিনিস নয়, আনন্দ সবাই মিলে উপভোগের। আনন্দ বিতরণের জিনিস। কুড়িয়ে এনে তা সঞ্চয় করা যায় না, পেলে বিলিয়ে দিতে হয়। তাতেই আনন্দ। সেইজন্যেই বলি, ঘরের কোণে বসে না থেকে আনন্দের সন্ধানে বেরিয়ে পড়।

বলে দৈত্যগুরু শুক্র এক রকম জোর করেই দেবযানীকে শর্মিষ্ঠার নিকটে পাঠিয়ে দিলেন।

শর্মিষ্ঠা খুশি হল দেবযানীকে দেখে, তার দুহাত জড়িয়ে ধরে বলল, আজ কত দিন পরে তুমি আবার এলে দেবযানী, এখন থেকে রোজ এসো। আমরা নতুন নতুন খেলা খেলব।

দেবযানী বলল, তোমার তো এত সখী আছে, এত দাসী। তবু তোমার আমাকেই চাই কেন?

শর্মিষ্ঠা বলল, তোমার মধ্যে আমি খানিকটা নতুনের আস্বাদ পাই। এবং সবাই আমার কাছে খুব পুরনো হয়ে গেছে।

একজন সখী বলল, আমাদের যে আর মনে ধরে না তা আমরাও বুঝতে পারি। কী করব বল, আমরা যে সত্যিই পুরনো হয়ে গেছি।

আর একজন বলল, আর বেশি দিন তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।

কেন?

মহারাজা চারিদিকে চর পাঠিয়েছেন।

দেবযানী আশ্চর্য হয়ে বলল, চর পাঠিয়েছেন কেন?

বুঝলে না তো!

না।

চর না পাঠালে যুবরাজদের খবর পাবেন কী করে? শর্মিষ্ঠাকে তো যার— তার হাতে দেওয়া যাবে না। তাই চরেরা এখন সূর্য ও চন্দ্রবংশের সব রাজপুত্রের খবর সংগ্রহ করছে—তাদের রূপ গুণ রাজ্য সম্পদের খবর। আমাদের সখী তো যার-তার গলায় মালা দেবে না।

শর্মিষ্ঠা রাগের ভান করে বলল, কী যা-তা বলছিস! আমি কারও গলায় মালা পরাব না।

নিজের গলায় পরবে তো! এ রাজ্যের কোন যুবক তোমার গলায় মালা পরাতে এলে কি তোমার ভাল লাগবে?

শর্মিষ্ঠা বলল, এই জন্যেই তোমাদের সংসর্গ আমার কাছে আজকাল এত বিরক্তিকর বলে মনে হয়। বুঝলে দেবযানী, কিছু দিন থেকে এরা যেন কথা বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না।

সখীদের একজন বলল, তুমি আমাদের কথা বুঝবে দেবযানী। শর্মিষ্ঠার বিয়ের জন্যে মহারাণী উদ্বিগ্ন হয়ে মহারাজাকে বলেছেন তাড়াতড়ি ব্যবস্থা করতে।

কেন?

আর একজন সহাস্যে উত্তর দিল, তোমার জন্যেই।

দেবযানী সবিস্ময়ে বলল, আমার জন্যে!

কচ তোমাদের কাছে আসবার আগে আমরা শুনেছিলাম যে সে তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে।

দেবযানী বলল, আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে কেন?

অনেকেই বলেছিল, তুমি দেবকন্যা। তাই দেবতারা কচকে পাঠিয়েছেন তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে। সেখানে কোন দেবতার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে।

আশ্চর্য! এ সব কথা তো আমি কোন দিন শুনিনি!

শর্মিষ্ঠা বলল, শুনলে তুমি কী করতে?

সরাসরি জিজ্ঞেস করতাম কচকে। বলতাম, সত্যি কথা বল। তবে এ কথা সত্যি হলে সে-ই তো আমাকে বলত! সে কি আমাকে না নিয়ে ফিরে যেতে পারত।

শর্মিষ্ঠা বলল, আমরা কিন্তু সত্যিই ভেবেছিলাম যে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ।

তারপরেই প্রশ্ন করে বসল, সত্যিই কি কচের সঙ্গে তোমার চলে যাবার কথা ছিল না?

দেবযানী বলল, এমন কথা সে কোন দিন আমাকে বলেনি।

তুমিও কি কিছু বলনি তাকে?

আমি বললেই বা সে শুনবে কেন! সে এসেছিল ব্রত পালন করে বিদ্যা-লাভ করতে। অন্য কোন বাসনা তার ছিল না।

তবে তুমি সারাদিন তার সঙ্গে কাটাতে কেন?

কে বলেছে এ কথা?

শর্মিষ্ঠা বলল, সত্যি কথা শুনে রাগ করছ কেন? যে কথা আমরা সবাই জানি, তা কি তুমি নিজে জানো না?

দেবযানী বলল, কী জানো তোমরা?

জানি সবই। দুপুরে তুমি গোচারণের মাঠে যেতে, কচের গান শুনতে, সায়াহ্নে যেতে একটা শ্যামল উপত্যকায়, কচের নৃত্য দেখতে তুমি। তার-পর রাতে তার গীতবাদ্য শুনতে আশ্রমের বৃক্ষমূলে বসে। তুমি কি নিভৃতে তার পরিচর্যা করনি? পরিচর্যা নাওনি তার? পারো এ সব কথা অস্বীকার করতে?

দেবযানী স্তব্ধ হয়ে শুনল এই কথা, কোন উত্তর দিতে পারল না। কিন্তু শর্মিষ্ঠা থামল না। বলল, চুপ করে রইলে কেন, সত্যি কথা বল। পারো তুমি এই সব কথা অস্বীকার করতে?

দেবযানী বলল, বড় গরম বোধ হচ্ছে আমার। আকাশ থেকে বুঝি

উত্তাপ বর্ষণ হচ্ছে।

শর্মিষ্ঠা সহাস্যে বলল, এ তোমার মনের উত্তাপ সখী। এসো, আজ আমরা উপবনের সরোবরে গিয়ে অবগাহন স্নান করি। তোমার এই উত্তাপ-বোধ কমে যাবে।

সখীরা বলল, সেই ভাল। বহুদিন আমরা জলবিহার করিনি। আজকের আবহাওয়া জলবিহারেরই অনুকূল।

বাতাস বইছিল মৃদু মন্দ। প্রভাতের সূর্য মধ্যাহ্ন গগনের দিকে এগিয়েছেন অনেকখানি। তাই রৌদ্র কিরণে উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু উপবনে বড় বড় বৃক্ষের ছায়ায় এই উত্তাপ নেই। সেই ছায়ায় পড়েছে সরোবরের জলে। কুমুদকহ্লার আছে ফুটে, তারই মধ্যে হংসচক্রবাকের পক্ষ সঞ্চালন। গাছের শাখায় পাখির কূজন পথশ্রান্ত পথিককে যেন আহ্বান করে। শর্মিষ্ঠা দেবযানীর হাত ধরে বলল, আজ উপবনেই চল।

বলে তারা সবাই মিলে নিক্রান্ত হল রাজপ্রাসাদ ছেড়ে। পিছনের দরজা দিয়ে কলহাস্যে অগ্রসর হল পর্বতের সানুদেশে রাজকীয় উপবনের দিকে। কুবেরের চৈত্ররথ বনের সঙ্গেই এই উপবনের তুলনা চলে।

এর পরেই একটি মনোরম পার্বত্য উপত্যকা। নানা জাতের হরিণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বলে রাজা ও রাজপুরুষেরা মৃগয়া করতে আসেন সেখানে। হরিণের পিছনে ছুটে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করেন এই উপবনের ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষমূলে। এখানে কোন নির্ঝরিণী নেই, কূপ আছে পানীয় জলের, আর স্নানের জন্য প্রশস্ত জলাশয়। স্বচ্ছ তার নির্মল জল, আর জলে নামার জন্য বাঁধানো সোপান।

দেবযানীর হাত ধরে শর্মিষ্ঠা এসে পৌঁছল সেখানে। সঙ্গে তার অন্যান্য সখীরাও এসেছে কলহাস্যে উপবন মুখর করে। নির্জন উপবন, পথিকের আনাগোনা নেই এই পথে। সরোবরের বাঁধানো ঘাটে বস্ত্র রেখে মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে এখানে অবগাহন স্নান করে, প্রাণের প্রাচুর্যে উচ্ছল হয়ে জল-বিহারের সমস্ত কলা-কৌশল আয়ত্ত করে। খেলা করে হংস চক্রবাকের সঙ্গে। আজও তারা বাঁধানো সোপানের উপরে বস্ত্র রেখে জলে নেমে পড়ল। নিজেদের বস্ত্র যাতে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে না যায় তার জন্যে তারা দূরে দূরে রাখল নিজেদের বস্ত্রগুলি। দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা তাদের বস্ত্র রাখল পাশাপাশি।

শীতল জলে নামার একটা আতঙ্ক আছে। একটু একটু করে এগিয়ে যেতে ইচ্ছা করে, আর তাতেই বাড়ে ভয়। কিন্তু এই ভয় ত্যাগ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে আর কোন ভাবনা থাকে না, মুহূর্তের মধ্যেই শীতল জলের আতঙ্ক যায় দূর হয়ে। তাই যারা সাহসে ভর করে আগে নেমেছিল জলে, তারা দু হাতে জল ছিটিয়ে অন্যদের ভয় ভেঙে দিল। কেউ সাঁতার জানে, কেউ জানে না। যারা সাঁতার জানে না, তারা নাস্তানাবুদ হল অন্যদের হাতে। উচ্ছ্বাসে উল্লাসে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

শর্মিষ্ঠা বলল, তোমার ভাল লাগছে না দেবযানী ?

দেবযানী বলল, এ কথা কেন জানতে চাইছ ?

বড় মন-মরা দেখেছিলাম তোমাকে, তাই জিজ্ঞেস করছি।

দেবযানী বলল, মন থাকলেই মনের ভাল-মন্দ লাগা আছে। সব সময়ে মন কোন নিয়ম মেনে চলে না।

শর্মিষ্ঠা বলল, তোমার কথাবার্তা আর আগের মতো নেই।

কেন ?

কেমন একটা হেঁয়ালি ভাব দেখছি তোমার মধ্যে। সব সময়েই যেন কিছু ভাবছ, আনন্দের বদলে বিষাদকেই বেছে নিচ্ছ নিজের জন্যে।

দেবযানী বলল, বিষাদই তো জীবনের চিরসঙ্গী, আনন্দের মুহূর্তগুলি আঙুলে গোণা যায়।

শর্মিষ্ঠা বলল, সে কি। আমরা তো আনন্দের মুহূর্তগুলোই মুঠো মুঠো কুড়িয়ে রাখি, বিষাদকে তার ধারে-কাছেও আসতে দিই না। আমাদের দুঃখ কিসের! কেন আমরা বিষণ্ণ হব!

দেবযানী বলল, শর্মিষ্ঠা, একদিন আমিও তোমার মতোই ভাবতাম। এখন বুঝেছি যে এই জীবনের ওপর অধিকার আমাদের নেই। কে এই জীবন পরিচালনা করে তাও জানিনে। শুধু এইটুকুই বুঝেছি যে ভাগ্যের হাতে পুতুল আমরা। সামান্য কারণেই সব কিছু ওলোট-পালট হয়ে যেতে পারে।

শর্মিষ্ঠা বলল, কোন আঘাত পেয়েছ মনে হচ্ছে। তা না হলে তুমি তো এ রকম ছিলে না!

আমি কী ছিলাম আর কী হয়েছি, তা নিজেই বুঝতে পারিনে।

বুঝে দরকার নেই। এসো।

বলে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর হাত ধরে সাঁতার কাটতে লাগল।

হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল, কেউ আসছে এই দিকে।

কে ?

বলে অন্য সবাই লজ্জিতভাবে তাকাল চারিদিকে। দেখল, দুরন্ত বাতাসে তাদের বস্ত্রগুলি এলোমেলো হয়ে গেছে। আর মর্মর ধ্বনি আসছে বনান্তরাল থেকে। শর্মিষ্ঠা বলে উঠল, এই অসময়ে কে আসবে এখানে? কাকে দেখেছ বল।

একজন বলল, পদধ্বনি শুনেছি।

আর একজন বলল, চোখে দেখিনি কাউকে।

জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন থেকে ত্রস্ত দৃষ্টিতে সবাই চারিদিকে চেয়ে দেখল। না, কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবু সতর্ক হতে হবে। শর্মিষ্ঠা বলল, তাড়াতাড়ি উঠে পড় সবাই, যে যার বস্ত্র পরে নাও।

বলে নিজেই উঠল সবার আগে এবং ত্বরিত পদে গিয়ে একখানি বস্ত্র জড়িয়ে তার লজ্জা নিবারণ করল। তার সখীরাও উঠল তাড়াহুড়ো করে এবং নিজেদের বস্ত্র পরে নিল। কিন্তু দেবযানীর যেন কোন তাড়া ছিল না। সে জল থেকে উঠল ধীর পদক্ষেপে তারপর চারিদিকে চেয়ে নিজের বস্ত্র দেখতে না পেয়ে সবার দিকে তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। দেখল শর্মিষ্ঠাই তার বস্ত্র পরিধান করেছে। শর্মিষ্ঠার বস্ত্র উড়ে গেছে অদূরে।

দেবযানী দু হাতে তার লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করে শর্মিষ্ঠাকে বলল, তুমি আমার কাপড় পরেছ কেন?

সকৌতুকে শর্মিষ্ঠা বলল, বেশ করেছি।

সখীরা শর্মিষ্ঠার বস্ত্র কুড়িয়ে আনবার জন্যে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু শর্মিষ্ঠা ইসারায় তাদের বারণ করল দেখে দেবযানী রেগে গেল। বলল, এ তোমার কী রকম আচরণ বল।

দেবযানীর বিবসনা দেহের দিকে তাকিয়ে শর্মিষ্ঠা হাসতে লাগল। আর দেবযানী এবারে তার বস্ত্রের প্রান্ত ধরে টানল। বলল, খুলে দাও আমার কাপড়।

শর্মিষ্ঠা হাসতে হাসতেই বলল, দেখি, কেমন করে এ কাপড় তুমি কেড়ে নাও।

বলে নিজেকে মুক্ত করে সরে গেল সখীদের মাঝখানে।

দেবযানী বলল, ছি ছি, এ কেমন রসিকতা তোমার! তোমাদের জন্ম-কর্মই এই রকমের অশালীন। সদাচার তোমরা শিখবে কোথায়?

দেবযানীর এই ভর্ৎসনায় সখীরা চমকে উঠল। এ কী বলছে দেবযানী! দানব রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা জানে না সদাচার! তার জন্ম-কর্মের নিন্দা করছে এক ঋষির কন্যা! স্তম্ভিত হয়ে সবাই শর্মিষ্ঠার মুখের দিকে তাকাল। শর্মিষ্ঠার মুখ তখন আরক্ত হয়ে উঠেছে ক্রোধে। সে বলল, কী বললে তুমি! এ কথা বলতে তোমার মুখে আটকালো না?

দেবযানী বলল, সত্য কথা বলতে দেবযানী ভয় পায় না।

শর্মিষ্ঠা বলল, সত্য কথাই তো বলছ। তোমার পিতা যার স্তুতি করে সারাক্ষণ, তার মেয়ে সদাচার শিখবে কার কাছে! তোমার কি জানা নেই তোমার আমার মধ্যে প্রভেদের কথা?

দেবযানী বলল, প্রভেদ তো নিজের চোখেই দেখছি। গুরুকন্যার কাপড় কেড়ে নিয়ে নিজের অঙ্গে পরেছ সগৌরবে, এত সাহস তোমার!

শর্মিষ্ঠা বলল, তুমিই বা এই সাহস পেলে কোথায়! আমার পিতা শুয়ে বা বসে যে অবস্থাতেই থাকুন-না তোমার পিতা তাঁর নিচের আসনে বসে বিনীতভাবে স্তুতি করেন সারাক্ষণ। তুমি সেই স্তুতিকারীর মেয়ে। যাচঞ্ঞা করা আর দান গ্রহণ করাই যার কাজ। তার মেয়ের মুখে বড় বড় কথা শোভা পায় না।

দেবযানী সবিস্ময়ে বলল, এ কী বলছ তুমি!

ঠিকই বলছি। যিনি সবাইকে দান করেন, তুমি সেই দাতার কন্যা। আমিও তোমাদের স্তুতির যোগ্য। আমার কাছে তুমি মাথা নিচু করে চাইতে পারো। কিন্তু মুখের ওপর মুখ তুলে কথা কইতে পারো না।

দেবযানী কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সখীরা মাঝখানে পড়ে বলল, ছি ছি, এ সব কী বলছ তোমরা! এমন আনন্দের খেলা কি তোমরা বিবাদে মলিন করে দেবে।

শর্মিষ্ঠা বলল, তোমরাই বল। আমি কি দেবযানীর কড়ি ধারি যে ও আমাদের জন্ম কর্ম তুলে গাল দেবে! আমি ওকে ভয় পাই নাকি! তুমি রাগই কর আর যাই কর, আমি তোমাকে গ্রাহ্য করি-না।

বলে শর্মিষ্ঠা সগৌরবে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দেবযানী তাকে যেতে দিল না, বলল, আমার কাপড় না দিয়ে কোথায় যাচ্ছ তুমি!

বলে আবার তার বস্ত্রের প্রান্ত ধরে টানল।

শর্মিষ্ঠা বলল, আমার পরনের কাপড় কেউ কেড়ে নেবে, আর তোমরা তা দাঁড়িয়ে দেখবে। ওকে সমুচিত শিক্ষা দিচ্ছ না কেন?

শর্মিষ্ঠার কথায় সখীরা দেবযানীকে ঘিরে ফেলল। শর্মিষ্ঠা বলল. ওকে টেনে নিয়ে চল এখান থেকে।

অদূরেই একটি অগভীর কূপ ছিল তৃণলতায় আচ্ছাদিত। শুকিয়ে গিয়েছিল তার জল। দেবযানী সেই কূপের মধ্যে পড়ে যেতেই শর্মিষ্ঠা বলে উঠল, এটাই তোমার উপযুক্ত স্থান, এখানেই তুমি থাকো।

বলে বিবসনা দেবযানীকে ফেলে রেখে শর্মিষ্ঠা এগিয়ে চলল।

সখীদের একজন আর্তনাদ করে উঠল, দেবযানী যে মরে যাবে এর মধ্যে!

মরুক, মরাই তার উচিত।

বলে শর্মিষ্ঠা তার সখীদের নিয়ে ফিরে গেল রাজপ্রাসাদে।

দেবযানী ভেবেছিল, সে মরে গেছে। সহসা তার পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গিয়েছিল; মনে হয়েছিল যে, সে পাতালে চলে যাচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে শক্ত মাটির সন্ধান পেয়েছিল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানিতে বোধহয় জ্ঞান হারিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর চেতনা লাভ করে বুঝতে পেরেছিল যে সে একটা কূপের মধ্যে পড়ে গেছে। তৃণলতায় আচ্ছাদিত ছিল এই কূপ, তাই সে দেখতে পায়নি। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে বিবাদের সময়ে তার দু পা এক সঙ্গে পড়েছিল সেইখানে। সে তলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চিৎকার করবারও অবকাশ পায়নি। চোখের এক নিমেষে ঘটে গিয়েছিল এই ঘটনা। চেতনা ফিরে পাবার পর বুঝতে পেরেছিল যে সখীদের নিয়ে শর্মিষ্ঠা ফিরে গেছে। নিষ্ঠুর নির্দয় শর্মিষ্ঠা। সে হয়তো তাকে ঠেলে ফেলে দেয়নি, কিন্তু তার জন্যে এতটুকু ভাবনা হল না কারও। পাপের ভয়ও হল না এতটুকু!

দেবযানী তার নিজের চারিদিকে চেয়ে দেখল। অগভীর কূপে এখন একটুও জল নেই। তবু কারও সাহায্য ব্যতিরেকে সে এই কূপ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। কিন্তু এই নির্জন উপবনে এখন কে আসবে তাকে উদ্ধার করতে! চেঁচিয়ে কাঁদলেও তো কেউ শুনতে পাবে না! ভাগ্যের হাতে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পেল না।

শর্মিষ্ঠারা কি সত্যিই তাকে ফেলে চলে গেল! তারা কি তাকে উদ্ধার করবার জন্যে ফিরে আসবে না! সে আশ্রমে ফিরে না গেলে তার পিতা নিশ্চয়ই তার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়বেন! প্রথমেই তিনি আসবেন রাজ-প্রাসাদে। তাঁর কাছে দেবযানীর কথা সবাই গোপন করবে! তার পিতা কি ধ্যানে বসে সব জানতে পারবেন না!

কিন্তু দেবযানী এখন কী করবে? বড় কষ্ট হচ্ছে এই কূপের ভিতর। বড় উষ্ণ পরিবেশ, বড় নোংরা। নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে সে লজ্জায় যেন মরে গেল। কেউ উদ্ধার করতে এলেও কেমন করে সে বেরিয়ে এসে দাঁড়াবে তার সামনে! মাটির সঙ্গে মিলিয়ে যেতে ইচ্ছা হল দেবযানীর। কিন্তু ইচ্ছা হলেই মিলিয়ে যাওয়া তো যায় না। বাস্তবে তা সম্ভব নয়। তাই নিজের মনটাকে তার সরল করতে হবে। প্রাণ রক্ষার জন্যে ত্যাগ করতে হবে সব রকমের লজ্জা। লোকে বলে, লজ্জা স্ত্রী লোকের অঙ্গের ভূষণ। কিন্তু দেবযানীকে আজ এই লজ্জা বিসর্জন দিতে হবে। তা যতই মর্মান্তিক হোক, দেবযানীকে শক্ত হতেই হবে।

আর—হঁ্যা, এই অপমানের সমুচিত প্রতিশোধ নিতে হবে তাকে। শর্মিষ্ঠা রাজকন্যা হতে পারে, কিন্তু সেও কোন সাধারণ লোকের কন্যা নয়। তার পিতা সর্বজনপূজ্য ঋষি, তাঁকেও অপমান করেছে শর্মিষ্ঠা। এই অপমান দেবযানী কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। সে জানে যে তার পিতা সকলের সব অপরাধ ক্ষমা করতে চাইবেন, কিন্তু দেবযানী তা কিছুতেই দেবে না! ক্ষমা ভীরুর কাজ। যার শক্তি আছে, সে কারও অপরাধ ক্ষমা করবে কোন্ দুঃখে! কিন্তু এই প্রতিশোধ নিতে হলে তাকে বাঁচতে হবে, আর বাঁচতে হলে লজ্জা ত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

দেবযানী কী ভাবে প্রতিশোধ নেবে সেই কথাই ভাবতে লাগল একাগ্র-মনে, প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। আর এই প্রতিশোধ হবে তার এই শাস্তির চেয়ে অনেক বেশি মর্মান্তিক। সে ভুলে গেল যে-কেউ উদ্ধার না করলে এই কূপের মধ্যে মৃত্যু তার অনিবার্য। কিন্তু কে উদ্ধার করবে তাকে? শর্মিষ্ঠা বা তার সখীরা? উদ্ধার করবার ইচ্ছা থাকলে তাকে তারা এই ভাবে ফেলে যেত না। রাজপ্রাসাদে ফিরে তারা কি দেবযানীর এই দুর্দশার কথা কারও কাছেই প্রকাশ করবে না? তারা কি গোপন করবে তাদের এই নিষ্ঠুরতার কথা?

সময় তো অনেক বয়ে গেল কিন্তু কেউ তো এদিকে এল না ! মাথার উপরে আকাশ দেখা যাচ্ছে না, আলো আসছে না উপর থেকে। এই কূপের মতোই অন্ধকার এখন দেবযানীর ভবিষ্যৎ। কিন্তু দেবযানীকে পৃথিবীর আলো দেখতেই হবে। ভয় পেলে তার চলবে না। তাকে এখন উৎকর্ণ হয়ে থাকতে হবে, বাইরে পদধ্বনি শুনতে পেলেই আহ্বান করতে হবে সেই পথচারীকে। কিন্তু এই উপবনে কি কেউ এখন আসবে ? কেন আসবে ? আসবে কোন্ প্রয়োজনে ?

সহসা তার সেই পদধ্বনির কথা মনে পড়ে গেল। সেই পদধ্বনি শুনেই তো তারা তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়েছিল জল থেকে। দেখতে কাউকে পায়নি ঠিকই, কিন্তু কেউ যে এসেছিল তাতে তো সন্দেহ ছিল না কারও। যে এসেছিল সে কি এই পথে ফিরবে না ? দেবযানী কি আবার তার পায়ের শব্দ পাবে না ?

এক সময়ে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত দেবযানীর চোখে নিদ্রা নেমে এল। কিন্তু ঘুমোলে তার চলবে না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে অন্ধকার নামবে এই উপবনে। তখন আর কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। দেবযানী ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল অবিশ্রান্ত ভাবে। সহসা উপরে মর্মর ধ্বনি শুনে সে চিৎকার করে ডাকল, কে আছ কাছে ?

কিন্তু তার এই চিৎকার উপরে পৌঁছল না, কূপের চারিদিকের দেওয়ালে গুমরে উঠল এই শব্দ। দেবযানী আরও জোরে ডাকল, আমি, আমি এই কূপের মধ্যে থেকে তোমাকে ডাকছি। উদ্ধার কর আমাকে।

খানিকক্ষণ কেটে গেল। দেবযানী বুঝতে পারল যে কেউ তার চিৎকার শুনতে পেল না। কোন লোকের বাস নেই রাজার এই উপবনে। কখনো-সখনো রাজার অন্তঃপুর থেকে ললনারা আসে অবগাহন স্নানে। আর রাজা আসেন মৃগয়ায়, আসে রাজপুরুষেরাও। কিন্তু এই দ্বিপ্রহরে কেউ এখানে আসবে বলে দেবযানীর মনে হল না।

দেবযানী যুদ্ধ করছিল ঘুমের সঙ্গে। এক সময়ে বোধহয় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শুনে সে যেন চমকে জেগে উঠে বলল, কে, কে এসেছ এখানে ?

বলে উপরের দিকে তাকাতেই দেখল একটি পুরুষের মুখ। পরম বিস্ময়ে ভরা তার দৃষ্টি। বলল কূপের মধ্যে আমি কণ্ঠস্বর শুনছি কেন ? কে তুমি,

কেন আশ্রয় নিয়েছ এই কূপের মধ্যে ? বল, সত্য বল, কী তোমার উদ্দেশ্য।

তৃণলতায় আচ্ছাদিত ছিল দেবযানীর দেহ। বলল, আগে তোমার উত্তরীয় ফেলে দাও নিচে, তারপর আমার পরিচয় পাবে।

আগন্তুক কোন দ্বিধা না করে তার উর্ধ্বাঙ্গের উত্তরীয় কূপে নিক্ষেপ করলেন। দেবযানী সেই উত্তরীয়ে তার লজ্জা নিবারণ করে তৃণ লতা সরিয়ে বলল, দেখতে পাচ্ছ আমাকে ?

এ কী দেখছি আমি !

না, কোন প্রেতাত্মা নয়, তুমি দেখছ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে। এবারে তোমার নিজের পরিচয় দাও।

আমি চন্দ্রবংশের রাজা নহুষের পুত্র যযাতি। এই পার্বত্য অঞ্চলে মৃগয়ায় এসে শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। তৃষ্ণায় জলের জন্যে কূপের অন্বেষণ করছি এই উপবনে।

এ তো দানবরাজ বৃষপর্বার উপবন !

যযাতি বললেন, জানি না আমি মৃগের পিছনে ছুটে কোথায় এসে পৌঁছেছি। কিন্তু তোমার এই দুর্দশা কেন ?

দেবযানী বলল, আমার দুর্ভাগ্য। রাজা, এই আমি আমার দক্ষিণ হাত তোমার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। তুমি এই হাত ধরে আমাকে টেনে তোল।

যযাতি চমকে উঠে বললেন, এ কি বলছ তুমি ! না না, ডান হাত নয়, তুমি অন্য হাত বাড়িয়ে দাও।

কেন, ডান হাত ধরে তুলতে তোমার আপত্তি কিসের ?

কোন ঋষির পুত্র তোমার ঐ সুন্দর হাত ধরবেন। আমি রাজা, ঋষি কন্যার হাত ধরার অধিকার আমার নেই।

দেবযানী কঠিন স্বরে বলল, আমি বলছি, কোন দোষ হবে না তোমার। তুমি নির্ভয়ে আমার পাণিগ্রহণ কর।

এক হাত নয়, যযাতি একসঙ্গে তাঁর দু হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, তোমার কথাতেই আমি তোমার হাত ধরে উপরে টেনে তুলছি। তুমি আমার অপরাধ নিও না।

রাজার শীতল হাতের স্পর্শে দেবযানীর দেহে রোমাঞ্চ হল। দীর্ঘ দেহের অধিকারী সুপুরুষ রাজা দেবযানীকে কূপের বাহিরে টেনে তুললেন। গভীর দৃষ্টিতে দেখলেন তাকে। বললেন, তোমার এই দশা হল কেন তা বলবে না ?

দেবযানী বলল, সখীদের সঙ্গে জল বিহারে এসেছিলাম এই উপবনে। বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা আমাকে এই কূপে নিক্ষেপ করেছে!

কেন?

থাক সে কথা।

যযাতি বললেন, ঈশ্বরের কী নির্দেশ জানি না, দৈবই আজ আমাকে এখানে টেনে এনেছে। আমাকে বিদায় দাও দেবযানী, আমি আমার নিজের রাজ্যে ফিরে যাই।

দেবযানী বলল, আজ যেতে চাও যাও, কিন্তু আবার তোমাকে আসতে হবে।

দিন অবসান হতে আর দেরি ছিল না। সেই দিকে চেয়ে যযাতি বললেন, তুমিও স্বগৃহে যাও নিশ্চিন্ত মনে, এখানে আর অপেক্ষা কোরো না। বলে যযাতি বিদায় নিলেন দেবযানীর নিকটে।

এই নবীন যুবকের দীর্ঘ দেহের দিকে দেবযানী চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। দৃষ্টি তার অপলক, মন কোন্ গভীরে নিমগ্ন হয়ে কিসের অন্বেষণ করছে তা সে জানে না। স্বগৃহে ফেরবার, জন্য সে পা বাড়াল না, ধীরে ধীরে কয়েক পা এগিয়ে সে একটা বৃক্ষমূলে এসে বসে পড়ল। বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে তার, বড় অসহায়। মনে হচ্ছে, দৈব তাকে উদ্ধার না করলে আজই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসত। কী মূল্য আছে এই জীবনের! কিসের জন্য জীবনকে সবাই এত ভালবাসে! যে জীবন এমন একটা সরু সুতোয় ঝোলে সারাক্ষণ, তার জন্যে এত দরদ কিসের। ধর্ম আমাদের কী দেয়, সংস্কার আমরা মানি কেন, কেন আমাদের এত বিধি-নিষেধ! জীবনেরই যদি কোন মূল্য নেই, তবে এ সবেরই বা মূল্য কী! দেবযানীর আজ গৃহে ফেরবার ইচ্ছা হল না, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধ গেল হারিয়ে। পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে সে বসে রইল।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটল সেদিকে খেয়াল ছিল না দেবযানীর। হঠাৎ সে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। কে যেন তাকে ডাকছে দূর থেকে, দেবযানী! কোথায় তুমি?

দেবযানী এই কণ্ঠস্বর চেনে। তার ধাত্রী ঘূর্ণিকা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। সে এই দিকেই আসছে। ভালই হল। ঘূর্ণিকার মুখেই তার পিতা সব খবর জানতে পারবেন। দেবযানী তার সঙ্গে কিছুতেই ফিরবে না। সে দেখতে চায় তার এই অপমানের কথা শুনে তার পিতা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দেবযানী

সেই বৃক্ষমূলে আরও শক্ত হয়ে বসল, কোন সাড়া দিল না ঘূর্ণিকার ডাকে।

একটু পরেই সেই ধাত্রী এসে উপস্থিত হল। দেবযানীকে এই ভাবে বসে থাকতে দেখে বলল, তুমি এখানে! এই ভাবে বসে আছ? আর আমি তোমাকে খুঁজিনি এমন জায়গা নেই।

দেবযানী কোন উত্তর দিল না।

ঘূর্ণিকা বলল, কী হয়েছে তোমার? এমন চুপ করে একা বসে আছ কেন? সারাদিন কি এই ভাবেই কাটিয়েছ?

দেবযানী এ কথারও কোন উত্তর দিল না দেখে সে বলল, এদিকে তোমার পিতা তোমার জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির। সেই সকালে বেরিয়েছ, অথচ ফেরবার নাম নেই। তোমার খোঁজে আমি কোথায় গিয়েছি, আর কোথায় যাইনি। তোমার সখীরাও তো সব যে যার মতো ফিরে গেছে!

সখীদের নাম শুনেই দেবযানী বলল, তাদের কাছে আমার কথা শোননি?

না। তবে একজন বলল, উপবনে গিয়ে ডাকো তাকে।

আর কিছু বলেনি?

না। নাও, ওঠ এবারে। তাড়াতাড়ি আশ্রমে চল। তোমার বাবা তোমার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছেন।

দেবযানী গম্ভীর ভাবে বলল, না, আমি আর আশ্রমে যাব না, এই দানবরাজার পুরীতে আমি আর প্রবেশ করব না।

ঘূর্ণিকা সবিস্ময়ে বলল, সে কি গো! রাজা তোমার কী করেছে যে তাঁর ওপরে রাগ করছ?

রাজার মেয়ে আমাকে অপমান করেছে, আমার বাবাকে অপমান করেছে যা মুখে এসেছে তাই বলে। এ রাজ্যে আমরা আর থাকব না। যেখানে দুচোখ যায় সেখানেই চলে যাব।

বলে দেবযানী কেঁদে ফেলল দু হাতে মুখ ঢেকে।

ধাত্রী অনেক বোঝাল তাকে, বলল, ছিঃ, এমন অবুঝ হয়ো না। বাড়ি চল, সেখানে পিতাকে সব কথা খুলে বল। তিনি তোমার দুঃখের প্রতিকার করবেন।

দেবযানী সবেগে মাথা নেড়ে বলল, না, এ মুখ আমি কাউকে দেখাব না।

বলে আরও আড়ষ্ট হয়ে বসল।

মায়ের মতো যত্নে এই ধাত্রী মানুষ করেছে দেবযানীকে। কিন্তু আজ সে হার মানল দেবযানীর কাছে। কিছুতেই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। শেষ পর্যন্ত বলল, বেশ, তবে তুমি এইখানেই থাকো, এই ভাবে বসে। এখান থেকে আর কোথাও যেও না। আমি তোমার পিতাকেই এখানে ডেকে আনছি।

বলে ধাত্রী ঘূর্ণিকা গেল দৈত্যগুরু শুক্রকে ডাকতে।

তিনি ঘর-বার করছিলেন। ধ্যানেও বসেছিলেন অগ্নির সামনে। কিন্তু মন স্থির করতে পারেননি। অস্থির মনে কিছু জানতেও পারেননি। ধাত্রীকে একা ফিরতে দেখে তিনি উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, পেলে না তাকে?

আশ্রমের অঙ্গনে শিষ্যরাও সমবেত হয়েছিল গভীর উদ্বেগ নিয়ে। তারা দেবযানীর প্রিয় স্থানগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেছে। সেই নিঝ'রিণীর তীর, শ্যামল উপত্যকা—কচের সঙ্গে যে সব স্থানে বহু সময় কাটিয়েছে। তার কোনখানে তাকে খুঁজে পায়নি। তাই তারাও ধাত্রীর দিকে এগিয়ে এল উত্তরের অপেক্ষায়।

ধাত্রী বিষণ্ণ ভাবে বলল, পেয়েছি, কিন্তু সে আর এই আশ্রমে ফিরবে না।

দৈত্যগুরু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এই উত্তর শুনে। বললেন, কেন? কী বলেছে সে?

ধাত্রী বলল, রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা তাকে অপমান করেছে, অপমান করেছে আপনাকে। তাই সে আর দানবপুরীতে প্রবেশ করবে না।

দৈত্যগুরু হেসে বললেন, আমাদের অপমান করেছে! পাগল মেয়ে! একটি অবুঝ বালিকা আমাদের অপমান করতে পারে! চল, আমি যাচ্ছি তাকে ফিরিয়ে আনতে।

বলে দৈত্যগুরু ধাত্রীকে নিয়ে অগ্রসর হলেন রাজপ্রাসাদের পিছনে সেই উপবনের দিকে। কন্যাকে সেখানে এক বৃক্ষমূলে বসে থাকতে দেখে তিনি দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। সাদরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, কী হয়েছে মা?

দেবযানী কেঁদে ফেলল। অনেকক্ষণ কোন কথা কইতে পারল না।

শুক্র তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বুঝেছি মা, তোমার দুঃখ হয়েছে খুব. কিন্তু মা, এই সুখদুঃখের জন্যে দায়ী কেউ নয়। আমরা নিজেরাই দায়ী।

নিজেদের কর্মফলেই আমরা সুখদুঃখ পাই। এই দুঃখ তোমার প্রাপ্য ছিল, তাই দুঃখ পেয়েছ। এর পরে তোমার সুখের দিন আসবে।

দেবযানী এইবারে বলে উঠল, কর্মফলে আমার বিশ্বাস নেই বাবা, আমি এমন কোন কাজ করিনি যার জন্যে আমাকে এই অপমান সইতে হল! আগে তুমি আমার কথা শোন, তারপর বিচার কোরো কর্মফলের।

দৈত্যগুরু বোঝেন যে দেবযানী অকপটে সব কথা বলতে না পারলে নিজের মনেই গুমরে মরবে। তাই বললেন, সব কথা আমাকে খুলে বল।

দেবযানী বলল, তুমি কি রাজসভায় গিয়ে বাবার স্তুতি কর? তুমি কি যাচঞা কর তাঁর কাছে? প্রতিগ্রহ কর তাঁর ধন? আমি কি কোন ভিখিরীর মেয়ে?

শুক্র এই কথা শুনে হেসে ফেললেন, বললেন, কে বলেছে এই সব আজে-বাজে কথা?

তুমি সত্যি কথা বল বাবা। বল, এ কথা মিথ্যে, মিথ্যে, তা না হলে আমি বাঁচব না।

এ কথা সত্য নয় মা, সত্য হতে পারে না। তোমার পিতা ঈশ্বর ছাড়া আর কারও স্তুতি করে না। যদি কেউ বলে, তোমার পিতা চাটুকার, রাজার স্তুতি করে যাঞা করে, দান গ্রহণ করে কারও, তবে সে মিথ্যা বলে। ত্রিভুবনের সকলে তোমার পিতার কাছে প্রার্থী। শুধু মানুষ আর অসুর নয়, দেবতারাও তোমার পিতার কৃপাপ্রার্থী। একথা সবাই জানে, সবাই মানে। কিন্তু তুমি ঋষির কন্যা, ক্ষমাই তোমার শ্রেষ্ঠ গুণ হওয়া উচিত মা। এত সহজে তোমার উতলা হওয়া সাজে না।

দেবযানী বলল, না বাবা, আমি ঋষির কন্যা, নিজে ঋষি নই। এত সহজে আমি কাউকে ক্ষমা করতে পারব না। শর্মিষ্ঠার দণ্ড আমি ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করি। তাদের অধিকৃত পুরীতে আমি থাকব না। আজ এই মুহূর্তেই আমি এদের পুরী থেকে বিদায় নেব।

শুক্র বললেন, একজনের মুখের কথা দিয়ে একটা জাতির বিচার করবে মা? শর্মিষ্ঠার পিতা তো আমাদের কাছে কোন অপরাধ করেননি? তাঁকে আমরা পরিত্যাগ করে যাব কেন? কেন পরিত্যাগ করব আমার সমস্ত শিষ্যদের?

দেবযানী বলল, তারা কত নিষ্ঠুর তুমি তা জানো না বাবা। কী দিয়ে

আমি লজ্জা নিবারণ করেছি তা কি দেখতে পাচ্ছ না? শর্মিষ্ঠারা আমার বস্ত্র কেড়ে নিয়ে কূপে নিক্ষেপ করেছিল। রাজা যযাতি আমাকে এই উত্তরীয় দিয়ে উদ্ধার করে গেছেন। তিনি না এলে তোমরা আমার মৃতদেহ দেখতে কূপের মধ্যে।

দৈত্যগুরু শুক্র স্তব্ধ হয়ে শুনলেন কন্যার কথা, তারপর বললেন, কী হয়েছিল, সব কথা আমাকে খুলে বল।

দেবযানী সব কথা গড়গড় করে বলে গেল—বস্ত্র বদলের কথা থেকে আরম্ভ করে যযাতির সঙ্গে তার কথোপকথন পর্যন্ত। বলল, তিনি আমার পাণিগ্রহণ করে কূপ থেকে উদ্ধার করেছেন।

শুক্র বললেন, মা, এ সবের পিছনে কোন দৈব উদ্দেশ্য আছে কিনা জানি না। আমাদের সাবধান হওয়ার সময় এসেছে।

দেবযানী বলল, এক সময় কচকে হত্যার জন্য এরা চেষ্টার ত্রুটি করেনি, তারপর আমাকে। আর এই জন্যেই বলছিলাম যে এই পুরীতে আমরা আর থাকব না। এখান থেকে আমরা চলে যাব।

শুক্র ভাবলেন এক মুহূর্ত, তারপর বললেন, তাই চল।

দেবযানী বলল, আজ রাতেই আমরা এখান থেকে চলে যাব, কাউকে বলব না কোথায় আমরা যাচ্ছি।

সেই ভাল।

বলে শুক্র দেবযানীর হাত ধরে নিজের আশ্রমে ফিরলেন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী নিলেন সঙ্গে, তারপর সেই রাতেই কন্যার হাত ধরে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করলেন।

দানব শিষ্যরা দূরে দাঁড়িয়ে সবই দেখছিল। এইবার সাহসে ভর করে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছেন গুরুদেব?

দৈত্যগুরু সংক্ষেপে বললেন, জানি না।

আপনি কি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন?

শুক্র মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ। তোমরা যে যার গৃহে ফিরে যাও।

শিষ্যদের একজন চিৎকার করে কেঁদে উঠল, আপনার পায়ে আমরা কী দোষ করেছি, যে আমাদের ছেড়ে আপনি চলে যাচ্ছেন!

শুক্র থমকে দাঁড়ালেন। দু হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে বললেন, তোমরা কোন দোষ করনি বৎস, তোমাদের কোন অপরাধের জন্যে আমরা চলে

যাচ্ছি না।

তবে ?

আমাদের ভাগ্য আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। আমি তোমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করছি। কারও ওপরে আমার এতটুকু অভিযোগ নেই। তোমরা সবাই সুখী হও।

আকাশের বিদ্যুতের মতো এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। মুহূর্তের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে দৈত্যগুরু দানব রাজ্য ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। সূর্যাস্তের দেরি ছিল না. কিন্তু তার জন্য তিনি অপেক্ষা করলেন না।

দেবযানীকে একজন জিজ্ঞাসা করল, আজ কি এই আশ্রমে সন্ধ্যা দীপ জ্বলবে না ?

কে জ্বালাবে সন্ধ্যাদীপ ?

আমরা ?

দৈত্যগুরু বললেন, যদি ইচ্ছা করে জ্বালিও। যদি কেউ থাকতে চাও, এই আশ্রমে থেকো। এই আশ্রম তোমাদেরই। তোমাদের জন্যে তোমাদের চেষ্টাতেই তৈরি হয়েছিল। হাসি মুখে আমাদের আজ বিদায় দাও।

দৈত্যগুরুর দু চোখে জলের ধারা নামল বেদনার।

দানবরাজ বৃষপর্বার কানেও অবিলম্বে সংবাদ পৌঁছে গেল যে তাঁদের গুরুদেব রাজপুরী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। নৃত্যসভায় বসে অপ্সরার নৃত্য দেখবার জন্য তিনি তৈরি হচ্ছিলেন। চর এসে এই সংবাদ দিতেই তিনি বলে উঠলেন, বন্ধ কর গীতবাদ্যের আয়োজন।

অমাত্যরা উদ্বিগ্ন হলেন, না জানি কী সংবাদ এনেছে চর। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালেন মহারাজার মুখের দিকে। বৃষপর্বা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দুঃসময় এসেছে দানবদের। যে ভাবেই হোক, গুরুদেবকে নিবারণ করতে হবে। তোমরা বেরিয়ে পড চারিদিকে, জেনে নাও কে অপরাধ করেছে তাঁর কাছে, কেন তিনি আমাদের পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন।

বৃষপর্বা বেরিয়ে এলেন রাজসভা থেকে। তাঁর প্রধান অমাত্য এসে তাঁর পিছনে দাঁড়াল। রাজা তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, দেবগুরু বৃহস্পতি ; একবার দেবতাদের পরিত্যাগ করেছিলেন।

কেন মহারাজ ?

তার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র নিজেই দায়ী ছিলেন। তিনি মত্ত অবস্থায় যখন অপ্সরাদের নৃত্য দেখছিলেন, তখন দেবগুরুকে দেখেও সম্মান জানান নি। দেবগুরু তাঁর দ্বার থেকে ফিরে গিয়েছিলেন। তার পরিণাম কী হয়েছিল জানো ?

না।

স্বর্গরাজ্য হারিয়েছিলেন ইন্দ্র। দেবতারা যযাতির পিতা নহুষকে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসিয়েছিল। সে এক দীর্ঘ কাহিনী। মর্মান্তিক নির্যাতন পেয়েছিলেন ইন্দ্রানী শচী।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দৃঢ়স্বরে বৃষপর্বা বললেন, আমাদের গুরুদেবকে কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না। তার জন্যে আমি যে কোন মূল্য দেব। তোমরা শুধু জানবার চেষ্টা কর। কী আমাদের অপরাধ, কে কী অপরাধ করেছে তাঁর কাছে।

বলে নিজে আর একটুও সময় নষ্ট করলেন না, রাজপ্রাসাদ থেকে নিক্রান্ত হলেন প্রধান অমাত্যের সঙ্গে। তাঁর পুরীর দ্বারে গিয়ে প্রহরীকে বললেন, গুরুদেব কি চলে গেছেন ?

হাঁা মহারাজ।

কেন যেতে দিলে তাঁকে ?

তাঁর আদেশ আমি লঙ্ঘন করতে পারলাম না।

তিনি কোন্ দিকে গেছেন ? কারা তাঁর সঙ্গে গেছে ?

প্রহরী ভয়ে ভয়ে বলল, কন্যা দেবযানীর সঙ্গে তিনি একা গেছেন, শিষ্যদের ফিরিয়ে দিয়েছেন এইখান থেকে।

রাজা গুরু গম্ভীর স্বরে বললেন, কোন চর তাঁকে অনুসরণ করে নি ?

না মহারাজ। ভয়ে তারা পিছিয়ে গেছে।

বৃষপর্বা বললেন, আমার রথ যোজনা করে আনতে বল। আমি তাঁদের ফিরিয়ে আনব। পদব্রজে আমি অগ্রসর হচ্ছি।

বলে রাজা পুরী ত্যাগ করে দৈত্যগুরুর অন্বেষণে অগ্রসর হলেন।

দেবযানীকে নিয়ে দৈত্যগুরু শুক্র বেশি দূরে যেতে পারেন নি। সারা দিনের পরিশ্রমের পর দেবযানী অসুস্থ বোধ করছিল। তাই তাঁদের একটি বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। রাজা বৃষপর্বা দূর থেকেই তাঁদের

দেখতে পেয়েছিলেন। কাছে এসে প্রণাম করলেন শুক্রকে. তারপর দুহাত যুক্ত করে বললেন, আপনি আমাদের পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন গুরুদেব ?

শুক্র বললেন, এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই রাজা।

বৃষপর্বা বললেন, আপনি কি কোন কারণে ক্রুদ্ধ হয়েছেন ?

শুক্র বললেন, তুমি তো জানো, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ জয়ের ক্ষমতা আমার আছে। এ সম্বন্ধে আমি তোমাদের অনেক কথাই বলেছি। নিজের ক্রোধ যে সংযত করতে পারে তাকে ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকতে হয় না। যার পৌরুষ আছে, সে ক্ষমা দিয়ে ক্রোধ শান্ত করবে সাপের নির্মোক ত্যাগের মতো। জগৎ জয় করতে হলে অক্রোধের দ্বারাই ক্রোধকে দমন করতে হবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, কারও উপরে আমার ক্রোধ নেই। আমি ক্রুদ্ধ হই না। কারণ থাকলেও উত্তপ্ত হই না। কটূক্তি অতিশয়োক্তি সইবারও ক্ষমতা আমার আছে।

তবে কি আমরা কোন অপরাধ করেছি ?

সে কথা তোমরাই আমার চেয়ে বেশি জানো।

বৃষপর্বা বললেন, আপনি বিশ্বাস করুন গুরুদেব, আমি আমার জ্ঞাতসারে কোন অপরাধ করিনি, যদি অজ্ঞানে কোন অপরাধ করে থাকি তো তার জন্যে আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

শুক্র বললেন, এতদিন আমিও ভাবতাম যে তুমি কোন অপরাধ করতে পার না। কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যা বলব না। এখন আর তা ভাবি না।

কেন গুরুদেব, আমি কি কোন বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ করেছি ?

আমার এখন তাই সন্দেহ হয়।

বৃষপর্বা গভীর উদ্বেগে তাকালেন দৈত্যগুরুর দিকে। কোন প্রশ্ন করবার সাহস পেলেন না। শুক্র একবার তাঁর কন্যার দিকে তাকালেন, তারপর অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ আমার শিষ্য হয়ে আমারই আশ্রয়ে ছিল। বার বার তার প্রাণ নাশের চেষ্টা হয়েছে। আমি কোনদিন ভাবি নি যে এর পিছনে তোমার কোন হাত ছিল।

এখন কি তাই ভাবছেন গুরুদেব ?

সন্দেহ হচ্ছে, তোমার হাত না থাকলে দৈত্য বা দানবেরা এ রকম দুঃসাহসী হত না। তাদের তো কোন স্বার্থ নেই, স্বার্থ তোমার। তুমি ইন্দ্রকে ভয় পাও, তার ভয়েই তুমি অনাথ দৈত্যদের আশ্রয় দাও নি। তুমিই

ভেবেছিলে কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা পেয়ে স্বর্গে ফিরে গেলে ইন্দ্র দুর্ধর্ষ হবে। তাই তুমি তোমার অনুচরদের এই কাজে উৎসাহ দিয়েছ।

দৈত্যগুরুর অভিযোগ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন দানবরাজ বৃষপর্বা। ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন।

হ্যাঁ, আগে করি নি, করছি এখন।

এখন কেন সন্দেহ করছেন?

আমার কন্যাকে জিজ্ঞাসা কর।

বৃষপর্বা দেবযানীর দিকে তাকালেন দু চোখে প্রশ্ন নিয়ে। কিন্তু দেবযানী নির্বাক আছে দেখে বললেন, আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না দেবযানী। তুমি আমার গুরুকন্যা, সহোদরার মতো প্রিয় ও মাননীয়া। তুমি অসঙ্কোচে সব কথা আমাকে খুলে বল।

দেবযানী এবারে দু হাতে তার মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল, কিন্তু কোন কথা বলল না।

শুক্র বললেন, ও বলতে পারবে না। আমি তোমাকে বলছি। তোমার কন্যা শর্মিষ্ঠা ওকে অপমান করে একটা কূপে নিক্ষেপ করেছিল।

দেবযানী বলে উঠল, শুধু আমাকে নয়। অপমান করেছে তোমাকেও

বৃষপর্বা বললেন, একটি বালিকার অপরাধে সমস্ত দৈত্য ও দানব জাতিকে আপনি শাস্তি দেবেন গুরুদেব?

শুক্র বললেন, এরা আর বালিকা নয় রাজা, বিবাহ দিলে এরা সন্তানের জননী হত।

তবু আমি এদের বুদ্ধি অপরিণত বলব। তা-না হলে এতবড় একটা অপরাধ করে সে কথা গোপন করতে পারে সবার কাছে। প্রভু, কন্যার হয়ে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। দৈত্য ও দানব জাতির মুখ চেয়ে আপনি ক্ষমা করুন। আপনি তো ক্ষমা করাকেই ধর্ম বলেন।

তা বলি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ক্ষমা করার অধিকার তো আমার নেই, আর তোমারও নেই ক্ষমা চাইবার অধিকার। যে অপরাধ করেছে আর যার কাছে করেছে তারাই ক্ষমা চাওয়ার ও ক্ষমা করার অধিকারী।

বৃষপর্বা এক মুহূর্ত নীরবে রইলেন। বোধহয় বুঝতে পারলেন যে এ কথা মেনে নিলে বিপদের অবসান না-ও হতে পারে। শর্মিষ্ঠাকে ডেকে আনা যেতে পারে, কিন্তু তারও হয়তো অভিযোগ থাকতে পারে নানারকম এবং

সে ক্ষমা চাইতে না-ও পারে। তখন বিপদ আরও ঘনিয়ে উঠবে। তাই তিনি সেই রকমের একটা অবস্থার আশঙ্কা করে তা এড়াবার জন্য বললেন, আপনি ঠিকই বলছেন গুরুদেব। কিন্তু আমি আপনার ক্ষমা চাইছি, আপনি আপনার সমস্ত শিষ্যদের মুখ চেয়ে আমাকে ও আমার কন্যাকে ক্ষমা করুন। শর্মিষ্ঠা এসে দেবযানীর ক্ষমা ভিক্ষা করবে।

দৈত্যগুরু শুক্র বললেন, এর মধ্যে তুমি আমাকে টেনে আনছ কেন রাজা? আমাকে তুমি দূরে থাকতে দাও।

বৃষপর্বা বললেন, তাহলে আমাকেই দূরে চলে যেতে হয়। আমার তো বয়স হয়েছে, বেঁচে থাকার প্রয়োজন গেছে ফুরিয়ে। আমি এই রাজ্য ত্যাগ করে যাচ্ছি। দানব রাজ্যের ভার আপনিই গ্রহণ করুন।

শুক্র বললেন, আমি ঋষি, জ্ঞান অর্জনের জন্য আমার তপস্যা, জগতের কল্যাণের জন্য সেই জ্ঞান বিতরণ আমার ধর্ম। রাজ্যে আমার কোন প্রয়োজন নেই, লোভ নেই রাজা হবার। রাজ্যের ভার তুমি আর কাউকে দিয়ে যাও, আমাকে লোভ দেখিও না।

বৃষপর্বা বললেন, আপনি প্রসন্ন না হলে আমি আপনার সামনেই প্রাণ ত্যাগ করব।

শুক্র বললেন, একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ রাজা। দুঃখ পেয়েছে আমার কন্যা। প্রসন্ন করতে হয় তাকে কর। আর সে তো কোন অস্ত্রে আহত হয় নি, অগ্নি বা বিষেও দগ্ধ হয় নি যে কালক্রমে সেই ক্ষত নিরাময় হবে। দুর্বাক্যের ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয় সারাক্ষণ, হয় চিরকাল।

বৃষপর্বা এবারে দেবযানীকে বললেন, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না দেবযানী? এর পরিবর্তে আমি তোমাকে আমার সব কিছু দিতে প্রস্তুত আছি।

দেবযানী সোজা হয়ে বসে বলল, যা চাইব তাই?

যদি তা আমার হয় তো নিশ্চয়ই দেব।

শর্মিষ্ঠা তো আপনার কন্যা?

হ্যাঁ।

আমি তাকে চাই। সে তার সমস্ত সখীদের নিয়ে আমার দাসী হবে।

দানবরাজ বৃষপর্বার মাথায় যেন বজ্রপাত হল। তাঁর পুত্র নেই। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরুচি বিধবার জীবন যাপন করছে বনবাসে। শর্মিষ্ঠা দ্বিতীয়

ও শেষ সন্তান। উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার বিবাহ দিয়ে জামাতাকেই তিনি দানব রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন ভেবেছিলেন। অকস্মাৎ এ রকমের যে একটি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, এ তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যে মর্মান্তিক হবে, এই কথা ভেবে তিনি সহসা কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

উত্তরের জন্য খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর দেবযানী বলল, আপনি কিছু বলছেন না কেন মহারাজ? আপনি কি আপনার প্রতিশ্রুতি রাখবেন না?

বৃষপর্বা নতমুখে ভাবছিলেন কিছু। মুখ তুলেই দেখতে পেলেন যে তাঁর সারথি রথ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সামনের পথে। সে নেমে এসে অভিবাদন জানিয়ে মহারাজার আদেশের অপেক্ষা করতে লাগল। দানবরাজ বৃষপর্বা তাঁর সারথিকে বললেন, তুমি এক কাজ কর।

আজ্ঞা করুন।

তুমি আমার প্রাসাদে ফিরে যাও। অন্তঃপুরে গিয়ে আমার মহিষীকে বল যে রাজকন্যাকে নিয়ে তিনি অবিলম্বে এখানে আসুন। তাঁকে বলবে যে, কন্যা যে অপরাধ করেছে তার ক্ষমা নেই। সেই ক্ষমা লাভের জন্য সে যেন যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে আসে।

যথা আজ্ঞা, বলে সারথি ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু রাজা তাকে ডেকে বললেন, শাস্ত্রের নির্দেশ তাঁদের বুঝিয়ে বলবে। কুল রক্ষার জন্য এক জনকে পরিত্যাগ করতে হয়, গ্রাম রক্ষার জন্য ত্যাগ করতে হয় কুল। আর গ্রাম ত্যাগ করতে হয় জনপদ রক্ষার জন্য। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন হলে আত্মরক্ষার জন্য সমগ্র পৃথিবীকেও পরিত্যাগ করতে হতে পারে। কন্যার অপমানে অপমানিত হয়ে গুরুদেব আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। যে কোন মূল্য দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শর্মিষ্ঠা যদি অপরাধ করে থাকে, তবে তাকেই এই দুরূহ কাজ করতে হবে।

সারথি বলল, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করে আমি যাচ্ছি। আমি সব কথা তাঁদের বুঝিয়ে বলব।

মহারাজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল প্রধান অমাত্য। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলে নি। এইবারে সবিনয়ে বলল, মহারাজ, যদি অনুমতি করেন তবে আমি সারথির সঙ্গে যেতে পারি। আমি আপনাদের সব কথা

শুনেছি, মহারাণীকে আমি সব কথা যথাযথ ভাবে নিবেদন করতে পারব।

বৃষপর্বা বললেন, না, তার দরকার হবে না।

প্রধান অমাত্য সবিস্ময়ে মহারাজার মুখের দিকে তাকাল, আর সারথি অপেক্ষা করতে লাগল রাজার আজ্ঞার। বৃষপর্বা বললেন, তুমি একাই যাও সারথি। আমি আমার আদেশ কারও ওপরে চাপিয়ে দিতে চাই না। এই আদেশ হবে আমার প্রিয় কন্যার জীবন-মরণের সঙ্গে যুক্ত অভিশাপের মতো। সে নিজে কোন সিদ্ধান্ত নিক, এই আমার ইচ্ছা। তার কাছে যা কল্যাণের মনে হয়, সে তাই করুক।

তাই হবে মহারাজ।

বলে সারথি রথ নিয়ে প্রস্থান করল দ্রুতগতিতে।

দিগন্তে সূর্যাস্ত হয়েছিল। নির্মেঘ আকাশে তখন তারই বিজ্ঞাপন রঙীন চিত্রমালায় উদ্ভাসিত। দৈত্যগুরু শুক্র চোখ বন্ধ করে সূর্যকে প্রণাম করলেন মনে মনে, কিছু প্রার্থনা জানালেন এই শক্তির প্রতীকের কাছে। তারপর যখন চোখ মেললেন ধীরে ধীরে, তখন মনে হল যে এক রকম বিষণ্ণতায় তাঁর দু চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

বৃষপর্বা ধীরে ধীরে বললেন, গুরুদেব!

দৈত্যগুরু অত্যন্ত মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন, বল রাজা।

আমি কি কন্যাকে দাসী হবার আদেশ না দিয়ে ভুল করলাম?

শুক্র বললেন, না রাজা, তোমার কিছু মাত্র ভুল হয় নি।

আপনি আমার মন-রাখা কথা বলছেন না তো?

না রাজা, তুমি ধার্মিক, তুমি বুদ্ধিমান, তাই রাজ সিংহাসনে বসে কন্যার বিচার কর নি, পিতার কর্তব্য মনে রেখেই নিজের দায়িত্ব পালন করেছ। আমি তোমার মতো দু কূল রক্ষা করতে পারি নি, পিতৃ স্নেহে অন্ধ হয়ে আমি আমার কর্তব্যচ্যুত হয়েছি।

বৃষপর্বা বললেন, আর আমার কোন দুঃখ নেই প্রভু। আপনার কথায় আমি নির্ভয় হলাম। দেবযানী আমাকে দাসত্ব স্বীকার করতে বললে আমি সম্মত হতে এতটুকু দ্বিধা করতাম না। আমার জীবনের উপরে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার। কিন্তু জন্মদাতা বলে কন্যার জীবনে আমার অধিকার সীমিত। আমি তাকে সৎপাত্রে দান করতে পারি, কিন্তু নিজের বা কুলের জন্য কিংবা রাজ্য রক্ষার জন্য তাকে কারও নিকটে বিক্রয় করতে পারি না।

শুক্র বললেন, আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত যে তোমাকে আমি এই রকমের একটা কঠিন সমস্যার সামনে দাঁড় করিয়েছি।

বৃষপর্বা বললেন, আপনার প্রসাদে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে গেছে গুরুদেব, নিজেকে আমি আর অপরাধী ভাবছি না।

একটু থেমে বললেন, আপনি নিজেই ভাবুন, কচকে হত্যা করবার প্রয়োজন আছে ভাবলে আমি কি তা পারতাম না? ফেরার পথে তাকে অনায়াসেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে ইন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষ বৃদ্ধি পেত। তাই পথে তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলাম আমি। আমার চর ছিল চারিদিকে। তাদের কাজ ছিল একটিই, কোন দৈত্য যাতে কচের কোন ক্ষতি করতে না পারে সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা। আমার আশঙ্কা ছিল এই রকম, তাই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম। কচের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলাম।

দৈত্যগুরু বললেন, আমি ভুল বুঝেছিলাম রাজা, স্নেহে অন্ধ হবার জন্যেই এই ভুল হয়েছিল। রাজনীতিতে যে স্নেহের স্থান নেই, নিজের বেলায় তা মনে থাকে না—এই দুঃখ। নিজের ক্ষেত্রে জ্ঞানীরও ভুল হয়।

এঁরা যখন কথা বলছিলেন, তখন দেবযানী শক্ত হয়ে বসে ছিল। বোধহয় তার মনকে দৃঢ় করবার জন্যেই সে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। শক্ত তাকে হতেই হবে। প্রতিশোধ নেবার এই সুযোগ হারালে তার চলবে না। এই প্রথম সুযোগ এবং এই শেষ। এর জন্য পরম দুঃখ স্বীকার করতেও দ্বিধা করলে চলবে না। জীবন যদি ফলে ফুলে পুষ্পিত হয়ে না ওঠে তো মরুভূমি হয়ে যাক, মাঝখানের কোন অবস্থা তার চাই না। কোন মধ্য পন্থা নয়, মানিয়ে নেওয়া নয়, যা চেয়েছি তাতেই শক্ত হয়ে থাকতে হবে।

প্রধান অমাত্য বোধহয় কোন মধ্যপন্থার কথাই ভেবেছিল। তিনি মহা-রাণীর নিকটে যাবার অনুমতি পেলে বোধহয় তাঁকে এই পরামর্শই দিত। দৈত্যগুরু ও রাজা নিয়েছেন আদর্শের পথ, দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার মত কিছুতেই মিলবে না। তাই কোন মধ্য পথের অন্বেষণ করতে হবে। রাজার অমাত্য হয়ে রাজার সামনে কোন মত প্রকাশ করা তার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। কিন্তু অন্তঃপুরে গিয়ে মহারাণীকে যে কোন পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু রাজা বোধহয় তা বুঝতে পেরেই তাকে এই সুযোগ দেন নি। তার চোখের সামনে একটা দুর্যোগ যদি ঘনিয়ে ওঠে, তবে কি নীরব থাকা উচিত হবে?

রাজভক্তির জন্য কি নিজের বিবেক বিসর্জন দিতে হবে ?

সহসা তার মনোযোগ ব্যাহত হল, রথচক্রের ধ্বনি শোনা গেল দূরের পথে। সেই শব্দ ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছিল। একে একে সকলেই উৎকর্ণ হলেন, সবাই বুঝতে পারলেন যে শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে মহারাণী আসছেন এই রথে। দেবযানী ভাবল, শর্মিষ্ঠা আসছে তো! সেই দাম্ভিক রাজকন্যা কি তার দম্ভ বিসর্জন দিয়ে নতি স্বীকার করতে আসবে ?

এই অবস্থায় সে নিজে কী করত, সহসা এই ভাবনা এল দেবযানীর মনে। শর্মিষ্ঠা হলে সে নিজে কী করত? আত্মসম্মানকেই কি সে সব চেয়ে বড় করে দেখত না ?

এর বেশী চিন্তা করার সময় সে পেল না। তার আগেই রাজার রথ এসে থামল তাদের সামনের পথে। দাসীদের সঙ্গে নামলেন মহারাণী, তাঁর সঙ্গে শর্মিষ্ঠাও নামল।

দানবরাজ বৃষপর্বা এগিয়ে গিয়ে বললেন, শর্মিষ্ঠা, বোধহয় সব কথাই শুনেছ। অবস্থার গুরুত্ব তুমি আমাদের চেয়ে বেশি বুঝেছ বলে আমি আশা করি। তাই তোমার ওপরেই আমি সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছি। দেবযানীর সঙ্গে তুমি কথা বল।

শর্মিষ্ঠা বলল, আমি সেই জন্যেই এসেছি বাবা।

বলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকে প্রণাম করে দেবযানীর কাছে এল। তার দুটি হাত ধরে বলল, আমি ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছি, তবু তোমার কাছে অকপটে ক্ষমা চাইছি। তুমি তোমার নিজগুণে আমাকে ক্ষমা কর।

দেবযানী বলল, আমার একটা শর্ত আছে।

কী শর্ত বল।

তুমি তোমার সখীদের নিয়ে আজীবন আমার দাসী হয়ে থাকবে।

শর্মিষ্ঠা এ কথার উত্তর দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না, বলল, এ তো কোন অগৌরবের কথা নয় দেবযানী, পরার্থে জীবন দিলে যদি গৌরব বাড়ে তো আমি সকলের কল্যাণের জন্য তোমার দাসত্ব স্বীকার করছি সানন্দে। আমি বিশ্বাস করি যে আমার জন্য আমার সখীরাও তোমার দাসী হবে হাসি মুখে। আমাদের অপরাধে অপরের কোন ক্ষতি বা বিপদ হোক, এ আমরা চাইনে।

কিন্তু দেবযানী কঠিন স্বরে বলল, কিন্তু পিতা যখন আমার বিবাহ দেবেন,

তখন কী হবে ?

শর্মিষ্ঠা বলল, তোমরা যা স্থির করবে তাই হবে। যদি চাও তো দাসী হয়েই যাব তোমার পতিগৃহে, দাসী হয়েই থাকব সেখানে।

কিন্তু তুমি তো বলেছিলে যে আমি স্তুতিকারী প্রতিগ্রহকারী এক ভিক্ষুকের কন্যা, আর তুমি হচ্ছ দাতার কন্যা। আমার দাসী হয়ে তুমি থাকবে কেমন করে ?

মনে করব, পিতা আমাকেও দান করেছেন তোমাকে সেবার জন্য। এতে সকলেরই কল্যাণ হবে বলে আমার এতটুকু দুঃখ হবে না। তুমি দেখে নিও দেবযানী, এতদিন আমি রাজকন্যা ভেবে রাজকন্যার মতোই আচরণ করেছি। এখন থেকে দাসী ভেবে দাসীর মতোই তোমার সেবা করব। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি, তখন সকল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে বৈকি !

দেবযানী বলল, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রাখবে বলেই আশা করি।

শর্মিষ্ঠা বলল, তোমাকে আমি নিরাশ করব না। এই প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি। আমি এখন থেকেই তোমার দাসী হলাম। এই সংবাদ পেলে আমার সমস্ত সখীও চলে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তাদের ভালোবাসার পরিচয় তুমি কাল পাবে।

এর পর দেবযানী তার পিতাকে বলল, আমার আর কিছু বলার নেই বাবা, দানবরাজার পুরীতে ফিরে যেতে আমার আর আপত্তি নেই।

দৈত্যগুরু শুক্র শর্মিষ্ঠার মাথায় হাত রাখলেন পরিপূর্ণ স্নেহে। আশীর্বাদ করলেন, তোমার কল্যাণ হোক, সুখী হও তুমি।

শর্মিষ্ঠা বলল, নিজের সুখের কথা তো আমি ভাবি নি প্রভু।

শুক্র বললেন, পরার্থে জীবন উৎসর্গ করেছ। তোমার এই ত্যাগ নিষ্ফল হবে না, সার্থক হবে তোমার জীবন।

মহারানী কাঁদছিলেন, বিষণ্ণ হয়েছিলেন বৃষপর্বা। প্রধান অমাত্য নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নিকটে। শুক্র বললেন, চল, আমরা ফিরে যাই।

দেবযানী মহারানীর দিকে চেয়ে বলল, আপনারা রথে যান, আমরা পদব্রজে ফিরব।

বৃষপর্বা বললেন, আমরা সকলেই পদব্রজে ফিরব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেবযানীর সঙ্গে শর্মিষ্ঠা এসে দৈত্যগুরু শুক্রের আশ্রমে প্রবেশ করল। আশ্রম অন্ধকার হয় নি। সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়েছিল একটি দানব শিষ্য। সে অনেক সময়েই দেবযানীর এই কাজ দেখত দাঁড়িয়ে। ঠিক দেবযানীর মতো করেই অগ্নিহোত্রের আগুন এনে এই দীপ জ্বেলে দিয়েছিল। অন্য শিষ্যরা সমিধ জুগিয়েছিল অগ্নিকুণ্ডে। গুরুদেবকে ফিরে আসতে দেখে তারা এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল। বিস্মিত হল দেবযানীর সঙ্গে রাজকন্যাকে দেখে।

কিছুক্ষণের মধ্যে রথারোহণে এল শর্মিষ্ঠার সখীরা। বিষণ্ণমুখে তারা দেবযানীকে বলল, আজ থেকে আমরাও তোমার দাসী।

শর্মিষ্ঠা বলল, আমি তো তোমাদের আসতে বলি নি!

উত্তর দিল একজন। সে বলল, তোমাকে ছেড়ে আমরা এক মুহূর্তও থাকতে পারব না যে!

শর্মিষ্ঠা বলল, আমার জন্যে তোমরা জীবনের সব সুখ জলাঞ্জলি দেবে?

অন্য জন অবিলম্বে বলল, এতেই আমাদের সুখ, অন্য সুখে আমাদের প্রয়োজন নেই।

ধাত্রী ঘূর্ণিকা তাদের সবার জন্যে ব্যবস্থা করে দিল।

দানব শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, এরকম ঘটনার কথা ইতিহাসে নেই। এ এক নজির সৃষ্টি করল দেবযানী।

অন্যজন বলল, কচ চলে যাবার পর দেবযানী যেন বদলে গেছে।

কী রকম হয়েছে বলতো?

কিছুদিন বিষণ্ণ দেখেছিলাম।

এখন?

নিষ্ঠুর বলে মনে হত মাঝে মাঝে। একটা আক্রোশের ভাব ফুটে উঠত তার মুখে।

কিছু মনে হত?

হ্যাঁ। মনে হত পৃথিবীর সবকিছুই যেন সে নিজের হাতের মুঠোয় মধ্যে পেতে চাইছে। আর তা না পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠছে মনে মনে।

আজকের দিনের বিবরণ তখন জানাজানি হয়ে গেছে সকলের। সকলেই জেনেছে যে রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল উপবনে। কিন্তু কে তাকে রক্ষা করেছে তা কেউ জানতে পারে নি। একজন এই ঘটনারই উল্লেখ করে বলল, রাজকন্যাকে দেখে কি তোমার নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছে ?

বরং উল্টো মনে হচ্ছে। বড় কোমল মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। মুখে অভিমান দেখছি না একটুও।

তুমি কি বিশ্বাস কর এই মেয়ে দেবযানীকে কূপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল ?

কিন্তু কথাটা তো মিথ্যা নয়!

এ যে সত্য, তাই বা বলল কে ?

তা না হলে রাজকন্যার এই দুর্গতি হবে কেন! অপরাধী বলেই তো এই দাসীত্ব মেনে নিল।

এ তো তোমার অনুমানের কথা। প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ নয়। অনেকেই তো বলেন, অনুমান প্রমাণ কোন প্রমাণ নয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণই প্রমাণ।

একজন বলল, রাজকন্যার সখীদের জিজ্ঞাসা করলে সত্য ঘটনা জানা যাবে।

জেনে আমাদের লাভ কী বল।

সত্য নির্ণয়ে লাভ নেই বলছ ? লোকসানই বা কী ?

এ সব ব্যাপারে আমাদের কৌতূহল থাকা ভাল নয়। কচকে দেখনি ? কর্তব্য পালনে তার দৃষ্টি ছিল সজাগ, কিন্তু আর কোন ব্যাপারে তার আকর্ষণ ছিল না এতটুকু।

কিসের ইঙ্গিত করছ তুমি ?

সে উত্তর দিল, আমি দেবযানীর কথাই বলছি। আমাদের সঙ্গে তার ব্যবহারের কথা ভাবো। আর কচের সঙ্গে কর তার তুলনা। একে তোমরা এক ব্যবহার বলবে ?

না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কচের সঙ্গে পরিণয় বদ্ধ হতে চেয়েছিল দেবযানী।

কচ তাকে প্রত্যাখ্যান করে গেছে।

অনেকেই চমকে উঠল এই কথা শুনে, একজন বলল, এ তোমার কল্পনা।

কল্পনা নয়, প্রমাণ নেই বলে একেও তোমরা অনুমান বলে অস্বীকার করবে। কিন্তু আমি দেখেছি, লক্ষ্য করেছি দিনের পর দিন। কচকে আকৃষ্ট করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে দেবযানী। তাকে সঙ্গ দিয়েছে সকল স্থানে, তার কাজে কথায় ও চিন্তায় আমি একই উদ্দেশ্য দেখেছি।

চিন্তাও কি দেখা যায়?

চিন্তা করতে দেখা যায়, চিন্তার বিষয়টা করতে হয় অনুমান। কচকে দেবযানী সঙ্গ দিতে চাইত, কথা বলত তার সঙ্গে। সে দূরে থাকলে চিন্তায় নিমগ্ন হত। কচের জন্যে দেখ নি তার উদ্বেগ?

দেখেছি। কিন্তু কী বলতে চাও তুমি?

তুমি কি মনে কর কচকে সে তার জীবনের সঙ্গীরূপে পেতে চায় নি? নিশ্চয়ই চেয়েছিল। আর কচকে আমি যতদূর জানি, সে ছিল নির্বিকার ব্রহ্মচারী, তার একমাত্র ধর্ম ছিল বিদ্যার্জন। তার জন্যই সে গুরুর মতো সেবা করেছে গুরুকন্যাকে। সহোদরার মতো শ্রদ্ধায়, প্রণয় দিয়ে নয়। কিন্তু দেবযানী?

বল অকপটে।

দেবযানী তার পরিচর্যা করেছে কামনা নিয়ে, ভোগের বাসনা সুপ্ত ছিল তার হৃদয়ে। ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী কচ এ কথা বুঝেও বোঝে নি। অনাসক্ত হৃদয়ে সে বিদ্যার্জন করেছে, বিদায় নিয়ে গেছে নির্বিকার চিত্তে। তাদের শেষ সংলাপ আমি শুনি নি, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত দেবযানীর বেদনা আমি অনুভব করেছি। সেই বেদনাই তাকে নিষ্ঠুর করেছে, রাজকন্যা শর্মিষ্ঠার প্রতি সে আরও কত অত্যাচার করে তাই আমাদের দেখতে হবে মুখ বুঁজে।

একজন প্রতিবাদ করে বলল, দেবযানীর প্রতি তুমি অবিচার করছ অকারণে। অনুমানের ভিত্তিতে কারও বিচার করা উচিত নয়।

সে উত্তর দিল, আমি তো বিচার করছি না! সাজা দেবার জন্যে, আমি অনুমান করছি মাত্র। আমার অনুমান সত্য কিনা তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলছি তোমাদের।

কোন দোষ না করে রাজকন্যা শাস্তি নেবেন মাথা পেতে, এ কথাও সত্য হতে পারে না। আমি তাই রাজকন্যাকেই দোষী বলে অনুমান করব।

শিষ্যরা এই নিয়ে আলোচনা করল নিজেদের মধ্যে, কিন্তু কারও কাছে কিছু জানতে চাইল না। অকারণ কৌতূহল প্রকাশ করতে তারা শেখে নি। গুরুদেবের শিক্ষা তা নয়। তারা দেখল যে দেবযানীর সঙ্গে রাজকন্যা তার সখীদের নিয়ে নানা স্থানে যাচ্ছে ক্রীড়ার জন্যে। ক্রীড়া করে কাল-যাপনই তাদের একমাত্র কাজ। রাজগৃহ থেকে দাসদাসী এসেছে, ধাত্রী ঘূর্ণিকার আদেশে তারাই আশ্রমের সব কাজ করছে। আশ্রম পরিচালনার দায়িত্ব রাজার, সে দায়িত্ব যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

রাজপ্রাসাদ এখন নিরানন্দ। দানবরাজ বৃষপর্বা আর নৃত্যসভায় বসেন না, রাজকার্যের পর অন্তঃপুরে চলে আসেন বিশ্রামের জন্য। মহারানীর সঙ্গে কন্যার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন। সত্যিই ইতিহাসে এ রকমের ঘটনার কোন নজির নেই। তাই শর্মিষ্ঠার ভবিষ্যৎ কী হতে পারে তা ভেবে পান না। এক একসময় মহারানী বলেন, আমরা বোধহয় অবিচার করেছি। কোন অপরাধেই আজীবন শাস্তি হওয়া উচিত নয়। দেবযানীর মৃত্যু হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেত ; কিন্তু তা যখন হয় নি, তখন এমন কঠিন শাস্তি তার প্রাপ্য ছিল না।

বৃষপর্বা কোন কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেন না, বিষণ্ণ মুখে নিজের অপরাধ বুঝি মেনে নেন এবং অশ্রুপাত করেন সবার অলক্ষ্যে।

মহারানী বলেন, আমি শুনেছি, শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করে নি, সে নিজেই ঐ কূপে পড়ে গিয়েছিল বস্ত্র নিয়ে কাড়াকাড়ির সময়ে। লতা-গুল্মে আবৃত কূপ তারা দেখতে পায় নি।

মহারাজা বলেন, তাকে উদ্ধার করা উচিত ছিল তাদের। নিজেরা অক্ষম হলে অপরের সাহায্য নিতে হত।

মনে হয় যে ভয়ে তারা গোপন করেছিল এই কথা।

সত্য কথা গোপন করার তো প্রয়োজন নেই! ভয়ে লোকে অপরাধের কথা গোপন করে। শর্মিষ্ঠারা এ কথা গোপন করেই তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে।

মহারানী বলেন, যা হবার তা হয়েছে। তার ভবিষ্যৎ কি আর আমরা ভাবব না ? তার মুক্তির কি কোন উপায় নেই ?

গুরুদেবকে আমি প্রসন্ন করতে পারি, কিন্তু তাঁর কন্যাকে পারি না। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য সে বদ্ধপরিকর। গুরুদেবের অসহায়

অবস্থা আমি দেখেছি। তিনি দুঃখ পাবেন, কিন্তু কোন প্রতিকার করতে পারবেন না।

বলে দানবরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

এই ভাবেই দিন কাটছিল। শর্মিষ্ঠার ভবিষ্যৎ ভাবছে অনেকেই। কিন্তু দেবযানীর কোন ভাবনা নেই। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যও ভেবে কোন প্রতিকার খুঁজে পান নি। রাজকন্যাকে মুক্তি দেবার বাসনা তাঁর মনকে পীড়া দিয়েছে নিরন্তর। কিন্তু কন্যার স্নেহে তিনি অন্ধ হয়ে আছেন। রাজকন্যাকে মুক্তি দিতে বললে দেবযানী দুঃখিত হবে বলে তিনি নীরবে আছেন। ভাবছেন, একদিন সে নিজেই এই অন্যায় বুঝতে পারবে। সৎপাত্রে কন্যাদানের সময়ে তিনি শর্মিষ্ঠাকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব করবেন।

রাজকন্যাকে দাসী রূপে পেয়ে দেবযানী এখন তার অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে নানা ভাবে। একদিন বলল, আজ আমরা উপবনে যাব। সেই উপবনে।

শর্মিষ্ঠারা আর তার সখী নয়, দাসী হয়েছে সবাই। তাদের কোন মতামত নেই। তাই সবাই নীরবে চলল তার সঙ্গে।

উপবনে পৌঁছে দেবযানী একটি পাথরের উপর বসল এবং পায়ের কাছে ডেকে নিল শর্মিষ্ঠাকে। শর্মিষ্ঠা জানে যে দেবযানী তার কোলের উপরে পা তুলে দিয়ে পদ সংবাহন করতে বলবে। তাই কিছু বলার আগেই সে দেবযানীর একটি পা তুলে নিয়ে টিপে দিতে লাগল। অন্যান্য কন্যারাও ব্যাজন প্রভৃতি করে দেবযানীর পরিচর্যায় রত হল।

তারা জানে না যে এই অরণ্যময় উপবন মহারাজা যযাতির মৃগয়াক্ষেত্রের সংলগ্ন। দুই রাজ্যের সীমান্ত চিহ্নিত নয় বলে মৃগের পিছনে ছুটে যযাতি এই উপবনে চলে আসেন মাঝে মাঝেই। সেদিনও তাই হল। মৃগের বদলে একসঙ্গে অনেকগুলি কন্যাকে দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন। অশ্ব থেকে অবতরণ করে এগিয়ে এলেন দেবযানীর দিকে।

দেবযানী আজ বিবসনা নয়, তার অঙ্গ সজ্জা দেখে যযাতি সেদিনের অসহায় দেবযানীকে চিনতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, কোথায় যেন দেখেছি এঁকে। কিন্তু কোথায় দেখেছেন তা মনে পড়ল না। যে কন্যাটি পদ সংবাহন করছে তার রূপেরও তুলনা নেই। কিন্তু কেন এই কন্যারা এই উপবনে এসেছে, তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

সহসা দেবযানীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল যযাতির প্রতি। চমকে উঠল দেবযানী। ভাবল, কোথায় যেন দেখেছি এঁকে? তারপরেই মনে হল, সেদিন বুঝি ইনিই তাকে উদ্ধার করেছিলেন কূপের মধ্য থেকে। তাঁরই মতো মনে হচ্ছে এই সুপুরুষ যুবাকে।

দেবযানীর মনের উপর দিয়ে ছায়ার মতো ভেসে গেল নানা ভাবনা। ইনি সেই ব্যক্তি কিনা তা সর্বাগ্রে জেনে নিতে হবে। যদি তিনিই হন, তবে যে কোন উপায়ে হোক বশ করতে হবে এই রাজাকে, রূপে না পারলে কৌশলে জয় করতে হবে এঁকে। কচ তাকে প্রত্যাখ্যান করে গেছে, কিন্তু দেবযানী আর কারও প্রত্যাখ্যান চায় না। পুরুষকে জয় করতে না পারলে অসার্থক রমণীর জীবন। কী ভাবে এই রাজাকে জয় করা যায়, দেবযানী মনে মনে সেই কথাই ভাবতে লাগল।

এতগুলি সুন্দরী কন্যাকে একসঙ্গে দেখে যযাতির অন্ত ছিল না বিস্ময়ের। তিনি এদের পরিচয় জানবার জন্য ব্যগ্র হয়ে এগিয়ে এলেন। মৃগের পিছনে ছুটে তৃষ্ণার্ত হয়ে যে এখানে এসেছিলেন জলের অন্বেষণে, সে কথা ভুলে গিয়ে দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন জানি না, তোমাকে আমার খুবই চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

দেবযানী বলল, আমারও মনে হচ্ছে তাই। কোথায় যেন দেখেছি তোমাকে, খুব অল্প দিন আগেই দেখেছি।

কিন্তু—

বলে যযাতি একবার শর্মিষ্ঠার দিকে এবং তারপরে অন্যান্য কন্যাদের দিকে চেয়ে বললেন, কিন্তু এঁদের আমি দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

তাদের কয়েকজন মধু ও নানা রকমের ফল আহরণ করে এনেছিল দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার জন্যে। স্তব্ধ হয়ে তারা দাঁড়িয়ে রইল।

দেবযানী বলল, আমি নিজেই আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী।

যযাতি বললেন, আর আমি চন্দ্রবংশের রাজা নহুষের দ্বিতীয় পুত্র যযাতি। আমার অগ্রজ রাজা হতে চান নি বলে আমিই রাজা হয়েছি। মৃগের পিছনে ছুটে ক্লান্ত হয়ে জলের খোঁজে এসেছি এখানে।

দেবযানী শর্মিষ্ঠার একজন সখীর দিকে তাকাতেই সে জল আনতে গেল ছুটে। আর দেবযানী বলল, তাহলে সেদিন তুমিই আমাকে কূপের মধ্য থেকে

উদ্ধার করেছিলে! চিনতে পারলে না আমাকে ?

যযাতি লজ্জিত হয়ে বললেন, আজ তোমাকে অন্য বেশে দেখছি বলেই চিনতে অসুবিধা হয়েছে। আর সেদিন তো এরা কেউ ছিল না।

বলে শর্মিষ্ঠার দিকে তাকালেন যযাতি।

দেবযানী বুঝতে পারল যে রাজা এদের পরিচয়ও জানতে চাইছেন। তাই বলল, হ্যাঁ, সেদিন এরা কেউই আমার সঙ্গে ছিল না। আমাকে সেই কূপে ফেলে দিয়ে এরা সবাই চলে গিয়েছিল।

পরম বিস্ময়ে যযাতি দেবযানীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর দেবযানী তাতে কৌতুক অনুভব করে বলল, ইনি দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা। আর এরা তার সখী। সেদিন এরা আমার সখী ছিল। আজ এরা সবাই আমার দাসী।

রাজা যযাতির বিস্ময় বর্ধিত হল দেখে দেবযানী বলল, আশ্চর্য হচ্ছ কেন রাজা। এরই নাম ভাগ্যের পরিহাস।

সমস্ত ঘটনাটা জানবার ইচ্ছা হয়েছিল রাজা যযাতির। তাই বললেন, আমার কাছে এ বড় রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।

দেবযানী বলল, রহস্যময়ই থাক। কোন ব্যাপারে অকারণ কৌতূহল ভাল নয়।

যযাতি লজ্জিত হলেন এই কথা শুনে। কিন্তু উত্তর দেবার অবকাশ পেলেন না। তার আগেই শর্মিষ্ঠার এক সখী পানীয় জল এনে তাঁর হাতে দিল। যযাতি সেই জল নিঃশেষে পান করলেন। তারপর বললেন, এইবারে আমাকে বিদায় দাও। আমি না জেনে তোমাদের মধ্যে এসে পড়েছিলাম, সেজন্য সত্যিই দুঃখিত।

দেবযানী একবার সুপুরুষ যুবা যযাতির দিকে তাকাল, আর একবার নিজের দিকে। নিজেকে সে সুন্দরী বলেই জানত, কিন্তু যযাতির দৃষ্টিতে মুগ্ধ হবার কোন লক্ষণ না দেখে কিছু ক্ষুব্ধ হল। কচ তাকে প্রত্যাখ্যান করে গেছে, যযাতিও কি তার প্রতি আকৃষ্ট হবে না! কেন, কিসের অভাব আছে দেবযানীর যে কোন যুবা তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে না! দেবযানীর মনের মধ্যে কোন সুপ্ত কামনা কুণ্ডলি পাকিয়ে ফণা তুলল যযাতির দিকে। বলে উঠল, দাঁড়াও, এই ভাবে তুমি এখান থেকে চলে যেতে পার না।

যযাতি ফিরে যাবার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন, এইবারে থমকে দাঁড়ালেন।

কিন্তু কোন প্রশ্ন না করে পরবর্তী কথার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দেবযানী শর্মিষ্ঠার দিকে চেয়ে বললেন, সেদিন এই রাজাই আমার পাণিগ্রহণ করে আমাকে রক্ষা করেছিলেন। এখন দেখছি যে সেই পাণিগ্রহণের কথা তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন।

যযাতি চমকে উঠে বললেন, পাণিগ্রহণ।

দেবযানী কঠিন স্বরে বলল, তুমি কি সেদিন আমার পাণিগ্রহণ কর নি? আর সেদিনই কি প্রথম পুরুষ আমার পাণিগ্রহণ করে নি? আজ আমার মুখে এ কথা শুনে তুমি চমকে উঠছ কেন?

শর্মিষ্ঠাও স্তম্ভিত হয়ে গেল দেবযানীর এই কথা শুনে, তার সখীরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল নিঃশব্দে। আর যযাতির উত্তর শোনবার জন্য তারা অধীর হল উদ্বেগে।

যযাতি সবিনয়ে বললেন, দেবী, সেদিন আমি তোমার প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। বিশ্বাস কর, আর কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না। কোন দুরভিসন্ধি তো নয়ই।

একে দুরভিসন্ধি বলছ কেন?

তুমি ঋষির কন্যা, বিশ্ববিখ্যাত ঋষি শুক্রাচার্য তোমার পিতা। আমি তোমার পাণিগ্রহণের যোগ্য পুরুষ নই। কোন ঋষির পুত্র বা ঋষি হবার যোগ্য পুরুষই তোমার পাণিগ্রহণ করবেন।

দেবযানী গম্ভীর স্বরে বলল, তা আর সম্ভব নয়।

কেন?

কোন পুরুষ একবার পাণিগ্রহণ করলে দ্বিতীয় পুরুষ আর তার পাণিগ্রহণ করতে পারে না। সমাজের এই নিয়ম।

যযাতি সভয়ে বললেন, দৈত্যগুরু কি এই অকার্যের জন্য আমাকে অভিশাপ দেবেন না?

দেবযানী বলল, না রাজা, আমি তোমাকে বরণ করেছি জানলে তিনি তোমাকে বরই দেবেন। তুমি অপেক্ষা কর। আমি তাঁকে এখানেই আসতে বলছি।

বলে একজন দাসীকে পাঠাল তার পিতাকে ডেকে আনবার জন্য।

এরপর কেউ কোন কথা বলতে পারল না। প্রতিটি নিমেষ দীর্ঘ সময় বলে মনে হতে লাগল সকলেরই। যযাতি চিন্তিত মুখে দূরে দাঁড়িয়ে

রইলেন।

শর্মিষ্ঠার সখীর মুখে সংবাদ পেয়ে দৈত্যগুরু শুক্র এলেন দ্রুতপদে। তাঁকে আসতে দেখেই দেবযানী উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল, বলল, পিতা, ইনি রাজা যযাতি। সেদিন ইনিই আমার পাণিগ্রহণ করে কূপ থেকে উদ্ধার করে আমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন। এঁকেই আমি পতিত্বে বরণ করেছি। তুমি এঁরই হাতে আমাকে সম্প্রদান কর।

শুক্র একবার তাঁর কন্যার দিকে আর একবার নতমুখ যযাতির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, রাজা তোমার সঙ্কোচ কিসের?

যযাতি এগিয়ে এসে বললেন, প্রভু, আমি আপনার কন্যার যোগ্য পতি নই বলেই আমার সঙ্কোচ।

শুক্র তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, আমার প্রাণাধিক কন্যা স্বেচ্ছায় তোমাকে বরণ করেছে জেনে আমি প্রসন্ন মনে তাকে তোমার হাতে সম্প্রদান করছি, তুমি গ্রহণ কর। তোমার ভয় নেই, কোন পাপ হবে না তোমার।

দেবযানীকে আমি গ্রহণ করলাম।

বলে যযাতি তাঁকে প্রদক্ষিণ করে দেবযানীকে শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে বিবাহ করলেন।

কন্যার দিকে চেয়ে শুক্র জিজ্ঞাসা করলেন, এদের কী হবে মা?

বলে তাকালেন শর্মিষ্ঠা ও তার সখীদের দিকে।

দেবযানী তৎপর ভাবে উত্তর দিল, এরাও আমার সঙ্গে আমার পতিগৃহে যাবে।

শর্মিষ্ঠাকে পরম স্নেহে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দৈত্যগুরু শুক্র যযাতিকে বললেন, ইনি দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা। এঁকে তুমি সসম্মানে রক্ষা করবে, শয্যায় কোনদিন আহ্বান করবে না।

যযাতি তাঁর মাথা নত করে এই আদেশ মেনে নিলেন এবং যথাসময়ে সবাইকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন।

যযাতির পুরীতে পৌঁছে দেবযানী আশ্চর্য হল, মুগ্ধ হল তার সৌন্দর্য দেখে। যযাতি তাই দেখে বললেন, আমার পিতা নহুষ ইন্দ্রের পুরী দেখে এই পুরী নির্মাণ করেছিলেন। লোকে বলে, ইন্দ্রপুরীর তুল্য এর সৌন্দর্য।

দেবযানী বলল, শুনেছি তিনি ইন্দ্রপদও অলঙ্কৃত করেছিলেন।

যযাতি দুঃখিত হয়ে বললেন, ষড়যন্ত্র করে তাঁর পতন ঘটানো হয়েছে।

কী রকম?

দৈত্যদের ভয়ে ইন্দ্র আত্মগোপন করেছিলেন বলে দেবতারা অরাজক স্বর্গরাজ্যে আমার পিতাকেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি আর ইন্দ্র গোপনে ষড়যন্ত্র করে ঋষিদের সাহায্যে তাঁর পতন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর নামে কলঙ্ক রটানো হয়েছিল যে তিনি ইন্দ্রাণী শচীকে পেতে চেয়েছিলেন।

দেবযানী যযাতির মুখের দিকে চেয়ে আরও কিছু শুনতে চাইল। তাই যযাতি বললেন, তিনি অজগরত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মানে?

তাঁকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল। এই সব দেখেশুনে আমার বড় ভাই যতি বিতৃষ্ণায় রাজ্য গ্রহণ করেন নি। রাজা হয়ে আমি আমার ছোট চার ভাইকে পিতার বিরাট রাজ্যের চারটি অংশে রাজত্ব করতে দিয়েছি। পিতার এই পুরীতে আমি এখন একা।

দেবযানী পুরীর চারিদিকে ঘুরে দেখল। অশোক বনে একটি নতুন গৃহ দেখে বলল, শর্মিষ্ঠা ও তার সখীদের এইখানে থাকতে দাও। এখানেই তারা স্বাধীন ভাবে বাস করুক।

যযাতি খুশী হয়ে বললেন, সেই ভাল।

বলে অশোক বনের সেই নতুন গৃহেই শর্মিষ্ঠাদের বাসের সুব্যবস্থা করে দিলেন। দেবযানীর দাসী রূপে তারা রইল না। তারা যাতে সুখে বাস করতে পারে রাজা সেই ব্যবস্থাই করে দিলেন।

যথাসময়ে দেবযানীর গর্ভে যযাতির একটি পুত্র সন্তান হল। তার নাম রাখা হল যদু। দেবযানী সুখী হল। সার্থক মনে হল তার নারী জীবন। শর্মিষ্ঠা ও তার সখীরা এসে দেবযানীর এই আনন্দ দেখে গেল। উৎসব হল রাজপুরীতে।

অশোক বনে ফিরে এসে শর্মিষ্ঠার এক সখী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তাই দেখে আর একজন বলল, কী হল?

সে উত্তর দিল, আমাদের প্রিয় সখী শর্মিষ্ঠার জন্যে খুব দুঃখ হচ্ছে।

কেন?

সামান্য অপরাধে সে বঞ্চিত হয়েছে জননী হবার সুখ থেকে।

সে তো স্বেচ্ছায় এই যন্ত্রণা ভোগ করছে। ইচ্ছে করলে সেও কি স্বয়ংবরা হতে পারত না? দেবযানীর চেয়ে সে নিকৃষ্ট কিসে? আজ যদি সে এই রাজাকেই পতি নির্বাচন করে, তবে তিনি কি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন? পারবেন না, শর্মিষ্ঠাকেও তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করতে হবে। তাই না সখী?

বলে তারা শর্মিষ্ঠাকেই সরাসরি এই কথা জিজ্ঞাসা করে বসল।

লজ্জায় আরক্ত হল শর্মিষ্ঠার মুখ। সহসা সে কোন উত্তর দিতে পারল না। সখীরাই বলল, সখীর পতি আমাদেরও পতি। রাজা যযাতি যেদিন দেবযানীকে বিবাহ করেছেন, সেদিন তিনি আমাদেরও পতি হয়েছেন। তিনি চাইলে আমাদেরও তাঁর কাছে যেতে হবে। আর না চাইলেই বা কি! আমাদের স্বয়ম্বরা হবার অধিকার আছে দেবযানীর মতো, ইচ্ছা করলে আমরাও মনোমত পতি নির্বাচন করতে পারি—।

কিন্তু একজন প্রতিবাদ করে বলল, শর্মিষ্ঠার সখী হলে আমরা তা পারতাম। এখন তো আমরা সবাই দেবযানীর দাসী, তার অধীন আমরা। রাজা যযাতি ছাড়া অন্য পুরুষের কাছে আমরা যেতে পারি না। তাই না?

বলে শর্মিষ্ঠার দিকে তাকাল। কিন্তু শর্মিষ্ঠা বলল, এ সব কথা থাক ভাই, এসো আমরা অন্য কথা বলি।

শর্মিষ্ঠা একদিন একা এসে দাঁড়িয়েছিল অশোকের একটি শাখা ধরে। সখীদের কথা তার মনে পড়ছিল। সেদিনের একটা সামান্য ভুলের জন্যে তার জীবন ও যৌবন ব্যর্থ হয়ে গেল। দেবযানীকে সে ঈর্ষা করে না, সে দুঃখ করে নিজের কথা ভেবে। এই ভাবেই তাকে যৌবন ক্ষয় করতে হবে! তা না হলে সত্য ভঙ্গ করতে হবে, নয় ব্যভিচার। তা করলে লোকে ধিক্কার দেবে তাকে। সখীদের কথাও তার মনে পড়ল। একমাত্র রাজা যযাতিই তাকে রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু তিনি কি তা করবেন?

সহসা শর্মিষ্ঠা সচকিত হয়ে উঠল। মনে হল একজন পুরুষ এই দিকে আসছে। ভাল করে চেয়ে দেখল, রাজা যযাতিই পদচারণা করতে করতে এই দিকেই আসছেন। শর্মিষ্ঠা ইতস্তত করল একটি মুহূর্ত, ভাবল দৈব বুঝি প্রসন্ন হয়েছে তার উপরে। এখন আর দ্বিধা বা সঙ্কোচ করলে চলবে না, সুযোগ পেলে নিজের কামনার কথা অকপটে ব্যক্ত করতে হবে। তা না হলে তার জীবনে কোন দিন আলো এসে পড়বে না। শর্মিষ্ঠা তার চারিদিকে

চেয়ে দেখল। না, কাছে বা দূরে কেউ কোথাও নেই। নিশ্চিত মনে শর্মিষ্ঠা এগিয়ে গেল ধীর পদক্ষেপে।

যযাতি তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। শর্মিষ্ঠার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে আছেন দেখে শর্মিষ্ঠা নিজেই বলল, আমাকে চিনতে পারছেন না, আমি শর্মিষ্ঠা।

যযাতি বললেন, হ্যাঁ, চিনেছি তোমাকে। তুমি আরও সুন্দর হয়েছ।

শর্মিষ্ঠা বলল, তাতে আমার কী লাভ হয়েছে বলুন!

পুরনো কথা যযাতির মনে পড়ে গেল। সত্যবদ্ধ দানব রাজকন্যা আছে স্বেচ্ছা নির্বাসনে, তিনিও দৈত্যগুরুর কাছে সত্যবদ্ধ। যযাতির এই সুরক্ষিত পুরীতে কোন পুরুষের অধিকার নেই। এই কন্যাদের উদ্ভিন্ন যৌবন বুঝি বৃথাই ক্ষয় হয়ে যাবে। চিন্তিত ভাবে রাজা বললেন, আমি কী করতে পারি বল।

আপনি সবই পারেন।

কিন্তু আমিও যে সত্যবদ্ধ।

শর্মিষ্ঠা বলল, শাস্ত্রের সত্যের সংজ্ঞা কি আপনি জানেন না মহারাজ? পরিহাসে, স্ত্রীলোকের মনোরঞ্জনে, বিবাহকালে, প্রাণ সংশয়ে এবং সর্বস্ব নাশের সম্ভাবনায় - এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে যে পাপ হয় না, এ তো শাস্ত্রেরই বিধান।

চিন্তিত ভাবে যযাতি বললেন, কিন্তু—

দ্বিধা কিসের মহারাজ?

আমি রাজা বলেই দ্বিধা। রাজা হয়ে আমি যদি মিথ্যাচরণ করি, তবে আমার প্রজারাও যে আমাকে অনুসরণ করে পাপে লিপ্ত হবে!

শর্মিষ্ঠা বলল, আপনি সত্য ভঙ্গের কথা ভাবছেন কেন! যেদিন আপনি আমার সখী দেবযানীকে বিবাহ করেছেন, সেদিনই কি আপনি আমারও পতি হননি! সখীর পতি তো নিজের পতির তুল্যই! তবে আপনি এত দ্বিধা করছেন কেন? পুত্রবতী হয়ে আমিও তো ধর্মাচরণ করতে চাই।

তুমি তাই বলছ! অধর্ম যদি না হয় তাহলে আমি তোমায় সুখী করব না কেন!

যথাসময়ে শর্মিষ্ঠারও একটি পুত্র সন্তান হল। দেবযানী এই সংবাদ পেয়ে রেগে গেল, শর্মিষ্ঠার কাছে এসে বলল, কামের বশবর্তী হয়ে এ কী পাপ করলে

তুমি শর্মিষ্ঠা ?

শর্মিষ্ঠা বলল, তুমি বিশ্বাস কর। আমি কোন পাপ করিনি। এক ধর্মাত্মা ঋষি এসেছিলেন আমার কাছে, তাঁরই বরে আমার এই পুত্র হয়েছে।

দেবযানী বলল, সত্যি বলছ ? তাঁর নাম গোত্র আমাকে বলবে ?

শর্মিষ্ঠা বলল, তুমি আমাকে বিপদে ফেললে।

কেন ?

তপস্যার তেজে তিনি ছিলেন সূর্যের মতো দীপ্তিমান। তার পরিচয় জেনে নেবার সাহস আমার ছিল না।

দেবযানীর ক্রোধ প্রশমিত হল। বলল, সত্যিই তুমি যদি এ রকমের একজন ঋষির সঙ্গ লাভে অপত্যলাভ করে থাক, তাহলে আমার কিছু বলার নেই।

বলে দেবযানী তার প্রাসাদে ফিরে গেল।

কিছু দিন পরে আর একটি পুত্র হল দেবযানীর। তার নাম রাখা হল তুর্বসু। শর্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র হল একে একে। তাদের নাম হল দ্রুহ্য, অনু ও পুরু। খেলাধুলো করে, তারা সকলেই বড় হতে লাগল। শর্মিষ্ঠার যে এতগুলি ছেলে হয়েছে দেবযানী তা জানতে পারল না। রাজা যে শর্মিষ্ঠার গৃহে নিয়মিত যাতায়াত করেন, সে সংবাদ তার সখীরা সযত্নে গোপন রাখল।

কিন্তু খুব বেশি দিন তা গোপন রইল না। দেবযানী একদিন যযাতির সঙ্গে উপবনে বেড়াচ্ছিলেন। অশোকবনের কাছাকাছি এসে দেবযানী কয়েকটি বালককে দেখতে পেল। তারা নির্ভয়ে সেখানে খেলা করছিল। দেবযানী তাদের কাছে ডেকে বলল, কে তোমরা, কে তোমাদের পিতা ?

পুরু সবচেয়ে ছোট, সে বলল, কেন জানো-না বুঝি ! ইনিই তো আমাদের পিতা।

বলে দেখিয়ে দিল রাজা যযাতিকে, আর হাত বাড়ালো তাঁকে জড়িয়ে ধরবার জন্য। কিন্তু রাজা তাকে অন্য দিনের মতো কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন না। পুরু কাঁদতে কাঁদতে তার মা শর্মিষ্ঠার কাছে চলে গেল।

দেবযানীর বুঝতে কিছু বাকি রইল না। ক্রোধে উদ্দীপ্ত হল তার সুন্দর মুখ। সেও শর্মিষ্ঠার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু আজ আর দেবযানীকে ভয় পেল না শর্মিষ্ঠা। সে খুব সহজ ভাবেই তার সামনে এসে দাঁড়াল।

দেবযানী গভীর ঘৃণা প্রকাশ করে বলল, ছি ছি, তোমাদের অসুর স্বভাবের

বশেই তুমি এই গর্হিত কাজ করেছ।

শর্মিষ্ঠা বলল, একে গর্হিত কাজ বলছ কেন?

গর্হিত নয়! আমার অধীন হয়ে তুমি আমারই অপ্রিয় কাজ করেছ। তাকে গর্হিত বলব না! কিন্তু আমাকে তোমার একটুও ভয় হল না?

শর্মিষ্ঠা বলল, আমি তো অন্যায় বা অধর্ম কিছু করিনি যে কাউকে ভয় পাব!

এ অন্যায় বা অধর্ম নয়?

না। তুমি যেদিন এই রাজাকে পতি রূপে বরণ করেছিলে, আমিও সেদিন মনে মনে তাই করেছিলাম। যদি ধর্ম মানো তো সখীর পতিই যে আমারও পতি এ কথাও মানবে।

দেবযানী এ কথার কোন উত্তর দিতে পারল না। তাই যযাতির দিকে ফিরে বলল, তুমি আমার অপ্রিয় কাজ করেছ রাজা। আর আমি তোমার কাছে থাকব না। আমাকে বঞ্চনা করেছ তোমরা দুজনেই, আমার পিতার আদেশ অমান্য করেছ। আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছি। তাঁকে আমি সব কথাই বলব। এর পরিণাম যে ভাল হবে না তা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

রাজা কোন উত্তর দিলেন না। শর্মিষ্ঠাও বাধা দিল না দেবযানীকে। দেবযানী তার পিতৃগৃহে যাবার আয়োজন করতে নিজের বাসভবনে ফিরে গেল।

শর্মিষ্ঠা শঙ্কিত হয়ে বলল, দেবযানীকে তুমি বাধা দেবে না রাজা?

যযাতি বললেন, বাধা দিয়ে কোন ফল হবে না।

কেন?

বড় একরোখা সে, যা করবে ভাবে তাই করে। তাকে নিবৃত্ত করতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই।

শর্মিষ্ঠা ভয়ে ভয়ে বললেন, তার অভিযোগ শুনে দৈত্যগুরু যদি শাপ দেন তোমাকে?

শাপের ভয় আমি পাই না। তাঁর দয়ার শরীর। তিনি ক্ষমা করতে জানেন, অভিশাপ দিতে পারবেন না কাউকে।

তবে কি দেবযানী বাকি জীবন পিতৃগৃহেই কাটাবে?

না। যথাসময়ে আমি তাকে ফিরিয়ে আনতে যাব?

শর্মিষ্ঠা বলল, আমার ভয় হচ্ছে। দেবযানীকে প্রসন্ন করবার জন্য দৈত্যগুরু

তোমাকে শাপ দিতেও পারেন।

যযাতি হাসলেন শর্মিষ্ঠার ভয় দেখে। বললেন, কিছুদিন স্বাধীনভাবে আমাকে বিহার করতে দাও শর্মিষ্ঠা। যৌবন ফুরিয়ে গেলে আর তা ফিরে পাব না।

মহারাজা যযাতি দেবযানীকে বাধা দেবার কোন চেষ্টা করলেন না। তিনি জানতেন যে সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হবে। দেবযানী যা স্থির করে, তা সে করেই ছাড়ে। তার জেদ যযাতি জানেন। এই রকমের জেদী না হলে নিজের সখী শর্মিষ্ঠার উপরে সে এমন নির্দয় হয়ে থাকতে পারত না। প্রজারা সবাই জানে যে তাদের রাজা একসঙ্গে দুটি কন্যাকে বিবাহ করে এনেছেন—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী এবং দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা। এই বিবাহে প্রচুর উপঢৌকন পেয়েছিলেন তিনি। সখীদের সঙ্গে নিজের কন্যাও দেবযানীর পতিগৃহে যাচ্ছে বলে দানব রাজা তাঁর গুরুকন্যার বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যযাতি যখন নিজের পুরীতে ফিরেছিলেন, তখন সেই শোভাযাত্রা দেখতে পথে দাঁড়িয়েছিল রাজ্যের সমস্ত প্রজা। তারা ভাবতেও পারেনি যে দানব রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা এসেছে দেবযানীর দাসীরূপে। দেবযানীকে নিজের অন্তঃপুরে রেখে শর্মিষ্ঠাকে অশোক বনের নতুন গৃহে রাখার জন্যও তারা কোন সন্দেহ করার অবকাশ পায়নি। একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের ভিন্ন গৃহে রাখার রীতি সমাজে প্রচলিত আছে। তাই সুন্দরী সখীদের নিয়ে শর্মিষ্ঠা ভিন্ন গৃহে আছে বলে প্রজাপুঞ্জ তাকে মহারানীর সম্মানে বঞ্চিত করেনি। শর্মিষ্ঠার পুত্রদেরও দিয়েছে রাজপুত্রের সম্মান।

কিন্তু দেবযানী পিতৃগৃহে চলে যাবার পর শর্মিষ্ঠা উদ্বিগ্ন হল রাজার জন্য। দৈত্যগুরুর নিকটে গিয়ে দেবযানী কী বলবে এবং তার পরিণাম কী হবে তারই জন্য শর্মিষ্ঠার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। শর্মিষ্ঠা লক্ষ্য করল যে দেবযানী চলে যাবার পর যযাতি আর পূর্বের মতো সংযত জীবন যাপন করছেন না। রাজ্য শাসনের অবকাশে তিনি নৃত্যগীত নিয়ে মেতে উঠেছেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের নিয়েই তিনি সন্ধ্যায় মত্ত হয়ে থাকছেন। বিশ্বাচী নামে এক অপ্সরার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথাও শুনতে পাচ্ছেন। শর্মিষ্ঠার কাছেও

আর তিনি আসছেন না।

শর্মিষ্ঠার সখীরা যযাতির সংবাদ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তিনি নাকি অনেক রাত্রি পর্যন্ত নৃত্যগীত নিয়ে মেতে থাকেন। তারপর রাত্রি যাপন করেন বিশ্বাচী অপ্সরার সঙ্গে। শর্মিষ্ঠা ভয়ে কাতর হয়ে বলে, এ রকম অত্যাচার করলে স্বাস্থ্য যে ভেঙ্গে পড়বে।

সখীরা বলে, নীরবে থাকলে তো চলবে না, প্রতিকার করতে হবে।

কী প্রতিকার?

বাধা দিতে হবে রাজাকে।

চিন্তিতভাবে শর্মিষ্ঠা বলে, তা কি সম্ভব?

--কেন সম্ভব নয়! তুমি তোমার অধিকার প্রয়োগ কর।

শর্মিষ্ঠা হাসবার চেষ্টা করে বলে, আমার আবার অধিকার! যা পেয়েছি, তাই কি যথেষ্ট নয়!

সখীরা বলে, তবে কি তুমি এইভাবে রাজাকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখবে নির্বিকার দর্শকের মতো?

আমি আর কী করতে পারি বল!

যদি মনে কর কিছু করতে পারবে না, তাহলে দেবযানীকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা কর। সে এসে গেলে নিশ্চয়ই একটা প্রতিবিধান করবে। রাজা রীতিমতো ভয় পান তাকে।

তাই বলছ!

সখীরা বলল, তুমি কি দেবাযানীকে আনবার জন্যে রাজাকে পাঠাতে পারবে না ভাবছ?

শর্মিষ্ঠা বলল, রাজা আমার কাছে না এলে আমি তো সে কথা জিজ্ঞেস করতেও পারছি না।

তবে এক কাজ করা যাক।

কী কাজ?

দেবযানীকে সব কথা জানিয়ে আমরাই তার কাছে কাউকে পাঠিয়ে দিই। সব কথা শুনলে দেবযানী আর রাগ করে থাকতে পারবে না। নিশ্চয়ই চলে আসবে।

শর্মিষ্ঠা খুশী হয়ে বলল, সেই ভাল।

সখীরা ব্যবস্থা করে একজন দূত পাঠাল দেবযানীর নিকটে। কিন্তু

সে ফিরে এল একা। বলল, রাজা নিজে আনতে না গেলে দেবযানী আসবেন না।

সব কথা বলেছিলে তাকে ?

বলেছিলাম। সব কথা শুনে তিনি বললেন, পিতার সাপেই তার এই অবস্থা হয়েছে।

কী শাপ দিয়েছেন তিনি ?

দৈত্যগুরু অনেক আগেই বলেছেন যে উচ্ছৃঙ্খল হলে রাজা অকালেই জরাগ্রস্ত হবেন।

এ কথা জেনেও দেবযানী এল না ?

না। রাজা নিজে না গেলে তিনি আসবেন না।

সখীরা দূতকে বিদায় দিয়ে বলল, ঠিক আছে। আমরা রাজাকেই পাঠাব। আর তা সম্ভব না হলে আমাদের সখী শর্মিষ্ঠা নিজেই যাবেন, যাবেন দেবযানীকে আনতে।

শর্মিষ্ঠা আর্তনাদ করে বলল, না না, আমি তা পারব না।

কেন পারবে না ?

আমার বাবা-মা আর ইহজগতে নেই। সেই শূন্য পুরীতে আমি যেতে পারব না।

বলে মুখে ঢেকে শর্মিষ্ঠা কেঁদে ফেলল।

ঠিক আছে। আমরাই রাজাকে ডেকে আনছি।

বলে সখীরা সবাই মিলে রাজার কাছে গিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকে শর্মিষ্ঠার কাছে ডেকে আনল। শর্মিষ্ঠা চমকে উঠল তাঁকে দেখে। জরাগ্রস্ত হতে আর দেরী নেই, ইতিমধ্যেই জরা তাঁকে আক্রমণ করেছে। শর্মিষ্ঠা সভয়ে বলে উঠল, এ কি চেহারা হয়েছে তোমার ? দৈত্যগুরুর অভিসম্পাত যে ফলতে আরম্ভ করেছে।

যযাতি বিস্মিত হয়ে বললেন, কী অভিশাপ দিয়েছেন তিনি ?

শর্মিষ্ঠা বলল, এ ভাবে চললে তুমি অকালে জরাগ্রস্ত হবে।

অন্তরালে থেকে একজন সখী বলল, আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি এর প্রতিবিধানও করবেন।

যযাতি বুঝতে পারছিলেন যে ভোগের বাসনা তাঁর প্রতিদিন বাড়ছে কিন্তু ভোগের ক্ষমতা কমছে প্রতিদিনই। আর বেশিদিন যে তিনি এই

বাসনা চরিতার্থ করতে পারবেন, তার আশা যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর আশঙ্কা হচ্ছে যে শীঘ্রই বোধহয় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যতুর হাতে রাজ্যভার দিয়ে তাঁকে বনবাসে যেতে হবে। রাজ্যের উত্তরাধিকারী থাকলে তাকে বঞ্চিত করে রাজ্য ভোগ করা আর সম্ভব হবে না। বানপ্রস্থে যাবার নিয়ম সমাজের সর্বস্তরে প্রচলিত না হলেও রাজাদের মধ্যে এই নিয়মই চলছে। পুত্ররা বড় হয়েছে, তারা যে রাজ্যের অধিকার দাবী করবে তাতে সন্দেহ নেই।

শর্মিষ্ঠা যযাতিকে নীরব দেখে জিজ্ঞাসা করল, কী ভাবছ মহারাজ ?

যযাতি বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। অকালেই আমাকে জরা আক্রমণ করছে। কিন্তু দৈত্যগুরুর সামনে গিয়ে আমি কোন্ মুখে দাঁড়াব ? তাঁর আদেশ তো আমি মানিনি, কী জবাব দেব তাঁকে ?

শর্মিষ্ঠা বলল, তুমি সত্য কথা বলবে সেই সত্যনিষ্ঠ ঋষিকে। তাঁর ক্ষমা পেতে হলে তোমাকে সত্য কথাই স্বীকার করতে হবে। তাতে লজ্জার কিছু নেই। আমরা দোষ করি পাপ করি। তার প্রায়শ্চিত্ত হয় অনুশোচনায়।

যযাতি বললেন, এ ছাড়া আমি আর কোন উপায় দেখছি না।

শর্মিষ্ঠা খুশী হয়ে বলল, তবে অবিলম্বে তুমি দৈত্যগুরুর নিকটে যাও। তাঁকে প্রসন্ন করে দেবযানীকেও আনো ফিরিয়ে।

কিন্তু তাতে তোমার লাভ কী ?

লাভ ! লাভের কথা তুমি বুঝবে না। ফিরে এসে সে তোমার মহারানী হোক, আমি তার দাসী হয়েই থাকব। তুমি যাও। যদি পার, আজই যাত্রা কর।

বেশ।

বলে যযাতি ফিরে গেলেন।

রাজপুরীতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। রাজা যযাতি দানব রাজপুরীর দিকে যাত্রা করছেন দৈত্যগুরুর সাক্ষাতের জন্য, মহারানী দেবযানীকে তিনি ফিরিয়ে আনবেন। অমাত্যদের অনেকেই খুশী হল এই সংবাদ পেয়ে। রাজার মঙ্গল যারা চায় তারা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

শর্মিষ্ঠার অনুরোধেই যযাতি দেবযানীকে আনতে গেলেন। ভেবেছিলেন যে দৈত্যগুরুকে তিনি তাঁর মুখ দেখাবেন না। তাই আড়ালে দেখা করেছিলেন দেবযানীর সঙ্গে। কিন্তু দেবযানী তাঁকে বলল, না, তা হয় না।

পাপের শাস্তি আগে তোমাকে মাথা পেতে নিতে হবে।

বলে পিতা শুক্রকে ডেকে আনল। শর্মিষ্ঠার মতো দৈত্যগুরুও চমকে উঠলেন যযাতিকে দেখে, বললেন, এ কী চেহারা হয়েছে তোমার?

মাথা নত করে রইলেন রাজা যযাতি, কোন উত্তর দিলেন না।

শুক্র বললেন, এ তোমার উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্যই হয়েছে? কিন্তু কেন তুমি আমার উপদেশ মানলে না? কেন তুমি শর্মিষ্ঠাকেও তোমার শয্যায় টানলে?

যযাতি বললেন, ধর্ম-রক্ষার জন্য আমি বাধ্য হয়েছিলাম। আমি রাজা, সবার সব প্রার্থনা পূরণ করব বলে আমি ঘোষণা করেছিলাম। শর্মিষ্ঠা যখন আমার কাছে পুত্রবতী হতে চাইল, তখন সত্য রক্ষার জন্যই আমি আপনার আদেশ অমান্য করতে বাধ্য হয়েছি।

দেবযানী নিকটেই দাঁড়িয়েছিল। বলল, শুধু তাই নয়, শর্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করেছিল। আমার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়েছিল রাজার। তাই সে তিনটি পুত্রের জননী হয়েছিল!

যযাতি বললেন, প্রিয়-অপ্রিয়ের কথা নয়। ভোগের তৃষ্ণা আমার তৃপ্ত হত না বলেই আমি এ কাজ করেছি। এখনও আমি সংযত হতে পারছি না।

শুক্র বললেন, আমি এর পরিণাম দেখতে পাচ্ছি। জরা তোমাকে আক্রমণ করেছে, অচিরে তুমি জরাগ্রস্ত হবে।

দৈত্যগুরুর সামনে নতজানু হয়ে বসলেন মহারাজ যযাতি। বললেন, প্রভু, আপনি রক্ষা করুন আমাকে। আরও কিছু দিন আমি বিষয় ভোগ করতে চাই।

কিন্তু এ ভাবে চললে তো তা পারবে না।

আপনি একটা উপায় করুন। মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রে আপনি প্রাণদান করতে পারেন। আর আমাকে আপনি নব যৌবন দান করতে পারবেন না!

শুক্র তাকালেন তাঁর কন্যার দিকে। দেবযানী তাঁকে বাধা দিল না দেখে বললেন, আমি তোমাকে কায়কল্পের মন্ত্র দিতে পারি, তাতে অন্যের যৌবন তুমি নিতে পারবে, ফিরিয়েও দিতে পারবে। কিন্তু কেউ কি রাজী হবে তোমাকে তার যৌবন দান করতে?

যযাতি বললেন, আমার পুত্র আছে পাঁচটি। তাদের একজনও কি পিতাকে

তার যৌবন দিতে রাজী হবে না ?

যৌবন সবার কাছেই জীবনের মতো প্রিয়। না দিলে তুমি তাদের দোষ দিতে পার না।

এর পরিবর্তে আমি যদি আমার সমগ্র রাজ্য তাকেই দিই ? তাতে কি আমার ধর্ম নষ্ট হবে ?

শুক্র বললেন, কনিষ্ঠের পূর্বে জ্যেষ্ঠকে এই সুযোগ দিও।

আমি তাই করব প্রভু। আমাকে আপনি কায়কল্পের মন্ত্র দিয়ে অনুগ্রহ করুন।

দৈত্যগুরু দেবযানীর দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, বেশ। কিন্তু এতে তুমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই যৌবনের ক্ষমতা লাভ করবে।

শুক্র যযাতিকে নিয়ে অগ্নিহোত্রে প্রবেশ করলেন। নির্জনে বসে কায়কল্পের মন্ত্র দিলেন যযাতিকে। বললেন, কিছু দিন পূর্বে এই মন্ত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঋষি চ্যবনকে যৌবন দিয়েছিলেন জরার পরিবর্তে। কিন্তু তার জন্য চ্যবনকে কারও নিকটে যৌবন ভিক্ষা করতে হয়নি। আমার সে ক্ষমতা নেই, তাই তোমাকে একজনের কাছে তার যৌবন চেয়ে নিতে হবে।

যযাতি বললেন, আমি কৃতার্থ হলাম। আপনার অনুমতি পেলে দেবযানীকে আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

শুক্র বললেন, সে তোমার পত্নী, তার ওপর তোমারই পূর্ণ অধিকার। পত্নীকে সম্মান করাও তোমার কর্তব্য।

আমি তাকে অসম্মান করব না।

বলে যযাতি দেবযানীকে সঙ্গে নিয়ে নিজ পুরীতে ফিরে এলেন।

তারপর শর্মিষ্ঠার কাছে এসে বললেন, তোমার পরামর্শেই আমি কৃত কৃতার্থ হয়েছি। দৈত্যগুরুর কৃপায় আমি যৌবন ফিরে পাব।

শর্মিষ্ঠা বিস্মিত হয়ে বলল, ছেলেরা বড় হয়েছে, তোমার আর যৌবনের প্রয়োজন কী !

যযাতি বললেন, আমার যে বিষয়ভোগের বাসনা এখনও আছে !

শর্মিষ্ঠা বলল, বাসনার শেষ নেই। বাসনা সংযত করতে পারলেই তার অবসান হয়।

যযাতি বললেন, আমি কামের অন্ত দেখতে চাই শর্মিষ্ঠা। সেই জন্যেই

আমি কিছুদিনের জন্য আমার যৌবন ফিরে পেতে চাইছি।

তোমার এই ইচ্ছা পরিত্যাগ কর রাজা। যৌবন ফিরে পাওয়া তো সম্ভব নয়। কামের অন্ত দেখবার চেষ্টায় তোমার জরা ত্বরান্বিত হবে।

যযাতি হেসে বললেন, না। দৈত্যগুরুর কাছে আমি মন্ত্র পেয়েছি। সেই মন্ত্রে আমি আরও যৌবন গ্রহণ করতে পারব।

শর্মিষ্ঠা হেসে বললেন, এ রকমের অসম্ভব কথা আমি শুনিনি।

শোননি, চ্যবন ঋষি নব যৌবন লাভ করেছিলেন অশ্বিনীকুমারদের কৃপায়। আমার কথাও ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে।

বলে যযাতি নিজের প্রাসাদে ফিরে এসে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে ডেকে বললেন একটা অনুরোধ করবার জন্যে আমি তোমাকে ডেকেছি।

যদু বলল, আদেশ করুন পিতা।

যযাতি বললেল, তোমার মাতামহ শুক্রাচার্যের শাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়েছি।

বাধা দিয়ে যদু বলল, না পিতা, অপরকে আপনি দোষ দেবেন না, এর জন্য আপনি নিজেই দায়ী।

মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন যযাতি, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলেন না। বললেন, সে যাই হোক, বিষয়ভোগের বাসনা আমার এখনও আছে।

যদু বলল, আমাদের দিকে চেয়ে দেখুন, আমাদের কি বিষয়ভোগের বাসনা নেই! আপনি এই বাসনা ত্যাগ না করলে আমরা বিষয়ভোগ করতে পারি না।

আমার কথা শোন।

বলুন।

আমি আর কিছুদিন বিষয়ভোগ করতে চাই, তোমরা অপেক্ষা কর। আর এই সময়ের জন্য আমার জরার পরিবর্তে তোমার যৌবন আমাকে দান কর।

যদু আশ্চর্য হয়ে বলল, তা কি সম্ভব?

যযাতি বললেন, সম্ভব। তোমার মাতামহের কাছে আমি মন্ত্রলাভ করেছি।

যদু ভাবল এক মুহূর্ত, তারপরে বলল, জরায় মানুষের বড় কষ্ট পিতা। আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার জরা গ্রহণ করতে পারব না।

যযাতি বোধহয় ভাবতে পারেন নি যে যদু তাঁকে এই ভাবে প্রত্যাখ্যান করবে। তাই বললেন, পুৎ নামে নরক থেকে পিতাকে রক্ষা করে বলেই সে পুত্র। আর তুমি আমার পুত্র হয়ে কিছুদিনের জন্যে আমার জরা নিতে পারবে না!

যদু বলল, আমার চেয়ে প্রিয় পুত্র আপনার আছে, তাদের কাউকে আপনার জরা নিতে বলুন।

যযাতি বললেন, বেশ, তাহলে তুমি আমার বিষয়ের আশাও কোরো না। তুমি বা তোমার সন্তানেরা আমার রাজ্যের অধিকারী হবে না।

বলে যদুকে বিদায় দিয়ে দেবযানীর কনিষ্ঠ পুত্র তুর্বসুকে ডাকলেন এবং তাকেও সেই একই অনুরোধ করলেন।

তুর্বসু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, তাত, যে জরায় কাম ভোগ বল রূপ ও বুদ্ধির বিনাশ হয়, তা আমি নিতে পারব না।

যযাতি বললেন, তবে তুমি রাজা হবে অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ জাতির এবং তোমার বংশ লোপ হবে।

তারপর তিনি শর্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্রুহ্যুকে ডেকে একই প্রস্তাব করলেন। দ্রুহ্যু বলল, যে জরায় যানবাহনেও আরোহণ করা যায় না, নিজের স্ত্রীকেও উপভোগ করার ক্ষমতা থাকে না, আমাকে সেই জরা গ্রহণ করতে বলবেন না।

যযাতি বললেন, বেশ, তবে আমিও বলছি যে যে-দেশে যানবাহন চলে না এই রকম দুর্গম দেশে গিয়ে তোমাকে বাস করতে হবে সাধারণ মানুষের মতো।

তারপর অনুকে ডেকে যখন তিনি এই কথা বললেন তখন অনু বলল, আমাকে আপনি অক্ষম হয়ে জীবন যাপন করতে বলবেন না।

ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতি বললেন, তোমার এই অবস্থাই হবে এবং তোমার সন্তানেরা যৌবনেই মারা যাবে।

তারপর তিনি শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে ডেকে পাঠালেন। পুরু তখন সবে তার কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছে। পিতার কথা শুনে সে বলল, তাই হবে পিতা। আপনাকে কষ্ট পেতে হবে না। আপনার জরা আমাকে দিয়ে আপনি যথেচ্ছ বিষয়ভোগ করুন।

তোমার অগ্রজেরা যে আমার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে তা তুমি জানো?

জানি তাত। যাঁর অনুগ্রহে আমার এই মানুষ জন্ম, তাঁর প্রতি আমারও তো কিছু কর্তব্য আছে। আমি শুনেছি, যে পুত্র পিতার চিন্তার কথা জেনেই তা করে, সেই উত্তম পুত্র, যে পিতার আদেশ পালন করে সে মধ্যম, আর পিতার আদিষ্ট কাজ যে অশ্রদ্ধার সঙ্গে করে সে তাঁর অধম পুত্র।

আর যে আদেশ পেয়েও তা পালন করে না?

সে তাঁর পুত্র নামের অযোগ্য।

যযাতি পুরুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি পুরু, আমার পরে তুমিই হবে আমার সমগ্র রাজ্যের অধিকারী। তুমি সুখী হবে। তোমার শাসনে প্রজারাও সমৃদ্ধ হবে।

বলে দৈত্যগুরু শুক্রের প্রদত্ত মন্ত্রে পুরুর যৌবন নিয়ে তিনি বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হলেন।

সবাই জানল যে মহারাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হয়েও তপস্যার জন্য বনে যাবেন না। তিনি তাঁর প্রথম চার পুত্রকে বঞ্চিত করে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছেন। পুরু তাঁকে বিষয়ভোগের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু রাজার এই কাজ কেউই সমর্থন করতে পারল না।

যযাতিও বুঝতে পারলেন এই কথা। কিন্তু ভোগের বাসনায় অন্ধ হয়ে তিনি বিশ্বাচীকে বললেন, কামের অন্ত দেখবার জন্যেই আমি এই কাজ করেছি তুমি আমাকে সাহায্য কর।

বিশ্বাচী বলল, মহারাজ, এখানে আপনি উপহাসের পাত্র হবেন। আপনি বরং আমাদের দেশ অলকাপুরীতে চলুন। সেখানে আপনাকে কেউ নিন্দা করবে না।

সেই ভাল।

বলে যযাতি বিশ্বাচীকে নিয়ে দেশভ্রমণে বহির্গত হলেন।

যযাতিকে বাধা দিল না দেবযানী। যদু এসে বলল, মা, তুমি বললে না কিছু? এইভাবে তুমি পিতাকে চলে যেতে দিলে!

দেবযানী বলল, বাধা দিয়ে কোন ফল হত না বাবা। ভোগের তৃষ্ণা যখন মানুষকে পেয়ে বসে, তখন আর তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

যদু বলল, এ কথা জেনেও তুমি মাতামহকে নিবৃত্ত করলে না কেন? তাঁর প্রসাদ লাভ না করলে তো এ রকম হত না!

দেবযানী বলল, ভোগের তৃষ্ণা না মিটলে তো তাঁর মুক্তি হবে না। মনে হয় এতে তাঁর মঙ্গলই হবে। তবে তোমাদের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে, বিশেষ করে তোমার জন্যে। রাজ্য লাভে তুমি বঞ্চিত হলে।

যদু বলল, আমার জন্যে তুমি দুঃখ কোরো না মা। আমি শুনেছিলাম যে ভোগ না করলে বৈরাগ্য আসে না। তাই আমি ভোগ করতে চেয়েছিলাম। এ ভালই হল। ভোগের আস্বাদ পেলে আমারও হয়তো তৃষ্ণা বাড়ত।

বলে যদু পুরী থেকে নির্গত হল। রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য তার ভাল লাগে না। বাইরের মুক্ত আকাশ তাকে টানে। সেই টানে সে পুরীর বাইরে যায়।

একদিন যদু পুরীর বাইরে এক অবধূতের সাক্ষাৎ পেল। যুবকের মতো স্বাস্থ্যবান ঋজু দেহের অধিকারী এই অবধূত একটি বৃক্ষমূলে বসে ছিলেন। সঙ্গে কেউ নেই, কোন দ্রব্যও নেই তাঁর সঙ্গে। ধ্যানস্থ নন, চোখ মেলে চারিদিকে চেয়ে দেখছেন সরল বালকের মতো কৌতূহলে। মুখে তাঁর প্রসন্ন হাসি। ধীর পদক্ষেপে যদু তাঁর দিকে এগিয়ে গেল।

অবধূত তাঁকে দেখতে পেয়ে হাসলেন। শিশুর মতো হাসি। যদু আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি হাসলেন!

অবধূত বললেন, আমার যে কাঁদতে ইচ্ছা করে না।

হাসি ও কান্না ছাড়া জগতে কি আর কিছু নেই? আপনার সঙ্গে আমি কিছুই দেখছি না, আপনার কি কোন কিছুর প্রয়োজন নেই?

অবধূত বললেন, প্রয়োজনের কথা ভাববার প্রয়োজন কী! কিছু না ভেবে যদি আনন্দে থাকা যায় তো আমি জোর করে কিছু ভাবব কেন!

যদু বলল, আপনি বালকের মতো আচরণ করছেন. কিন্তু আপনাকে আমার প্রাজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে। এই জ্ঞান আপনি কোথায় পেলেন তা কি আমায় খুলে বলবেন? আপনার মনে যে আনন্দ দেখছি, এর উৎস কোথায়?

অবধূত বললেন, আমার কাছে এসে বোসো। পরিচয় দাও নিজের।

যদু তাঁর সামনে এসে বসে বলল, আমি মহারাজা যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু।

অবধূত বললেন, তবে আমার কথা শুনে কী করবে?

যদু বলল, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমি এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী নই। এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

তোমার সৌভাগ্য যে তুমি বিষয়ে আসক্ত হবার সুযোগ পাবে না।

একে আপনি সৌভাগ্য বলেন ?

আমি না, এ শিক্ষা আমি আমার গুরুর কাছে পেয়েছি।

কে আপনার গুরু ?

অবধূত হেসে বললেন, নিজের বুদ্ধিতে আমি এ যাবৎ চব্বিশজন গুরু পেয়েছি।

যদু বিস্মিত হয়ে বলল, কে তাঁরা ?

তাঁদের কথা শুনে হাসবে না তো ?

না, বলুন আপনি।

অবধূত বললেন, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য, পারাবত—

পারাবতও আপনার গুরু !

অবধূত সহাস্যে বললেন, শুধু পারাবত নয়, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধু-মক্ষিকা, হস্তী, ভ্রমর, হরিণ, মীণ, বারাঙ্গনা, কুকুর, পক্ষী, বালক, কুমারী, শর নির্মাতা, সর্প, মাকড়শা, কাঁচ-পোকা—এরাও আমার গুরু।

অবধূতের কথা শুনে বিস্ময়ের অন্ত রইল না যদুর। বলল, এরা সকলেই আপনার গুরু !

অবধূত হেসে বললেন, এদের সকলের কাছেই আমি যে অনেক কিছু শিখেছি।

কী শিখেছেন ?

বলছি শোন। ক্ষমাব্রত আমি পৃথিবীর নিকটে শিখেছি। পরের জন্যই যে জন্ম ও জীবন তা শিখেছি পর্বতের নিকটে এবং বৃক্ষের নিকটে পরোপকার ও পরাধীনতা শিখেছি। আহারের অভাবে জ্ঞান নষ্ট না হয় এবং বাক্যে মন বিক্ষিপ্ত না হয়, দেহরক্ষার উপযোগী এই শিক্ষা নিতে হয় প্রাণ বায়ুর নিকটে। বায়ু যেমন সর্বত্র গিয়েও কিছু গায়ে মাখে না, তেমনি বিষয় ভোগ করেও তাতে অনুরাগী হতে নেই। আকাশের মতো অন্তরে বাহিরে সর্বত্র সমান হতে হবে এবং জলের মতো সবকিছুকে পবিত্র করতে হবে নিজের আচরণে। অগ্নি যেমন সর্বভুক হয়েও অপবিত্র হয় না, তেমনি অন্যের পাপ গ্রহণ করেও নিষ্পাপ থাকতে হবে। যেমন কলার ক্ষয় আছে অথচ

চন্দ্রের নেই, তেমনি দেহের ক্ষয় আছে অথচ আত্মার নেই। জলে সূর্যের একাধিক প্রতিবিম্বের মতো স্থূল বুদ্ধির মানুষ আত্মাকে বহু রূপে দেখে।

অবধূত একটু থামতেই যদু বলল, পারাবতের কাছে আপনি কী শিখেছেন?

অবধূত হেসে বললেন, সংসারের সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

তা কী?

সংসারে অতিরিক্ত আসক্তি জন্মালে কপোতের মতো সন্তাপ পেতে হয়। সে গল্প তো তোমরা জানো?

মনে পড়ছে না।

অবধূত বললেন, ব্যাধের জালে শাবকদের আবদ্ধ দেখে প্রথমে কপোতী ও পরে সেই কপোতও আবদ্ধ হয়েছিল। স্বর্গে যেমন তেমনি নরকেও ইন্দ্রিয় সুখ আছে। কিন্তু যার বিবেক আছে, তিনি এ সুখ চাইবেন না।

অজগরের কাছে কী শিখেছেন?

দৈবে যা পাওয়া যায় তাই আহার করবে, কিছু না পেলে অজগরের মতো নিরুদ্যমে পড়ে থাকবে। নারী ভগবানের মায়া, তাকে দেখে প্রলুব্ধ হলে নরকে যেতে হয়। ভিক্ষু সঞ্চয়ী হবেন না। সন্ন্যাসী কাঠের যুবতীকেও স্পর্শ করবেন না এবং বনচর যতি কখনও গ্রাম্য গীত শুনবেন না। রসনাকে জয় করতে পারলেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জয় করা হয়।

যদু বলল, আপনি বারাঙ্গনাকেও আপনার গুরু বলেছেন। তার কাছে আপনি কী শিক্ষা পেয়েছেন?

সে কথাও শুনবে?

আপনার আপত্তি না থাকলে বলুন।

আপত্তি আর কী! সমস্ত ঘটনাটাই আমি বলছি। বিদেহনগর মিথিলায় আমি পিঙ্গলা নামের এক বারাঙ্গনার কাছে যা শিখেছি তা শোন। একদিন রাতে সে সাজ-সজ্জা করে তার গৃহের দ্বারে বসে ছিল। পথে যাতায়াতকারী পুরুষদের দেখে সে ভাবছিল যে কেউ বোধহয় তার কাছে আসবে। এই ভাবে ঘর বার করে নিশীথ কাল উপস্থিত হলে তার বৈরাগ্য উৎপন্ন হল। সে বলল, বিজ্ঞান বিরহিত মানুষ যেমন মমতা ত্যাগ করতে পারে না, তেমনি বৈরাগ্য রহিত মানুষও আশ-পাশ মুক্ত হতে পারে না। নিজের মনকে জয় করতে না পেরেই আমি পুরুষের কাছে ভোগ ও ধন

চাইছি। এখন থেকে আমি নিজের আত্মার কাছেই আত্ম বিক্রয় করে আনন্দ লাভ করব। যথা লাভে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের আত্মার সঙ্গেই অহরহ বিহার করব। আশাই পরম দুঃখ, পরম সুখ নৈরাশ্যে।

যদু বলল, খুব ঠিক কথা।

যে বস্তু মানুষের সবচেয়ে প্রিয় তা পরিগ্রহই দুঃখের কারণ হয়, তাই যিনি তা গ্রহণ করেন না তাঁরই অনন্ত সুখ লাভ হয়। কুরর জানো?

এক রকম পাখি।

চিল জাতীয় পাখি। তার মুখে আমিষ দেখে শ্যেন ও গৃধ্র তার প্রাণ বিনাশের উদ্যোগ করে। কুরর সেই আমিষ ত্যাগ করে রক্ষা পায়। তাই সেও আমার গুরু। মান-অপমানের জন্য আমার সুখ দুঃখ নেই, গৃহস্থদের মতো চিন্তাও নেই। আমি পরমাত্মার প্রেমেই আত্মহারা হয়ে বালকের মতো বিচরণ করি।

যদু বলল, কুমারীর কাছে আপনি কী শিখেছিলেন?

মনে পড়েছে। এক কুমারীর কাছে আমি শিখেছিলাম যে বহু লোকের সঙ্গে একত্র বাসে কলহ হয়, দুজনেও হয় আলাপ। তাই একাকী বিচরণ করা কর্তব্য।

মাকড়শা বা কাঁচ-পোকার কাছে কী শিখেছিলেন?

তাদের কাছেও শিখেছি। ঈশ্বর মাকড়শার মতো জাল বুনে তাতে বিহার করে নিজের সৃষ্টিকেই আবার গ্রাস করেন। আর আরশোলা যেমন কাঁচ-পোকার ভয়ে কাঁচ-পোকায় পরিণত হয়, তেমনি দেহীর মন স্নেহ, দ্বেষ বা ভয়ে নিশ্চল ভাব ধারণ করলে সমান রূপ পায়। উৎপত্তি বিনাশশীল এই দেহকেও আমি গুরু মনে করি। কিন্তু সবার চেয়ে বড় গুরু নিজের আত্মা। আত্মাকে বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত করলেই দেখতে পাবে যে আত্মাই সকলের শ্রেষ্ঠ গুরু, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দিয়ে এই আত্মাই জীবকে শ্রেয় বুঝতে শেখায়।

যদু এই উপদেশ পেয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। অবধূত থামতেই বলল, প্রভু, আপনার পরিচয় জানবার জন্য মন আমার বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

অবধূত বললেন, হ্যাঁ, আমার জন্মের একটা পরিচয় আছে। অমি অত্রির পুত্র দত্ত।

যদু তার দু চোখ বিস্ফারিত করে বলে উঠল, আপনিই অত্রি অনসূয়ার সেই বিখ্যাত পুত্র দত্তাত্রেয়! প্রভু, আমাকে দর্শন ও উপদেশ দিয়ে আপনি কৃতার্থ

করলেন।

বলে সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে উঠে বলল, আমার একটি নিবেদন আছে প্রভু।

বল।

আমার মা দেবযানী বড় দুঃখী। আপনি তাকে একবার দর্শন দিন। আমি আপনাকে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে চাই।

অবধূত বললেন, চল।

দুজনে একসঙ্গে এলেন রাজার অন্তঃপুরে। দেবযানীর নিকটে গিয়ে যদু বলল, মা, প্রণাম কর মহর্ষি দত্তাত্রেয়কে। আমি এঁর সৎকারের ব্যবস্থা করে আসি।

বলে যদু তার কর্তব্য সম্পাদন করতে গেল। কিন্তু ফিরে এসে দেখল দত্তাত্রেয় নেই, গৃহকোণে চোখ বুঁজে বসে আছে তার জননী দেবযানী। স্থির প্রশান্ত স্পন্দনহীন দেহ, জীবিত কি মৃত তা বোঝা যাচ্ছে না। দেবযানী যেন এ জগতে আর নেই, নূতন জগতে নবজন্মের প্রতীক্ষা করে আছে তদ্গত চিত্তে। মহর্ষি দত্তাত্রেয় কি তাকে নূতন পথে যাত্রার উপদেশ দিয়ে গেলেন।

স্বল্পকাল পরে রাজা যযাতি তাঁর পুরীতে ফিরে এলেন। বিশ্বাচী সঙ্গে নেই। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখল, তিনি একা ফিরেছেন, তাঁর পরিধানে রাজবেশ নেই, তিনি সামান্য গৃহীর মতো বহু কষ্ট স্বীকার করে পদব্রজে ফিরে এসেছেন।

দেবযানীর কাছে এসে তিনি বললেন, তোমার কাছে আমার অপরাধের শেষ নেই দেবযানী। আমি আজ অকপটে তোমার কাছে সব স্বীকার করতে চাই।

দেবযানী বলল, অতীতের কথা থাক রাজা।

থাকবে কেন! সব কথা স্বীকার না করলে আমার মন যে হাল্কা হবে না! পাপকে বুকের মধ্যে জমিয়ে রাখব কেন! কেন নিরন্তর দগ্ধ হব অনুশোচনায়!

তবে সংক্ষেপে বল।

আমার এই জরার জন্য একমাত্র আমিই দায়ী, দায়ী আমার ভোগের তৃষ্ণা। শর্মিষ্ঠা আমার কোন ক্ষতি করেনি, করেছে তার সখীরা। যে সংযম দিয়ে মানুষ তার যৌবনকে দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারে, আমি নিজে তাকে ক্ষয় করেছি অসংযমে। নিজেই নিজের জরাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছি। তৃষ্ণার

সংক্রান্তি নেই দেবযানী, কামের অন্ত দেখা সম্ভব নয়। ভোগের নিবৃত্তি নেই। ভোগ শুধু তৃষ্ণা বাড়াতেই পারে, তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। ভোগ সমস্ত রোগেরও আধার। তাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত।

প্রথম যৌবনের অদম্য বাসনার কথা দেবযানীর মনে পড়ে গেল। সেদিন সেও ভোগের বাসনায় উন্মাদের মতো হয়েছিল। তাই তার পিতার উপদেশ মেনে নিতে পারে নি। বিশ্বাস করে নি তার প্রথম প্রেমিক কচের কথা। যযাতির মতো সেও বোধহয় এই রকমই চেয়েছিল। তাই সুকৌশলে দাসত্ব স্বীকার করিয়েছিল রাজকন্যা শর্মিষ্ঠাকে, যযাতিকেও জয় করেছিল কৌশলে। রাজরাণী হয়ে ঐশ্বর্য লাভ করেছিল ; কিন্তু হৃদয় শূন্য ছিল অতৃপ্তিতে। হৃদয়ে প্রেম ছিল না বলে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে নি। তাই হেরে গিয়েছিল শর্মিষ্ঠার কাছে। বিশ্বাচীর কাছেও। কিন্তু ঋষি দত্তাত্রেয় তাকে সুখের সন্ধান দিয়ে গেছেন। দেবযানী তাই নীরবে সব কথা শুনল, উত্তরে একটি কথাও বলল না। যে কথা সে এতদিন বিশ্বাস করে নি, তাকে আজ পরম সত্য বলে মনে হচ্ছে।

যযাতি বললেন, তোমার প্রতি আমি অনেক অবিচার করেছি।

কিন্তু দেবযানী বলল, এ সব কথা আজ থাক রাজা।

যযাতি বললেন, তোমার ধার্মিক পুত্র যদুর প্রতি যে অবিচার করেছি তারও কোন ক্ষমা নেই। নিজের ভোগের বাসনায় অন্ধ হয়ে আমি তাকে রাজ্যের অধিকারে বঞ্চিত করেছি।

দেবযানী বলল, তুমি তাকে অনুগ্রহ করেছ রাজা, সে মনুষ্যত্ব লাভের সুযোগ পাবে। তার আনন্দ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

যযাতি সবিস্ময়ে তাকালেন দেবযানীর মুখের দিকে।

দেবযানী বলল, আমি ঋষির কন্যা, ঋষি হবার জন্যেই জন্মেছে আমার পুত্ররা। অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে আমি আমার সখী শর্মিষ্ঠার প্রতি যে অবিচার করেছি তা প্রতিকারের সুযোগ দিয়েছ তুমি। সে রাজকন্যা, তার পুত্রই রাজা হোক। তুমি তাকে সিংহাসনে বসাবার আয়োজন কর। আমি শর্মিষ্ঠাকে আনতে যাচ্ছি।

যযাতি বললেন, তুমি এই কথা বলছ!

দেবযানী বলল, আমিই তো এই কথা বলব। অনেক আগেই আমার এ কথা বলা উচিত ছিল। পিতার কাছে তো আমি এই শিক্ষাই পেয়েছিলাম।

সেদিন আমার তরুণ মন এ কথা মেনে নিতে পারে নি। আজ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই তা সত্য বলে জেনেছি।

দেবযানীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন যযাতি। তাই দেখে দেবযানী বলল, কী জেনেছি জানতে চাও?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন যযাতি।

দেবযানী চলল, আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, ক্ষমা পরম ধর্ম, আর—

অসংকোচে বল।

ভোগ দিয়ে ভোগ নয় তাতে ভোগের তৃষ্ণা বাড়ে। তাই ভোগ করতে হয় ত্যাগ দিয়ে। ত্যাগ দিয়ে অপরকে ভোগের সুযোগ দিয়ে যে ভোগ, তাতেই অনাবিল আনন্দ। জীবনে সেই আনন্দই কাম্য।

যযাতি বললেন, তোমার পিতা এই কথা বলতেন!

দেবযানী বলল, হ্যাঁ, তাঁর শিষ্যদের তিনি এই শিক্ষাই দিতেন। তাঁর এই শিক্ষাতেই দৈত্য ও দানব জাতি ভোগের পথ আশ্রয় করে নি। গ্রহণ করেছে ত্যাগের পথ। অনাদরে অবজ্ঞায় তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে, সগৌরবে বেঁচে থাকবে ভোগী দেবতারাই। মানুষের ভোগের বাসনাই তাদের বাঁচিয়ে রাখবে চিরকাল।

তবে কি তুমি বলতে চাও—

না, দেবতাদের আমি বড় ভাবি না! তাঁদের পথ কল্যাণের নয়, মুক্তির নয়, তা বন্ধনের পথ।

দেবযানী একটু থেমে বলল, তোমার পিতা নহুষের কথা আমি জানতে পেরেছি। দেবতারাই সেই ধর্মাত্মার মনে ভোগের বাসনা জাগিয়েছিলেন। ঋষিরা তাঁকে শাপ দেননি, বর দিয়েছিলেন দয়ালু ঋষি অগস্ত্য। তিনি তাঁকে সিংহাসনের লোভ ত্যাগ করে অজগর ব্রত গ্রহণ করতে বলেছিলেন। বড় কঠিন এই ব্রত। দৈবে কিছু পেলে আহার করবে, তা না হলে অজগরের মতো নিরুদ্যমে পড়ে থেকে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করবে।

যযাতি বললেন, শুনেছি, রাজা ভরতের পিতা ঋষভ দেবও এই ব্রত গ্রহণ করেই প্রাণত্যাগ করেছিলেন।

দেবযানী বলল, তোমার পিতাও এই ব্রত গ্রহণ করেছিলেন ঋষি অগস্ত্যের উপদেশে। কিন্তু দেবতারা মিথ্যা কথা রটিয়েছে, বলেছে ঋষির শাপে তিনি অজগরে পরিণত হয়েছিলেন।

যযাতি বললেন, তোমার কথাই সত্য। স্বর্গ থেকে ফিরে এসে তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যতিকে রাজ্য দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের পিতার বৈরাগ্য দেখে বুঝতে পেরেছিলেন সব কথা, তাই রাজ্যের ভার গ্রহণ করেননি। বলেছিলেন, এতে সুখ নেই, আছে দুঃখ; ধর্ম চর্চার অন্তরায় হবে রাজত্ব পরিচালনার দায়িত্ব। আমি তখন নির্বোধ ছিলাম, তাই এ কথা বুঝি নি। রাজা হয়ে গৌরবান্বিত বোধ করেছিলাম।

একটু থেমে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ দেবযানী, আমাকে সিংহাসনে বসিয়ে আমার পিতা নহুষ অজগর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কোথায় প্রাণত্যাগ করেছেন, সে সংবাদ আমরা রাখি নি।

দেবযানী বলল, এবারে আমি যখন পিতার গৃহে বাস করছিলাম, তখন আমি এই সব কথা জেনেছি।

সহসা যযাতি বলে উঠলেন, তুমি আমার ভার নাও দেবযানী, নিজের ভার আমি আর বইতে পারছি না।

সত্যিই তোমার ভার আমাকে বইতে দেবে ?

আজ থেকেই, এখন থেকেই।

তবে একটু অপেক্ষা কর। সবার আগে আমি শর্মিষ্ঠাকে ডেকে আনি। সে আর অশোক বনে থাকবে না। সে এই রাজ-অন্তঃপুরে থাকবে রাজমাতা হয়ে। পুরুর এখনও অপরিণত মতি, আমাদের সঙ্গে বনবাসে গেলে তার চলবে না।

তারপর প্রধান অমাত্যকে ডেকে দেবযানী বলল, অবিলম্বে একটা শুভ যোগ দেখে পুরুর রাজ্যাভিষেকের ব্যবস্থা করুন।

দেবযানী সসম্মানে শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে এল রাজ-অন্তঃপুরে। রাজ জ্যোতিষী পুরুর রাজ্যাভিষেকের দিন ক্ষণ দেখলেন। উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। কিন্তু প্রজাদের মধ্যে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠল। রাজা যযাতি অন্যায় করছেন, তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বঞ্চিত করে কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যের অধিকার দিতে পারেন না। জ্যেষ্ঠ অনাগ্রহী হলে তার অনুজ পাবে, সবাই অনাগ্রহী হলেই সর্বকনিষ্ঠ রাজ্যের অধিকারী হতে পারে।

প্রধান অমাত্য এসে রাজাকে এই সংবাদ জানালেন। যযাতি বললেন দেবযানীকে। দেবযানী বলল, তোমার বিচারে অধর্ম হয় নি, তুমি পুরুকেই

রাজ্য দান কর। প্রজারা তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তুমি তাদের বুঝিয়ে বল, তারা নিশ্চই বুঝবে।

এর পর প্রজারা কয়েকজন বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তিকে মুখপাত্র করে রাজসভায় এল তাদের প্রতিবাদ জানাতে। একজন সবিনয়ে বলল, মহারাজের অনুমতি হলে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি আমাদের বলবার কথা।

যযাতি বললেন, যা সত্য তা নির্ভয়েই বলতে হয়।

সবার দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে সেই বক্তি বলল, মহারাজের বিচার ঠিক হয়নি বলে আমরা মনে করি। যদু আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনিই ধর্মত এই রাজ্যের অধিকারী। তাকে বঞ্চিত করে আপনি অধর্ম করছেন।

যযাতি বললেন, এই সিদ্ধান্ত আমি কেন গ্রহণ করেছি, তা আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলছি।

সকলে এক বাক্যে বলল, সেই কথা জানবার জন্যই আমরা এসেছি।

যযাতি বললেন, একটি গোপন কথা আপনারা জানেন না। কিছুদিন পূর্বে বিষয়ভোগে আমি অক্ষম হয়েছিলাম, জরা আমাকে আক্রমণ করেছিল। তখন ধর্মত আমাকে যদুর হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে বনবাসী হতে হত। কিন্তু ভোগের তৃষ্ণা তখনও প্রবল থাকার জন্য আমি যদুর নিকটে তার যৌবন ভিক্ষা করে তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। কিন্তু সে রাজী হয় নি। এই ভাবে তুর্বসু দ্রুহ্য ও অণু ও আমার অনুরোধ উপেক্ষা করেছিল। আমার মনে হয়েছিল, যে-পুত্র পিতার অনুকূল নয় সে পুত্র নয়, মিত্রও নয়। পিতার আদেশ ভঙ্গকারী পুত্র শত্রু বলে আমার মনে হয়েছিল। তাই সেদিনই আমি তাদের রাজ্যের অধিকারে বঞ্চিত করেছি বলে জানিয়ে দিয়েছিলাম। তারা আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল। আমার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু সেদিন সম্মত হয়েছিল বলেই আমি সেদিনই পুরুকে রাজ্য দিতে সত্যবদ্ধ হয়েছি। তার যৌবন নিয়েই আমি বিষয় ভোগ করছি, আজ আপনাদের সামনেই আমি তার যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে আমার জরা গ্রহণ করব। আপনারা বিদ্বান বুদ্ধিমান বিচক্ষণ। আপনারা নিশ্চয়ই মানবেন যে জন্মলাভের জন্যই কেউ পিতার পুত্র হয় না, পুত্র হয় পুৎ নামে নরক থেকে পিতাকে রক্ষার জন্য। পুরু এই কাজ করে আমার পুত্র হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আমার সিদ্ধান্ত আপনারা অনুগ্রহ করে অনুমোদন করুন, এই আমার প্রার্থনা।

প্রজারা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করল। তারপর একজন বলল, আপনি ঠিকই স্থির করেছেন মহারাজ, পুরুই যখন আপনার প্রিয় কাজ করেছে, তখন তাকেই আপনি রাজ্য দান করুন।

যযাতি বললেন, যদুর মাতামহর সঙ্গে আমি আগেই আলোচনা করেছিলাম, তিনিও আমাকে সমর্থন করেছেন। বলেছেন, এতে কোন অধর্ম হবে না।

প্রজারা বিদায় নেবার আগে বলে গেল, আমরাও তাই মনে করি।

অন্তঃপুরে, এসে যযাতি দেবযানীকে বললেন, পুত্রদের বঞ্চিত করতে আমার মনে বড় বেদনা বোধ হচ্ছে। নিজের অনুজদেরও আমি বঞ্চিত করি নি. তাদের চারজনকে আমি চার দিকে শাসনের ভার দিয়েছিলাম, পুত্রদেরও আমি কিছু দিতে চাই।

দেবযানী বলল, কী দিতে চাও বল।

আমার রাজ্য তো এখন অনেক বৃদ্ধি লাভ করেছে। দানবরাজ বৃষপর্বার মৃত্যুর পর আমি তাঁর রাজ্যেরও অধিকারী হয়েছি। আমার ইচ্ছা যে আমার চার বঞ্চিত পুত্রকে আমি চারি দিকে প্রতিষ্ঠা করে যাই। রাজ্য খণ্ড খণ্ড হলে কি ক্ষতি হবে কোনও?

দেবযানী বলল, আমি শর্মিষ্ঠাকে ডাকছি। সে অনুমোদন করলে তুমি তাই কর।

শর্মিষ্ঠা এসে বলল. তোমরা যা স্থির করবে তাই হবে।

এর পর পুরুর রাজ্যাভিষেকের উৎসব হল। যযাতি বললেন, সত্যরক্ষার জন্য পুরুকে আমার রাজ্যে অভিষিক্ত করবার পূর্বে আমি তার জ্যেষ্ঠদেরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য দান করছি। যদুকে দক্ষিণে, তুর্বসুকে পূর্বে, পশ্চিমে দ্রুহ্যুকে এবং উত্তরে অণুকে খণ্ড রাজ্যের অধিকার দিলাম। এরপর যা থাকল অর্থাৎ রাজ্যের মূল ভূখণ্ডের অধিপতি হবে পুরু।

প্রজারা জয়ধ্বনি করল ধর্মাত্মা রাজা যযাতির।

পুত্রদের অভিষেক উৎসব সমাপ্ত হবার পর অন্তঃপুরে এসে যযাতি দেখলেন

যে বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে দেবযানী। শর্মিষ্ঠার হাত ধরে সে বলল, আজ আমাদের বিদায় দাও শর্মিষ্ঠা। তোমরা সুখে থাকো, এই আশীর্বাদ করে যাচ্ছি।

বলে জরাগ্রস্ত স্বামী যযাতির হাত ধরে বনে যাত্রা করল দেবযানী। পাত্র মিত্ররা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়েছিল দ্বারে। তাদের দিকে চেয়ে যযাতি বললেন, সংসারে আবদ্ধ থেকে জীবনের অর্থ কী তা এতদিন জানতে পারি নি, যে পরমাত্মায় নিজের আত্মা লীন হবে, তাকে জানবারও কোন চেষ্টা করি নি। দেবযানী আমাকে সঠিক পথেই নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জন্য তোমরা ভেবো না।

নিরুত্তরে রইল সবাই। রাজপুরী শোকাচ্ছন্ন হল।

সমাপ্ত